ইনসানে কামেল

মূল : শহীদ অধ্যাপক মুর্তাজা মুতাহ্হারী

অনুবাদ : এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর

১

মানুষের আত্মিক ও মানসিক ত্রুটি

و إذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهنّ قال إنّي جاعلك للنّاس إماماً قال و من ذرّيّتي قال لا ينال عهدي الظّالمين

.

আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ইসলামের দৃষ্টিতে ইনসানে কামেল বা পূর্ণ মানব। ইনসানে কামেল বা পূর্ণ মানব অর্থ আদর্শ মানুষ, সর্বোত্তম মানুষ বা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। অন্যান্য বস্তু বা জিনিষের মত মানুষেরও পূর্ণতা ও অপূর্ণতা রয়েছে, এমনকি ত্রুটিযুক্ত ও ত্রুটিহীন হওয়ার বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। ত্রুটিমুক্ত মানুষ আবার দু'ধরনের : পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত মানুষ এবং অপূর্ণ ত্রুটিমুক্ত মানুষ। পূর্ণ বা আদর্শ মানুষকে চেনা ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। অর্থাৎ যদি আমরা পূর্ণ মুসলমান হতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের জানতে হবে পূর্ণ মানব কিরূপ। যেহেতু ইসলাম চায় পূর্ণ মানব তৈরি করতে এবং ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পূর্ণ মানব গড়ে তুলতে, সুতরাং আদর্শ মানুষের নমুনা আমাদের সামনে থাকতে হবে। এখানে আমরা পূর্ণ মানবের প্রকৃতি, তার আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করছি। সে কেমন প্রকৃতির, তার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি কেমন, একজন পরিপূর্ণ মানুষের চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যসমূহ কি? যদি আমরা তা জানতে পারি তবেই নিজেকে ও সমাজকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারব। যদি আমরা পরিপূর্ণ মানুষকে চিনতে না পারি তাহলে কোনক্রমেই পূর্ণ মুসলমান হতে পারব না। অন্যভাবে বলা যায় যে, আমরা ইসলামের দৃষ্টিতে একজন অপূর্ণ মানুষে পরিণত হব।

ইসলামের দৃষ্টিতে পূর্ণ মানব বা ইনসানে কামেলকে চেনার উপায়

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ মানুষকে চেনার জন্য দু'টি পথ রয়েছে। একটি পথ হচ্ছে প্রথমত আমরা দেখব কোরআন ও দ্বিতীয়ত সুন্নাত ইনসানে কামেলকে কিভাবে বর্ণনা করেছে। যদিও কোরআন ও সুন্নাতে এভাবে ইনসানে কামেলের ব্যাখ্যা করা হয়নি, বরং পরিপূর্ণ মুসলমান ও পূর্ণ মুমিনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছে, তবে এটা স্পষ্ট যে, পরিপূর্ণ মুসলমান অর্থ– যে মানব ইসলামের মধ্যে দিয়ে পূর্ণতায় পৌঁছেছে এবং পরিপূর্ণ মুমিন সে-ই যে ঈমানের ছায়ায় পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে। আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে কোরআন ও সুন্নাত পরিপূর্ণ মানুষকে কিভাবে বর্ণনা করেছে এবং পরিপূর্ণ মানুষের প্রতিকৃতির বিষয়ে প্রচুর বর্ণনা এসেছে।

পরিপূর্ণ মানুষকে চেনার দ্বিতীয় পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে কোরআন ও সুন্নাতে পরিপূর্ণ মানুষ সম্পর্কে কিরূপ বর্ণনা এসেছে তা থেকে নয়, বরং ঐ সকল ব্যক্তিকে তাঁদের জীবনী থেকে চিনব যাঁদের উপর

আমরা আস্থা লাভ করেছি যে, ইসলাম ও কোরআন যেভাবে চায় তাঁরা সেভাবে গড়ে উঠেছেন। ইসলামের পূর্ণ মানুষের হুবহু প্রতিকৃতি হলেন তাঁরা। যেহেতু ইসলামের পরিপূর্ণ মানুষ শুধু আদর্শিক, কল্পনা ও চিন্তাগত কোন বিষয় নয় যে, বাস্তবে তার অস্তিত্ব থাকবে না। পরিপূর্ণ মানুষ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উভয় পর্যায়েই বাস্তবে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

মহানবী (সা.) নিজেই পূর্ণ মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। হযরত আলী (আ.) অন্য এক পূর্ণ মানবের নমুনা। আলী (আ.)-কে চেনা অর্থ পরিপূর্ণ মানুষেকে চেনা। কিন্তু আলীকে চেনা এটা নয় যে, তাঁর পরিচয় পত্র জানা। কখনো মানুষ আলীকে পরিচয় পত্র থেকে চিনে যে, তাঁর নাম আলী, আবু তালিবের পুত্র, আবু তালিব আবদুল মুত্তালিবের পুত্র, মাতা ফাতেমা যে আসাদ ইবনে আবদুল ওজ্জার কন্যা, তিনি (আলী) মুহাম্মদ (সা.)-এর কন্যা ফাতেমার সহধর্মী, হাসান ও হুসাইনের পিতা, অমুক বছর জন্মগ্রহণ করেছেন, অমুক বছর শাহাদাত বরণ করেছেন, অমুক অমুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন– এগুলো আলীর পরিচয় জানা। অর্থাৎ যদি চাই আলীর জন্য একটি পরিচয় পত্র তৈরি করব ও পরিচয় পত্র সম্পর্কে জানব তবে তা এরূপই হবে। কিন্তু আলীর পরিচয় পত্র জানা আলীকে জানা নয় বা একজন পরিপূর্ণ মানুষকে চেনাও নয়। অর্থাৎ আলীকে জানা তাঁর ব্যক্তিত্বকে জানা, ব্যক্তি আলীকে নয়। আলীর সম্মিলিত ব্যক্তিত্বের যতটুকু আমরা জানব, ইসলামের পরিপূর্ণ মানুষকে ততটূকু চিনব। আর শুধু নাম ও শাব্দিক অর্থে নয়, বরং কার্যক্ষেত্রে পূর্ণ মানুষকে যতটুকু অনুসরণ করেছি তাঁকে সে পরিমাণ ইমাম বা নেতা হিসেবে মেনেছি ও তাঁর পথে চলেছি; তাঁর অনুসারী ও অনুগামী হয়েছি ও যতটুকু চেষ্টা করছি নিজেকে সেই আদর্শ অনুযায়ী তৈরি করতে ঠিক সেই পরিমাণ এ কামেল পুরুষের অনুসারী হয়েছি। যেহেতু শহীদ (প্রথম) লোমআ গ্রন্থে الشيعة من شايع علياً–এ বাক্যের অর্থ করতে গিয়ে বলেন, (অন্যরাও তা বলেছেন) "শিয়া ঐ ব্যক্তি যে আলীর সহযাত্রী হয়েছে। অর্থাৎ শুধু বলার মাধ্যমে শিয়া হবে না (যে আমি শিয়া), নাম ধারণ করলেই শিয়া হবে না, শুধু ভালবাসা ও পছন্দের দাবিতে শিয়া হবে না। তাহলে কিভাবে শিয়া হবে? সহযাত্রী হয়ে অর্থাৎ পদানুসরণের মাধ্যমে। যখন কেউ একজন যে পথে চলে আপনি তার পেছনে পেছনে বা সঙ্গে যাবেন আপনাকে তার সহযাত্রী বা পদাঙ্কনুসারী (شايع) বলা হবে। আলীর শিয়া অর্থ আলীর কর্মের পদাঙ্কনুসারী।

তাহলে পূর্ণ মানবকে চেনার দু'টি পথ ও সে সাথে এ সম্পর্কে আলোচনার উপকারিতাও জানতে পারলাম। সুতরাং ইনসানে কামেল বিষয়টি শুধু একটি দার্শনিক ও জ্ঞানগত বিষয় নয় যে, কেবল জ্ঞানগত প্রভাব রয়েছে। যদি ইসলামের পূর্ণ মানবকে কোরআন ও সুন্নাতের বর্ণনা থেকে ও কোরআন দ্বারা পরিবর্ধিত রূপে না জানি তাহলে ইসলাম নির্দেশিত পথে চলতে পারব না এবং প্রকৃত ও সত্যিকারের মুসলমান হতে পারব না। অনুরূপ আমাদের সমাজও একটি ইসলামী সমাজ হতে পারবে না। সুতরাং ইসলামের পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যের মানুষকে চেনা অপরিহার্য।

কামাল (كمال) ও (تمام) তামামের পার্থক্য

এখন প্রশ্ন হলো 'কামেল' (كَامِل)-এর প্রকৃত অর্থ কি? 'ইনসানে কামেল'-এর অর্থই বা কি?

আরবী ভাষায় এ দু' শব্দের অর্থ কাছাকাছি হলেও এক নয়; যদিও দু'টিরই বিপরীত শব্দ এক অর্থাৎ শব্দটি কখনো প্রথমটির বিপরীত শব্দ হিসেবে আবার কখনো দ্বিতীয়টির বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, এমনকি ফার্সীতে ঐ দু'টি শব্দের পরিবর্তে একটি শব্দই রয়েছে। ঐ দু'টি শব্দ আরবীতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও كمال এবং تمام দু'টিরই বিপরীত শব্দ ناقص (নাকিস) অর্থাৎ অসম্পূর্ণ। যেমন ফার্সীতে বলা হয় : এটা (كامل) বা সম্পূর্ণ এবং ওটা ناقص বা অসম্পূর্ণ; তেমনি বলা হয়, এটা تمام ওটা ناقص।

আল কোরআনের একটি আয়াতে এ দু'টি শব্দই এসেছে–

اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নেয়ামতকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করলাম।" (সূরা মায়েদা : ৩)

এখানে এটা বলা হয়নি যে, أتممت عليكم دينكم বা أكملت لكم نعمتي , যদি তা বলা হতো, তবে আরবী ব্যাকরণে ভুল বলে গণ্য হতো। এখন এ দু'শব্দের পার্থক্য কি? যদি আমরা এ দু'য়ের পার্থক্যকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ না করি তাহলে আমাদের আলোচনা শুরু করতে পারব না। অর্থাৎ আমাদের আলোচনার শুরু হবে এ দু'শব্দের অর্থ জানার মাধ্যমে।

'تَمَام' কোন বস্তুর জন্য তখনই বলা হবে যখন ঐ বস্তুর বাস্তব অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছুই অস্তিত্বে এসে থাকে। অর্থাৎ যদি তা থেকে কিছু জিনিস অনুপস্থিত থাকে, তবে বস্তুটি ঐ বস্তু হওয়ার ক্ষেত্রে অপূর্ণ অথবা বলা যায় বস্তুটি তার অস্তিত্বের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ। যেমন অর্ধেক অস্তিত্ব লাভ করেছে, এক-তৃতীয়াংশ অস্তিত্ব লাভ করেছে বা দুই-তৃতীয়াংশ অস্তিত্ব লাভ করেছে ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ একটি পরিকল্পিত মসজিদের বিল্ডিংয়ের জন্য হলরুম দরকার। রুমের জন্য দেয়াল, ছাদ, দরজা, জানালা ও অন্যান্য জিনিস প্রয়োজন। যদি ঐ বিল্ডিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় এ সকল অংশ বিদ্যমান না থাকে তবে ঐ বিল্ডিং ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। যখন প্রয়োজনীয় সব কিছু বিদ্যমান থাকবে তখন বলা যাবে বিল্ডিং সম্পূর্ণ (তামাম) হয়েছে। এ শব্দের বিপরীত স্থানকে নির্দেশ করতে অসম্পূর্ণ বা নাকিস ব্যবহার করা হয়। কোন বস্তু সম্পূর্ণতা লাভ করলেই তা পূর্ণতা লাভ করেছে বলা যায় না, বরং বস্তুটি হয়তো কখনো এর থেকে এক স্তর উপরের পর্যায়ের, কখনো কয়েক স্তর উপরের পর্যায়ের পূর্ণতা লাভ করে, এভাবে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত। যদি এই كمال বা পূর্ণতা ঐ বস্তুর না থাকে তবুও তা ঐ বস্তুরই। কিন্তু পূর্ণতা লাভ করার অর্থ তা থেকে এক স্তর উপরে অবস্থান লাভ করা।

কামাল বা পূর্ণতাকে আড়াআড়ি বা সমান্তরালভাবে বর্ণনা করা হয়। যখন বস্তু সমান্তরালভাবে শেষ প্রান্তে বা পরিসীমায় পৌঁছায় তখন বলা হয় সম্পূর্ণ (تمام) হয়েছে এবং বস্তু যখন লম্বিকভাবে উপরের দিকে বাড়তে থাকে বা উন্নতি লাভ করে তখন বলা হয় 'পূর্ণতা' (كمال) লাভ করেছে। যদি বলা হয় অমুক ব্যক্তির বুদ্ধি (আকল) পূর্ণতা লাভ করেছে, এর অর্থ পূর্বেও তার বুদ্ধি ছিল, কিন্তু তার বুদ্ধি পূর্বের চেয়ে উপরের পর্যায়ে পৌঁছেছে বা পরিপক্ব হয়েছে। অথবা যদি বলা হয় অমুক ব্যক্তির জ্ঞান পূর্ণতা

লাভ করেছে তাহলে এর অর্থ পূর্বেও তার জ্ঞান ছিল ও সে তা ব্যবহার করত, কিন্তু এখন তার জ্ঞান পূর্ণতার এক স্তর অতিক্রম করেছে। সুতরাং আমরা দেখছি, একজন সম্পূর্ণ মানুষ আছে যার বিপরীতে সমান্তরালভাবে চিন্তা করে অসম্পূর্ণ মানুষও আছে অর্থাৎ অর্ধেক মানুষ বা মানুষের ভগ্নাংশ। উদাহরণস্বরূপ এক-তৃতীয়াংশ বা দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মানুষ নয়। অন্য এক প্রকার মানুষও আছে যে মানুষ সম্পূর্ণ ও এই সম্পূর্ণ মানুষ পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারে– এভাবে সর্বোচ্চ পরিসীমা পর্যন্ত যার উপর কোন পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারে না যাকে পরিপূর্ণতম বা সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানুষ বলা যায়।

ইনসানে কামেলের ব্যাখ্যা

সপ্তম হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী সাহিত্যে ইনসানে কামেলের কোন ব্যাখ্যা ছিল না। বর্তমানে ইউরোপেও মানুষ সম্পর্কে এ ব্যাখ্যা প্রচলিত থাকলেও ইসলামী বিশ্বে মানুষ সম্পর্কে এ ভাষা সপ্তম হিজরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। যিনি মানুষ সম্পর্কে প্রথম 'ইনসানে কামেল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তিনি হলেন বিখ্যাত আরেফ মহিউদ্দিন আরাবী আন্দালুসী তায়ী। মহিউদ্দিন আরাবী ইসলামী এরফানের (আধ্যাত্মিকতার) জনক। সপ্তম হিজরীর পর থেকে যত আরেফ ইসলামী জাতিসমূহের মধ্যে এসেছেন, যেমন ইরানী ও ফার্সী ভাষার আরেফগণ সকলেই মহিউদ্দিন আরাবীর ছাত্র। মৌলভী (মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী) মহিউদ্দিন আরাবীর মক্তবের ছাত্র। রুমী তাঁর সকল মর্যাদাসহ এরফানের দৃষ্টিতে মহিউদ্দিন আরাবীর তুলনায় কিছুই নন। মহিউদ্দিন আরব জাতিভুক্ত ও হাতেম তায়ীর বংশধর এবং আন্দালুসের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সকল ভ্রমণ ইসলামী দেশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তিনি সিরিয়াতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কবর দামেস্কে। সিরিয়ায় মৃত্যুবরণ করা ও সেখানে দাফন হওয়ায় তাঁকে শামী বলা হয়। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সদরুদ্দিন কৌনাভী তাঁর পরে সবচেয়ে বড় আরেফ হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানে ইসলামী এরফান যে একটি জ্ঞানের রূপে এসেছে তা শুধু মহিউদ্দিন আরাবী ও সদরুদ্দীন কৌনাভীর কর্মপ্রচেষ্টার ফলেই। সদরুদ্দিন কৌনাভী তুরস্কের কৌনীর বাসিন্দা ও মহিউদ্দিন আরাবীর স্ত্রীর পূর্ববতী স্বামীর ঔরসজাত পুত্র ছিলেন। অর্থাৎ মহিউদ্দীন তাঁর শিক্ষকও ছিলেন আবার সৎ পিতাও। মৌলভী জালালুদ্দিন রুমী সদরুদ্দিন কৌনাভীর সমসাময়িক ছিলেন। সদরুদ্দিন একটি মসজিদের জামায়াতের ইমাম ছিলেন। মৌলভী সেখানে যেতেন ও তাঁর পেছনে নামাজ পড়তেন। মহিউদ্দিন আরাবীর চিন্তা সদরুদ্দিনের মাধ্যমে মৌলভীর কাছে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

অন্যতম যে বিষয়টি এ ব্যক্তি উপস্থাপন করেন তা ইনসানে কামেল সম্পর্কিত। তবে তিনি বিষয়টি এরফানের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। বিশেষ করে 'সাহেবে মানজুমে' খ্যাত মাহমুদ সাবেস্তারীর সবচেয়ে উন্নত ও মূল্যবান সাহিত্যমান সম্পন্ন বই 'গুলশানে রজ'-এ যে প্রশ্নগুলো ইনসানে কামেলের ব্যাপারে এসেছে সদরুদ্দিন এরফানের দৃষ্টিতে সেগুলোর জবাব দিয়েছেন। সুতরাং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এ বিষয়টি 'ইনসানে কামেল' শিরোনামে উপস্থাপন করেছেন ও এরফানের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। অন্যরাও ইনসানে কামেলকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে ও রূপে বর্ণনা করেছেন।

আমরা দেখতে চাই ইনসানে কামেল কোরআনের দৃষ্টিতে কেমন মানুষ। আলোচনাকে 'সম্পূর্ণ মানুষ' ও 'অসম্পূর্ণ মানুষ' দিয়ে শুরু করছি যেন এ বিষয়ের উপর পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করতে পারি।

শারিরীক ও মানসিক ত্রুটি

আমাদের মধ্যে কি ত্রুটিহীন এবং ত্রুটিযুক্ত মানুষও রয়েছে? সুস্থতা ও অসুস্থতা (ত্রুটি) কখনো কখনো মানুষের দেহের সাথে সম্পর্কিত। সন্দেহ নেই যে, কিছু মানুষ শারীরিকভাবে সুস্থ ও ত্রুটিমুক্ত এবং কিছু মানুষ ত্রুটিযুক্ত ও অসুস্থ। উদাহরণস্বরূপ শারীরিক ত্রুটি, যেমন দৃষ্টিহীনতা ও অন্ধত্ব ,পঙ্গুত্ব ও পক্ষাঘাতগ্রস্থতা প্রভৃতি। কিন্তু এগুলো ব্যক্তি-মানুষের সাথে সম্পর্কিত, মানুষের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নয়। কোন ব্যক্তি যদি অন্ধ, বধির, পঙ্গু, খাটো বা কুৎসিত চেহারার হন, এ ত্রুটিগুলোকে আপনি তার মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব ও মনুষত্বের ক্ষেত্রে ত্রুটি হিসেবে দেখেন না। যেমন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস যাঁকে নবীদের পরবর্তী পর্যায়ের জ্ঞানী বলে ধরা হয় তিনি পৃথিবীর এক কদাকার মানুষ ছিলেন। কিন্তু কেউই তাঁর এ কদাকৃতিকে একজন মানুষ হিসেবে তাঁর ত্রুটি বলে মনে করেন না। অথবা আবুল আলা মাযারি (আরব কবি) এবং ত্বাহা হোসেইন (মিশরীয় সাহিত্যিক) যাঁরা উভয়ই অন্ধ ছিলেন, তাঁদের এ শারীরিক ত্রুটি ব্যক্তিগত ত্রুটি হিসেবে পরিগণিত হলেও তাঁদের ব্যক্তিত্বের জন্য ত্রুটি বলে গণ্য হবে কি? অবশ্যই নয়। সুতরাং মানুষের ব্যক্তি দিক তার ব্যক্তিত্বের দিক হতে যে ভিন্ন তা প্রমাণিত সত্য। একটি তার দেহের সাথে, অন্যটি তার রূহের সাথে সম্পর্কিত। মনের বিষয় তার দেহ থেকে ভিন্ন। যাঁরা মনে করেন মানুষের মন একশ' ভাগ দেহের অনুগত তাদের ভুল এখানেই। প্রকৃতপক্ষে মানুষের দেহ পুরোপুরি সুস্থ থাকলেও তার অন্তর কি অসুস্থ হতে পারে? এটা একটা প্রশ্ন। সুতরাং যাঁরা রূহ বা আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চান এবং রূহের সকল বৈশিষ্ট্যকে মানুষের স্নায়ুর সরাসরি প্রতিক্রিয়া বলে মনে করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে বলতে চান যে, মন কিছুই নয়, সবই দেহের অনুগামী। তাঁদের মতে মন অসুস্থ হওয়ার অর্থ তার দেহ অসুস্থ। অর্থাৎ মানসিক অসুস্থতা এবং দৈহিক অসুস্থতা একই।

এটা আনন্দের বিষয় যে, বর্তমানে এটা প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে একজন মানুষ শারীরিক দৃষ্টিকোণ থেকে (যেমন শরীরে লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকার পরিমাণ দেহে ভিটামিনের পরিমাণ, পরিপাকতন্ত্রের মেটাবলিক কার্যক্রম, এমনকি নিউরোলজিক দৃষ্টিকোণ থেকে) সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও মানসিকভাবে অসুস্থ হতে পারে। কিভাবে তা সম্ভব? আধুনিক পরিভাষায় একে 'মানসিক জটিলতা' বলা হয়। আধুনিক বিজ্ঞান মানসিক জটিলতাসম্পন্ন মানুষকে অসুস্থ বলে মনে করে। এমন ব্যক্তির দেহে শারীরিক কোন জটিলতা সৃষ্টি না হয়েই মানসিক জটিলতার সৃষ্টি য়েছে। তাই এ ধরনের অসুস্থতার চিকিৎসা শারীরিকভাবে না করে মানসিকভাবে করতে হয়। যেমন অহংকার যা মানসিক জটিলতা থেকে উদ্ভূত, একটি রোগ বলে বর্তমানে প্রমাণিত তা প্রকৃতপক্ষেই একটি আত্মিক ও মানসিক রোগ। কিন্তু কোন ঔষধের দোকানে অহংকার রোগের ঔষধ পাওয়া যাবে কি? কিংবা বাস্তবে এটা কি সম্ভব যে, অহংকারী ব্যক্তি একটি ট্যাবলেট খাবে আর সাথে সাথে তার অহংকার বিলুপ্ত হয়ে সে এক নিরহংকার ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে? না, এটা কখনোই সম্ভব নয় যে, জল্লাদ ও পাষাণ হৃদয়ের

শিমারের মত কাউকে একটা ইনজেকশন পুশ করা হবে বা একটা ট্যাবলেট খাইয়ে দেয়া হবে আর সে রাতারাতি একজন দয়ালু, হৃদয়বান ও প্রশস্ত অন্তরের মানুষে পরিণত হয়ে যাবে। তবে এ ব্যাধিগুলোর চিকিৎসার বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে যা এভাবে নয়।

এমনকি শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসাও কখনো কখনো মানসিকভাবে করা সম্ভব। যেমনভাবে কখনো কখনো মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা শারীরিকভাবে করা হয়ে থাকে। যেমন কোন রোগ হয়তো শারীরিক, কিন্তু মানসিক উদ্দীপনা ও আত্মিক শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে তার চিকিৎসা করা হয়। এ বিষয়ে আলোচনা বেশ ব্যাপক এবং বিষয়টি আশ্চর্য হওয়ার মতোও বটে। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মানুষ দেহ ও মনের সমন্বয়ে এক সৃষ্টি এবং মানুষের মন তার দেহ হতে স্বাধীন ও সম্পূর্ণরূপে দেহের অনুগামী নয়। তেমনিভাবে দেহও পুরোপুরি মনের অনুগামী নয়। তবে এরা একে অপরকে প্রভাবিত করে। জ্ঞানীদের ভাষায় দেহ ও মন একে অপরের উপর গঠনমূলক প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ যেমনভাবে দেহ মনের উপর প্রভাব ফেলে তেমনভাবে মনও দেহের উপর প্রভাব ফেলে। সেই সাথে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবেও কাজ করে। তাই মানুষের মনোজগৎ একটি স্বাধীন জগতের অধিকারী।

আমরা পূর্ণ মানবের আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে ত্রুটিহীন ও ত্রুটিযুক্ত মানুষের বিষয়টি এনেছি এজন্য যে, আমাদের নিকট এটা পরিষ্কার হওয়া যে, আমাদের উদ্দেশ্য এখানে শারীরিক সুস্থতা বা ত্রুটি নয় এবং আমাদের উদ্দেশ্য এটাও নয় যে, মানব দেহ কতটা সুস্থ তা নিরীক্ষা করা। প্রকৃতপক্ষে তা দিয়ে আমাদের কাজও নেই। আমাদের লক্ষ্য হলো বাস্তবে এটা প্রমাণ করা যে, মানুষ যেমনভাবে মানসিকভাবে সুস্থ হতে পারে তেমনিভাবে ত্রুটিযুক্ত ও অসুস্থও হতে পারে। কোরআন এ সত্যকে স্বীকৃতি দিয়ে বলছে, فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا "তাদের অন্তরে অসুস্থতা রয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের এ অসুস্থতাকে বৃদ্ধি করে দেন।" (সূরা বাকারাহ্ : ১০)

এখানে আল্লাহ্ বলছেন তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত ও রূহ অসুস্থ, এটা বলেননি যে, তাদের চক্ষু অসুস্থ। এখানে লক্ষণীয় কোরআন হৃদয় বা অন্তর বলতে যা বুঝিয়েছে তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের হৃদয় বা হৃৎপিণ্ড নয় যে, এর আরোগ্যের জন্য হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। কোরআনের বর্ণিত হৃদয় হলো মানুষের আত্মা ও মানস। যেমন কোরআন অন্যত্র বলছে,

نُنزّل من القُرآن ما هوَ شفاء و رحمة للمؤمنين

"আমরা কোরআনে যা কিছু অবতীর্ণ করেছি তা মুমিনদের জন্য আরোগ্য লাভের উপায় ও রহমতস্বরূপ।" (সূরা বনি ইসরাইল : ৮২)

সুতরাং কোরআন মুমিনদের জন্য আরোগ্য লাভের উপায়।

আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.) বলেন, الا و انّ من البلاء الفاقة "জেনে রাখ, নিশ্চয়ই দারিদ্র্য একটি বড় বিপদ و اشدّ من الفاقة مرض البدن এবং দারিদ্র্য হতে মন্দ শারীরিক অসুস্থতা اشدّ من مرض البدن مرض القلب এবং শারীরিক অসুস্থতা হতে মন্দ ও কঠিন হলো অন্তরের অসুস্থতা।

কোরআনের অন্যতম পরিকল্পনা হলো সুস্থ মানুষ তৈরি। তাই আমাদের পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার পূর্বে সুস্থ ও ত্রুটিহীন মানুষ হতে হবে।

মানবাত্মার ব্যাধি

প্রথমে আমরা যে সকল বস্তু মানবাত্মাকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তা সংক্ষেপে আলোচনা করব। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বঞ্চনা আত্মিক রোগের অন্যতম উৎস। অধিকাংশ মানসিক রোগের কারণ হলো বঞ্চনা। আপনারা জানেন ফ্রয়েড বাড়াবাড়িমূলকভাবে এ তত্ত্বের উপর নির্ভর করেছেন, বিশেষত যৌনতার বিষয়ে। যা হোক বঞ্চনা মানসিক ব্যাধির প্রধান কারণ। বঞ্চনা মানুষের মনে বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। যখন মানুষ অন্তরে কারো প্রতি বিদ্বেষ অনুভব করে তখন তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায় এবং যতক্ষণ না তাকে হত্যা বা লাঞ্ছিত করতে পারে ততক্ষণ শান্তি লাভ করতে পারে না। এ প্রতিশোধ স্পৃহাটি কি?

হিংসুক ব্যক্তি যখন কারো ভালো বা কল্যাণ দেখে তখন তার সমগ্র কামনা হয়ে ওঠে এটা যে, ঐ ব্যক্তি থেকে এ কল্যাণ যেন দ্রুত অপসারিত হয়। নিজের বিষয়ে তখন সে আর চিন্তা করে না, বরং ঐ ব্যক্তির অমঙ্গলের চিন্তায় মগ্ন হয়। সুস্থ চিন্তার মানুষ প্রতিযোগিতা করে, হিংসা করে না। সুস্থ মানুষ সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সব সময় নিজেকে নিয়ে চিন্তা করে। সব সময় এগিয়ে থাকার চিন্তা করা সুস্থতার পরিচয়, এটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু অন্যেরা সব সময় পিছে পড়ে থাক– এ চিন্তা অসুস্থতার পরিচায়ক। হিংসুক ব্যক্তির অসুস্থতা কখনো কখনো এতটা অধিক হয় যে, নিজের একশ' ভাগ ক্ষতি করেও যদি অপরের পাঁচ ভাগ ক্ষতি করা যায় তাতে সে খুশী।

'হিংসা' রোগের নমুনা

একটি প্রসিদ্ধ কাহিনী ইতিহাসের বইয়ে এসেছে। কোন এক খলিফার সময় একজন ব্যক্তি এক দাস কিনে এনেছিল। প্রথম দিন থেকেই সে তার সঙ্গে দাসের মতো আচরণ না করে বরং সম্মানিত ব্যক্তির মতো আচরণ করত। সব সময় ভাল খাবার দিত, তার জন্য ভাল পোষাক কিনত, বিশ্রামের জন্য উত্তম উপকরণ এনে দিত। মোট কথা, তার সঙ্গে নিজের সন্তানের মত আচরণ করত। মনে হতো লালন-পালনের জন্যই তাকে আনা হয়েছে। দাসটি লক্ষ্য করত তার মনিব সব সময়ই বিষন্ন ও চিন্তিত। কিন্তু তার কারণ সে জানত না। একদিন মনিব তাকে ডেকে বলল, "আমি তোমাকে মুক্ত করে দিতে চাই, সে সাথে প্রচুর অর্থও দিতে চাই। কিন্তু তুমি কি জান কেন তোমাকে এত আদর ও স্নেহ করেছি? এজন্য যে, তুমি যেন আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর। তুমি যদি তা রক্ষা কর তবে আমার আদর-স্নেহের প্রতিদান দিলে এবং এর জন্য আরো অধিক কিছু তোমাকে আমি দেব। কিন্তু যদি তা না কর তবে আমি তোমার উপর অসন্তুষ্ট।" দাস বলল, "যেহেতু আপনি আমার মনিব এবং আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন, আপনি যা বলবেন আমি তা-ই করব।" মনিব বলল, "না, তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমার ভয় হয় যদি রাজি না হও।" দাস বলল, "যে কোন প্রস্তাব দিন আমি রাজী হব।" যখন দাস প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো তখন মনিব বলল, "আমার অনুরোধ হলো একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমি তোমাকে নির্দেশ দেব। তুমি আমার মাথা গোড়া থেকে বিচ্ছিন্ন করবে।" দাস বলল, "আমি তা করতে পারব

না।" মনিব বলল, "না, অবশ্যই তোমাকে তা করতে হবে। কারণ তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ।" মাঝ রাতে মনিব দাসকে ঘুম থেকে জাগিয়ে একটি ধারালো ছুরি হাতে দিয়ে তাকে নিয়ে এক প্রতিবেশীর বাড়ীর ছাদে গেল আর বলল, "এখানেই আমার মস্তক বিচ্ছিন্ন কর, তারপর যেখানে ইচ্ছা চলে যাও।" দাস বলল, "কেন এটা করব?" সে বলল, "যেহেতু এই প্রতিবেশীকে আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। মৃত্যু আমার কাছে বেঁচে থাকার চেয়ে উত্তম। সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সে আমার থেকে অগ্রগামী। সব কিছুতেই সে আমার থেকে উত্তম অবস্থায় রয়েছে। আমি হিংসার আগুনে জ্বলে মরছি। আমি চাই সে খুনী বলে পরিচিত হোক ও শাস্তি ভোগ করুক। যদি এমন হয় তবেই আমি শান্তি পাব। আমার শান্তি এখানেই যে, যদি আমাকে এখানে হত্যা কর, কালকে সবাই বলবে (যেহেতু প্রতিদ্বন্দ্বীর লাশ তার বাড়ির ছাদে পাওয়া গেছে) সে-ই আমাকে হত্যা করেছে। অতঃপর তাকে বন্দী করা হবে ও পরে প্রাণদণ্ড দেয়া হবে। আমার ইচ্ছাও পূর্ণ হবে।" দাস বলল, "যেহেতু তুমি এমন বোকা লোক সেহেতু কেন আমি এটা করব না। তুমি এটার জন্যই উপযুক্ত।" অতঃপর সে মনিবের মাথা বিচ্ছিন্ন করল এবং টাকাগুলো নিয়ে চলে গেল। পরের দিন সবখানে খবর ছড়িয়ে পড়ল। ঐ বাড়ির মালিককে গ্রেফতার করা হলো। কিন্তু সবাই বলাবলি করতে লাগল যদি সে খুনীই হতো তবে নিজের বাড়ির ছাদে খুন করতে যাবে কেন? সম্ভবত কিছু একটা আছে। ব্যাপারটা রহস্যময়। দাসের বিবেক তাকে চিন্তায় ফেলল। অবশেষে বিচারকের কাছে গিয়ে সত্য ঘটনা বর্ণনা করে সে বলল, "আমি তার ইচ্ছাতেই তাকে হত্যা করেছি। সে প্রতিহিংসায় এতটা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, মৃত্যুকে জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। যখন প্রমাণিত হলো ঘটনা এ রকম তখন দাস এবং ঐ বাড়ির মালিক দু'জনকেই মুক্তি দেয়া হলো।

সুতরাং এটা বাস্তব যে, মানুষ প্রকৃতই হিংসা রোগে অসুস্থ হয়। কোরআন বলছে,

قد افلح من زكّيها و قد خاب من د سّيها

"সে-ই সফলকাম হলো যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করল এবং সে-ই অকৃতকার্য হলো যে তা প্রোথিত করল। কোরআনের প্রথম কর্মসূচী আত্মার পরিশুদ্ধি ও উন্নয়ন এবং হৃদয়কে মানসিক রোগ, সমস্যা, অশান্তি, অন্ধকার ও বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করা।

রূপান্তরিত মানুষ

রূপান্তরের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রূপান্তর অর্থ কি? নিশ্চয় শুনেছেন পূর্বকালে এক উম্মত ছিল যারা প্রচুর গুনাহের কারণে তৎকালীন নবীর দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ অন্য এক পশুতে পরিণত হয়েছিল। যেমন বানর, শূকর, নেকড়ে বা অন্য কোন প্রাণীতে। এটাকেই রূপান্তর বলা হচ্ছে। এই রূপান্তর প্রকৃতপক্ষে কিরূপ ছিল? মানুষ কি প্রকৃতই পশুতে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এখন এর ব্যাখ্যা করব। এটি অনস্বীকার্য যে, মানুষ দৈহিকভাবে রূপান্তরিত বা পশুতে পরিণত না হলেও মানসিক ও আত্মিকভাবে রূপান্তরিত বা পশুতে পরিণত হয়, এমনকি কখনো কখনো এত নিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত হয় যে, যার নজীর পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া বিরল। কোরআন বলছে– بل هم أضلُّ অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তু হতেও নিকৃষ্ট। এখন প্রশ্ন হলো মানুষ কি প্রকৃতই মানসিক ও আত্মিকতার দিক

থেকে পশুতে পরিণত হতে পারে? উত্তর হলো, হ্যাঁ। কারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব তার চারিত্রিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। যদি কোন মানুষের চারিত্রিক ও আত্মিক বৈশিষ্ট্য কোন হিংস্র প্রাণীর বা চতুস্পদ পশুর মত হয় তবে সে প্রকৃতই রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ তার আত্মা প্রকৃতই রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হয়ে এক পশুতে পরিণত হয়েছে। শূকরের দেহ তার আত্মার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু মানুষ দৈহিকভাবে শূকরের মত না হয়েও শূকরের সকল স্বভাব ধারণ করতে পারে। যদি কোন মানুষ এরূপ হয় তবে সে রূপান্তরিত হয়েছে। বাস্তব ও অন্তর্দৃষ্টিতে সে প্রকৃতই একটি শূকর বৈ কিছু নয়। তাই ত্রুটিযুক্ত মানুষ কখনো কখনো রূপান্তরিত মানুষে পরিণত হয়। আমরা এ সব কথা কম শুনি এবং অনেকেই মনে করেন এগুলো metaphoric বা allegory (রূপক) এবং এগুলো বিশ্বাস করতে চান না। কিন্তু এটা খুবই সত্য।

এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছে, "ইমাম যয়নুল আবেদীন (আ.)-এর সাথে আরাফাতের ময়দানে ছিলাম। উপর থেকে লক্ষ্য করলাম ময়দান হাজীতে পূর্ণ। ইমামকে উদ্দেশ্য করে বললাম : কি পরিমাণ হাজী এ বছর এসেছে আলহামদুলিল্লাহ্। ইমাম বললেন : চিৎকার এত বেশি, কিন্তু হাজী খুবই কম।" ঐ ব্যক্তি বলেছে, "তারপর জানি না ইমাম এমন দৃষ্টি শক্তি দান করলেন আমাকে এবং বললেন : লক্ষ্য কর। আমি লক্ষ্য করলাম সম্পূর্ণ ময়দান যেন পশুতে পূর্ণ– যেন পশু আলয়ের (চিড়িয়াখানা) মধ্যে সামান্য কিছু মানুষ চলাচল করছে। ইমাম বললেন : এখন দেখ বাতেন (অপ্রকাশ্য) কিরূপ! যারা অন্ত র্দৃষ্টিসম্পন্ন ও আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী তাঁদের নিকট এ বিষয়টি প্রদীপের মতই উজ্জ্বল। এখন যদি আধুনিক চিন্তাধারার কেউ তা অস্বীকার করতে চায় তাহলে ভুল করবে। আমাদের এখনকার সময়ও ব্যক্তি-বিশেষ ছিলেন এবং আছেন যাঁরা মানুষের সত্তাকে অনুভব করেন এবং দেখেন।

যে মানুষ চতুস্পদ জন্তুর মত শুধু খাওয়া, ঘুমানো, যৌন চাহিদা পূরণ ছাড়া (প্রাণীর) অন্য কোন চিন্তা করে না, তার চিন্তা শুধু এটাই যে, খাবে, ঘুমাবে আর দৈহিক আনন্দ অনুভব করবে, প্রকৃতপক্ষে তার আত্মা একটা চতুস্পদ জন্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। তার অন্তর একটি রূপান্তরিত মানুষে পরিণত হয়েছে। যার স্বভাব রূপান্তরিত, তার মানবিক বৈশিষ্ট্য রূপান্তরিত– কিভাবে তা ব্যাখ্যা দেব। অর্থাৎ তার মনুষ্যত্ব তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, ঐ স্থানে সে নিজের জন্য চতুস্পদ ও হিংস্র পশুর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

সূরা নাবায় আমরা পড়ি "সে দিন যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন তোমরা দলে দলে আসবে। এবং আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে ফলে তা বহু দ্বারে বিভক্ত হয়ে পড়বে। পর্বতকে বিচলিত করা হবে ফলে তা মরীচিকায় পরিণত হবে।" (সূরা নাবা : ১৮-২০) কিয়ামতের দিন মানুষ দলে দলে পুনরুত্থিত ও সমবেত হবে। রাসূলগণ সব সময়ই বলেছেন, শুধু মানুষের একটি দল মানুষের চেহারায় পুনরুত্থিত হবে। কোন কোন দল পিপীলিকার মত, কোন দল সাপের মত, কোন দল নেকড়ের মত চেহারা নিয়ে হাশরের ময়দানে আবির্ভূত হবে। কেন? এটা কি সম্ভব কোন কারণ ছাড়াই মহান আল্লাহ্ মানুষকে এ রকম আকৃতিতে পুনরুত্থিত করবেন? যে ব্যক্তির পৃথিবীতে মানুষকে ক্ষত বিক্ষত করা ছাড়া কোন কাজ ছিল না, যার সকল আনন্দ অন্যদের কষ্ট দেয়ার মধ্যে নিহিত ছিল সে প্রকৃতই একটি বিষাক্ত বিচ্ছু। তাই সে সেভাবেই পুনরুত্থিত হবে। যে ব্যক্তির বাঁদরামী করাই একমাত্র স্বভাব ছিল

কিয়ামতে প্রকৃতই সে বাঁদরের চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হবে। এমনিভাবে যার স্বভাব কুকুরের মতো সে কুকুর হিসেবে পুনরুত্থিত হবে। "মানুষ তার নিয়্যতের (কাজের) উপর ভিত্তি করেই পুনরুত্থিত হবে।" (মুসনাদে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯২)

কিয়ামতে মানুষ তার নিয়্যত, উদ্দেশ্য, ইচ্ছা, তার স্বভাব ও তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পুনরুত্থিত হবে। আপনি এ পৃথিবীতে কি চেহারাতে আছেন? কি হতে চান? কি বস্তু চান? আপনার ইচ্ছাগুলো কি মানুষের চাওয়া নাকি কোন হিংস্র পশুর চাওয়া? নাকি এক তৃণভোজীর মতো চাওয়া? যা আপনি চান আপনি তা-ই এবং সে চেহারাতেই আপনি পুনরুত্থিত হবেন যে রকম আছেন।

এটাই আমাদের আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কিছুর উপাসনা থেকে বিরত করে। আমরা যা কিছুর উপাসনা করব তার মতোই হব। যদি টাকার উপাসনা করি, যদি অর্থ আমাদের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের অংশে পরিণত হয়, এ অর্থ কিয়ামতে সে-ই উত্তপ্ত ধাতব পদার্থে পরিণত হবে। কোরআন এ পৃথিবীতে যাদের অস্তিত্ব এই ধাতব পদার্থের অস্তিত্বের সাথে মিশে গিয়েছে এবং এই ধাতুর উপাসনা ছাড়া যার কোন কাজ নেই তাদের উদ্দেশ্যে বলেছে, "এবং যারা সোনা-রূপা মজুদ করে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। সে দিন তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও তাদের পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। এবং বলা হবে এটা সেই বস্তু যা তোমরা নিজেদের জন্য প্রস্তুত করতে।" (সূরা তাওবা : ৩৪-৩৫)

এ অর্থই সে দিন উত্তপ্ত করা হবে– তার জন্য জাহান্নামের আগুনে পরিণত হবে। এটা অন্যতম উপাদান যা মানুষকে রূপান্তরিত করে।

আমি এ বৈঠকে ত্রুটিযুক্ত ও ত্রুটিহীন মানুষের বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে চাচ্ছিলাম। সমস্যাগ্রস্ত (মানসিক) মানুষ একজন ত্রুটিপূর্ণ মানুষ। যে মানুষ পৃথিবীর কোন বস্তুকে উপাসনা করে– তার দৈনন্দিন কাজে বস্তু ব্যবহারকারী নয়, বরং এর উপাসনাকারী– সে মানুষ ত্রুটিযুক্ত এবং একজন রূপান্তরিত মানুষ।

পবিত্র রমযান মাসের মানুষ গঠনের পরিকল্পনা

আসলেই পবিত্র রমযান মাসের কর্মসূচী মানুষ গঠনের পরিকল্পনার । অর্থাৎ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য এটাই যে, এ মাসে ত্রুটিযুক্ত মানুষ নিজেকে ত্রুটিহীন মানুষে এবং ত্রুটিহীন মানুষ নিজেকে পূর্ণ মানুষে পরিণত করবে। এ পবিত্র মাসের পরিকল্পনা নাফ্স বা প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধি, মানবীয় ত্রুটি ও অপূর্ণতার সংশোধন, প্রবৃত্তির জৈবিক তাড়নার উপর বুদ্ধিবৃত্তি, ঈমান ও ইচ্ছাশক্তির বিজয় ও নিয়ন্ত্রণ।

এর জন্য দোয়ার কর্মসূচী, সত্যের পথে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র দিকে উড্ডয়ন, আত্মার উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী, আত্মাকে বিকাশমান ও গতিশীল করার পরিকল্পনা দেয়া হয়েছে। যদি এমন হয় যে, পবিত্র রমযান মাস এল, মানুষ ত্রিশ দিন ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও নিদ্রাহীন থাকল, উদাহরণস্বরূপ রাত্রিগুলোতে অনেক সময় জেগে থাকল, এখানে ওখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করল, তারপর ঈদ আসলো, কিন্তু রমযানের পূর্বের দিন থেকে তার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি, তাহলে ঐ রোযা তার জন্য কোন উপকারই বয়ে আনেনি। ইসলাম তো এটা চায় না যে, মানুষ এমনিই মুখ বন্ধ করে রাখবে।

মানুষ মুখ বন্ধ করুক আর না করুক ইসলামের জন্য কোন পার্থক্য নেই, বরং রোযা রাখার উদ্দেশ্য হলো এটা যে, মানুষ সংশোধিত হবে। কেন হাদীসসমূহে এমন এসেছে, প্রচুর রোযাদার আছে যারা রোযা থেকে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা ছাড়া আর কিছুই লাভ করে না, তাদের রোযা শুধু ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকা ছাড়া কিছুই নয়। হালাল খাদ্য থেকে মুখ বন্ধ করার অর্থ মানুষ এ ত্রিশ দিন একনাগাড়ে অনুশীলন করবে হারাম কথা থেকে জিহ্বাকে বিরত রাখার, গীবত না করার, মিথ্যা না বলার ও গালি না দেয়ার।

রোযা যে বাতেনী, আধ্যাত্মিক ও আত্মিক তার প্রমাণ– একদিন এক রোযাদার মহিলা রাসূল (সা.)-এর নিকট আসল। রাসূল দুধ অথবা অন্য কিছু খাওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করলেন। তার দিকে তা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নাও পান কর।" সে বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি রোযা আছি।" রাসূল বললেন, "তুমি রোযা রাখনি এবং এ বলে পুনরায় তাকে খেতে নির্দেশ দিলেন।" মহিলা বলল, "আসলেই আমি রোযা আছি।" (যেহেতু তার বিবেচনায় রোযা আছে বলে মনে করল, যেমন বাহ্যিক রোযা আমার রাখি)। রাসূল বললেন, "তুমি কেমন রোযা রেখেছ যে, কিছুক্ষণ পূর্বেই তোমার মুমিন ভাই বা বোনের মাংস খেয়েছ (অর্থাৎ গীবত করেছ)। তুমি কি দেখতে চাও যে, মাংস খেয়েছ। ভেতর থেকে এখনই তা উল্টিয়ে ফেল।" তখনই সে বমি করল ও এক টুকরা মাংস তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল। মানুষ রোযা রেখে গীবত করে। ফলে যদিও তার মুখকে হালাল খাদ্য থেকে বঞ্চিত করে, কিন্তু তার আত্মার মুখকে হারাম খাদ্য দ্বারা পূর্ণ করে।

কেন আমাদের উদ্দেশ্যে এটা বলা হয়েছে যে, যদি মানুষ একটা মিথ্যা বলে তবে তার মুখের দুর্গন্ধে সপ্ত আসমান পর্যন্ত ফেরেশতারা কষ্ট পান। যেমন বলা হয় যখন মানুষ জাহান্নামে থাকবে তখন জাহান্নাম প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ছড়াবে। এ দুর্গন্ধ প্রকৃতপক্ষে এ দুনিয়াতেই আমরা সৃষ্টি করেছি মিথ্যা কথা বলা, গালি দেয়া, অপবাদ ও পরনিন্দা চর্চার মাধ্যমে।

পরনিন্দা ও মিথ্যা অপবাদ আরোপ গীবত থেকেও খারাপ, যেহেতু পরনিন্দার মাধ্যমে যেমন মিথ্যাও বলা হয় তেমন গীবতও করা হয়। কিন্তু যে মিথ্যা বলে সে শুধু মিথ্যাই বলে, গীবত করে না। তাই পরনিন্দায় দু'টি কবীরা গুনাহ এক সঙ্গে আঞ্জাম দেয়া হয়।

এটা কি উচিত, রমযান মাস শেষ হয়ে যায়, অথচ এ মাসে আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে নিন্দা ও অপবাদ আরোপ করতে থাকি? রমযান মাস এজন্য যে, মুসলমানরা বেশি বেশি সমবেত হবে, সম্মিলিতভাবে ইবাদত করবে, মসজিদে একত্র হবে। এজন্য নয় যে, একে অপরকে দূরে সরানোর জন্য এ মাসকে ব্যবহার করবে।

وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

২

মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

و إذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهنّ قال إنّي جاعلك للنّاس إماماً قال و من ذرّيّتي قال لا ينال عهدي الظّالمين

.

প্রত্যেক অস্তিত্বশীল বস্তু বা প্রাণীর পূর্ণতার সঙ্গে অন্য অস্তিত্বশীল বস্তু বা প্রাণীর পূর্ণতার পার্থক্য রয়েছে। যেমন পূর্ণ মানুষ এবং পূর্ণ ফেরেশতা এক নয়। যদি কোন ফেরেশতা, ফেরেশতা হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচচ পর্যায়ে বা সম্ভাব্য পূর্ণতার শেষ প্রান্তে পৌঁছায়, তা মানুষের মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণতার সর্বোচচ পর্যায়ে পৌঁছানো থেকে ভিন্ন।

মানুষের পূর্ণতার সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর পূর্ণতার পার্থক্যের কারণ

যিনি আমাদের ফেরেশতাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানিয়েছেন তিনি (আল্লাহ্) বলেছেন, ফেরেশতারা এমন এক সৃষ্টি যাঁরা নিখাদ আকল দিয়ে সৃষ্ট হয়েছেন, তাঁদের সৃষ্টির মূল কেবল চিন্তা ও বিবেচনা ছাড়া কিছুই নয় অর্থাৎ পার্থিব, জৈবিক চাহিদা, উত্তেজনা, উগ্রতা এগুলোর অস্তিত্ব নেই। অন্যদিকে অন্যান্য জীব শুধু শারীরিক এবং কোরআন যাকে রূহ বলছে তা থেকে বঞ্চিত। শুধু মানুষই একমাত্র সৃষ্টি যে ফেরেশতাদের যা আছে তা লাভ করেছে আবার অন্যান্য সৃষ্টির যা আছে তারও সে অধিকারী। সে যেমন স্বর্গীয় তেমন পার্থিব। সে যেমন সর্বোচচ সৃষ্টি তেমনি সর্ব নিকৃষ্টও হতে পারে। এরই ব্যাখ্যায় উছুলে কাফীতে একটি হাদীস এসেছে এবং আহ্‌লে সুন্নাতও এর কাছাকাছি হাদীস বর্ণনা করেছে। মাওলানা রুমী তাঁর মাসনভীতে এ হাদীস এভাবে কবিতার মাধ্যমে এনেছেন–

"হাদীসে এসেছে গৌরবময় স্রষ্টা মহাজন,
সৃষ্টি জগতে করিলেন তিন রকম সৃজন।"

তারপর বলছেন, এক দলকে নিখাত নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন অন্য দলকে (উদ্দেশ্য জীবজন্তু) শুধুই উত্তেজনা এবং জৈবিক চাহিদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু মানুষকে এ দু'য়ের মিশ্রণে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং পরিপূর্ণ মানুষ যেমন একটি পরিপূর্ণ পশুর থেকে ভিন্ন (উদাহরণস্বরূপ সর্বোৎকৃষ্ট ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত একটি ঘোড়া থেকে আলাদা) তেমনি একজন পূর্ণ ফেরেশতা থেকেও ভিন্ন।

ফেরেশতা ও অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের পার্থক্যের কারণ তার সত্তার উপাদান যেমন কোরআন বলছে, "আমরা মানুষকে এমন বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি যাতে অনেক কিছুর মিশ্রণ রয়েছে।" আধুনিকতার ভাষায় বললে তার জীনগুলোতে বিভিন্ন ধরনের মেধা, যোগ্যতা ও ক্ষমতার সমন্বয় হয়েছে। মানুষ এমন মর্যাদায় পৌঁছেছে যে, আমরা তাকে পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করেছি। এটি অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ মানুষ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আমরা তাকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত পরীক্ষা ও নম্বর প্রদানের জন্য যোগ্য মনে করেছি। انّا خلقناَ الإنسانَ من نطفة أمشاج নিশ্চয়ই মানুষকে এমন বীর্য যা বহু গুণাবলী ও শক্তির মিশ্রণ তা থেকে সৃষ্টি করেছি। এজন্যই তাকে পরীক্ষা, পুরস্কার, শক্তি ও নম্বর প্রদান করেছি। কিন্তু অন্য কেউ যোগ্যতা রাখে না।

فجعلناهُ سميعاً بصيراً إنّا هديناه السّبيلَ إماّ شاكراً و إمّا كفوراً

"অতঃপর আমরা তাকে সম্যক শ্রবণকারী এবং দর্শনকারী করেছি। নিশ্চয় আমরা তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছি, হয়তো সে কৃতজ্ঞ হবে, নয়তো সে অকৃতজ্ঞ হবে।" (সূরা দাহর: ২-৩)

এর থেকে ভালো ও সুন্দরভাবে মানুষের স্বাধীনতা ও এখতিয়ার এবং এর মূল ভিত্তিকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছি, উত্তীর্ণের পথও তাকে বলে দিয়েছি। এখন সে নিজেই বেছে নিবে কোন্ দিকে সে যাবে।

সুতরাং কোরআনের এ বর্ণনা থেকে পরিষ্কার হয় যে, পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার কারণ এ বহুবিধ গুণাবলী ও শক্তি। তাই ফেরেশতার সঙ্গে তার পার্থক্য।

মূল্যবোধগুলোর বিকাশে ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

মানুষের পূর্ণতা তার ভারসাম্যতার মধ্যেই নিহিত। অর্থাৎ মানুষ বহুবিধ যে যোগ্যতা ও শক্তির অধিকারী তা তাকে তখনই পূর্ণ মানুষে পরিণত করে যখন সে শুধু একদিকে ঝুঁকে না পড়ে এবং অন্যান্য দিকগুলোকে উপেক্ষা বা নিষ্ক্রিয় করে না রাখে, বরং সবগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং সমভাবে এগুলোর বিকাশে সচেষ্ট ও মনোযোগী হয়। যেমনভাবে জ্ঞানীরা বলেন প্রকৃতপক্ষে আদল বা সুবিচারের প্রত্যাবর্তন ভারসাম্য ও সমন্বয়ের দিকেই। এখানে ভারসাম্য ও সমন্বয়ের উদ্দেশ্য এটাই যে, মানুষের যোগ্যতাসমূহের বিকাশের সাথে সাথে সেগুলোর মধ্যে যেন সমন্বয় থাকে। একটি সহজ উদাহরণের মাধ্যমে আপনাদের নিকট সেটা পরিষ্কার করছি। একটি শিশুর যে দৈহিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে, যেমন তার হাত, পা, মাথা, কান, নাক, জিহ্বা, মুখ, দাঁত, চোখ, হৃৎপিণ্ড, কলিজা, পেট, পরিপাকতন্ত্র এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ অবশ্যই ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে। সে শিশুই সুস্থ ও সম্পূর্ণ যার এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঠিকভাবে বিকাশ লাভ করেছে। ধরি একজন মানুষের শুধু নাক বিকাশ লাভ করেছে এবং অন্যান্য অঙ্গ বিকাশ লাভ করেনি (যেমন কার্টুনে দেখা যায়) অথবা শুধু চোখ অথবা মাথার বৃদ্ধি ঘটেছে, কিন্তু দেহের বিকাশ হয়নি অথবা এর উল্টোটা। এমনিভাবে কারো হয়তো হাতের বৃদ্ধি ঘটেছে, কিন্তু পায়ের বৃদ্ধি ঘটেনি বা পায়ের বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু হাতের হয়নি– এমন মানুষের বিকাশ ঘটেছে, তবে তা ভারসাম্যপূর্ণ নয়।

পরিপূর্ণ মানুষ সে-ই যার মধ্যে সকল মূল্যবোধেরই বিকাশ ঘটবে এবং কোন মূল্যবোধই বিকাশহীন অবস্থায় থাকবে না, সে সাথে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় রেখে মূল্যবোধগুলো সর্বোচচ পর্যায়ে পৌঁছবে। পূর্ণ মানুষ সেই মানুষ যাকে কোরআন ইমাম বলে সম্বোধন করেছে–

و إذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتَمّهنّ قال إنّي جاعلك للنّاس إماماً

"এবং যখন ইবরাহীমকে তার প্রভু কতিপয় আদেশবাণী দ্বারা পরীক্ষা করলেন এবং তিনি তাতে উত্তীর্ণ হলেন, (তখন) বলা হলো নিশ্চয় আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য ইমাম ও নেতা নিযুক্ত করলাম।" (সূরা বাকারাহ্ : ১২৪)

ইবরাহীম (আ.) যখন কয়েকটি বিচিত্র ও বড় ঐশী পরীক্ষায় অবতীর্ণ ও উত্তীর্ণ হলেন এবং সর্বোচচ নম্বর প্রাপ্ত হলেন তখনই পূর্ণ মানব বা ইমামতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন। ইবরাহীম (আ.)-এর অন্যতম বড় পরীক্ষা ছিল আল্লাহ্‌র আদেশে তাঁর পথে নিজ সন্তানকে নিজের হাতে কুরবানী করার প্রস্তুতি। তাঁর আনুগত্য এ পর্যায়ে ছিল যে, যখন তিনি জানলেন আল্লাহ্ তাঁকে এমন নির্দেশ দিয়েছেন তখন কোন দ্বিধা ছাড়াই তা করতে রাজী হলেন।

اسلماَ و تلّهُ للجبينِ وناديناهُ اَن ياابراهيمُ قد صدّقتَ الرّؤيا

"অতঃপর তারা উভয়েই (আল্লাহ্‌র সমীপে) আত্মসমর্পণ করলেন এবং তিনি তাকে যবেহ করার জন্য কপালের উপর উপুড় করে শোয়ালেন।" অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.) যেমন কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত ইসমাইল (আ.)ও তেমন কুরবানী হওয়ার জন্য প্রস্তুত। তখন আল্লাহ্ তাঁকে আহ্বান করে বললেন, "হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করেছ।" তোমার নিকট আমরা যা চেয়েছি তা এ পর্যন্তই। আমরা প্রকৃতই চাইনি তুমি তোমার সন্তানকে যবেহ কর, বরং শুধু দেখতে চেয়েছি তোমার অনুগত্যের সীমা আমার নির্দেশ ও সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে কতটুকু।

অতঃপর যখন ইবরাহীম (আ.) আগুনে নিক্ষেপ থেকে ও সন্তানকে কুরবানীর প্রস্তুতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং একাই এক গোত্র ও জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন তখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হলো "আমরা তোমাকে মানব জাতির জন্য ইমাম মনোনীত করলাম।" তুমি এখন সে পর্যায়ে পৌঁছেছো যে, আদর্শ হতে পার। অন্যদের ইমাম ও নেতা হতে পার। ভিন্নভাবে বলা যায়, তুমি পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হয়েছ, তাই অন্য সকল মানুষ পরিপূর্ণ মানুষ হতে চাইলে তোমাকে অনুসরণ করবে।

হযরত আলী (আ.) একজন পূর্ণ মানব। এজন্য যে, সকল মানবিক মূল্যবোধ তাঁর মধ্যে 'সর্বোচচ পর্যায়ে' এবং 'সম্পূর্ণ ভারসাম্য সহকারে' বিকাশ লাভ করেছে অর্থাৎ তিনটি শর্তই তাঁর মধ্যে পূর্ণ হয়েছে।

এখন সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করব। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা অনেকে না দেখে থাকলেও অবশ্যই এর কথা শুনেছেন। সমুদ্রে সব সময়ই জোয়ার-ভাটা হয়। কখনো পানি একদিকে আকর্ষিত হয় কখনো অন্য দিকে। সমুদ্র সব সময়ই উত্তাল ও গর্জনশীল। মানুষের আত্মাও সব সময় অস্থির, কখনো তা একদিকে কখনো অন্যদিকে আকর্ষিত হয়। সমাজও তেমনি, কখনো একদিকে কখনো অন্যদিকে ধাবিত হয়। সমাজের প্রবণতার উৎস হয়তো কোন ব্যক্তিবর্গ বা আন্দোলন বা অন্য কোন কারণ, কিন্তু আকর্ষণ যে আছে এটা সত্য।

এমনকি মানুষের মানবিক মূল্যবোধসমূহও এরূপ। যেমন আপনারা এক শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে দেখেন যাদের প্রবণতা প্রকৃতই মানবীয় প্রবণতা। কিন্তু কখনো কখনো তাদের মধ্যে কোন কোন মানবিক মূল্যবাধ একপেশেভাবে একদিকে এমনভাবে ধাবিত হয় যে, অন্যান্য সকল মূল্যবোধকে তারা ভুলে যায়। তখন এর আকৃতি সেই ব্যক্তির মত হয় যার শুধু কান, নাক বা হাত বিকাশ লাভ করেছে।

এটি একটি লক্ষণীয় বিষয় যে, প্রায়ই সমাজ কোন প্রবণতার দ্বারা আকর্ষিত হয়ে একশ' ভাগ বিচ্যুতি বা পথভ্রষ্টতার দিকেই শুধু ধাবিত হয় না, বরং বাড়াবাড়ির মাধ্যমে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। অধিকাংশ মানুষ এভাবেই সে দিকে ঝুঁকে পড়ে।

বিশেষ মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির নমুনা

১. ইবাদত : অন্যতম মানবিক মূল্যবোধ ইসলাম যাকে শত ভাগ গূরুত্ব দেয় তা হলো ইবাদত। এখানে ইবাদত যে বিশেষ অর্থে সাধারণত ব্যবহৃত হয় সেটা বলাই আমাদের লক্ষ্য। যেমন একান্ত ভাবে খোদার সঙ্গে বসা, নামায, দোয়া, মোনাজাত, তাহাজ্জুদ ও এ ধরনের অন্যান্য যে বিষয় ইসলামে রয়েছে এবং ইসলাম থেকে যেগুলো বিচিছন্ন করা যায় না।

ইবাদত প্রকৃতপক্ষেই একটি মূল্যবোধ। কিন্তু যদি সাবধানতা অবলম্বন না করা হয় তবে সমাজ এ মূল্যবোধের চরম বাড়াবাড়ির দিকে ধাবিত হবে অর্থাৎ ইসলাম বলতে বুঝাবে শুধু ইবাদত করা, মসজিদে যাওয়া, মুস্তাহাব নামায পড়া, দোয়া করা, মিলাদ পড়া, মুস্তাহাব গোসল করা, কোরআন তেলাওয়াত। কোন কোন সমাজ এ পথে বাড়াবাড়ির এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, অন্য সকল মূল্যবোধকে প্রায় মুছে ফেলে। এর উদাহরণ আমরা ইসলামের ইতিহাসে দেখেছি। এ ধরনের প্রবণতা ইসলামী সমাজে, এমনকি ব্যক্তির মধ্যেও ছিল। এজন্য শত ভাগ অনুভূতিহীন এই সকল ব্যক্তিকে একেবারে দায়ী করা যায় না। কারণ এরা এক মরুভূমিতে জীবন যাপন করত এবং যখন এ রাস্তায় তাদেরকে টেনে আনা হয়েছে তখন তারা এর ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি। এমন ব্যক্তি বুঝতে সক্ষম নয় যে, আল্লাহ্ তাকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, ফেরেশতা হিসেবে নয়। যদি সে ফেরেশতা হতো তাহলে এ পথে চলতে পারত। তাই মানুষের উচিত তার বিভিন্ন মূল্যবোধকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে বিকাশ ঘটানো।

রাসূলে আকরাম (সা.)-এর নিকট খবর পৌঁছল যে, কিছু সংখ্যক সাহাবী ইবাদতে মশগুল হয়েছেন। রাসূল রাগান্বিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে মসজিদে আসলেন এবং কিছুটা উচৈচঃস্বরে বললেন, مابالُ اقوامٍ؟ "এই দলের কি হয়েছে? (যদি আমাদের ভাষায় বলি, তাহলে বলতে হয়– এদের কি অসুখ হয়েছে?) শুনলাম এমন সব ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, আমি তো তোমাদের নবী, তদুপরি এমন নই। কখনই রাত থেকে সকাল পর্যন্ত ইবাদত করি না, বরং এর কিছু অংশ বিশ্রাম করি এবং কিয়দংশ ঘুমাই। আমি আমার স্ত্রী ও পরিবারের জন্য সময় দিই। আমি প্রতিদিন রোযা রাখি না, কোন কোন দিন রোযা রাখি, কোন কোন দিন ছেড়ে দিই। যারা এ ধরনের পথকে বেছে নিয়েছে অর্থাৎ দুনিয়াত্যাগী হয়েছে তারা আমার সুন্নাত থেকে বের হয়ে গেছে।"

নবী (সা.) যখন অনুভব করেছেন একটি মূল্যবোধ অন্য সকল ইসলামী মূল্যবোধকে নিঃশেষ করে দিচেছ এবং ইসলামী সমাজ একদিকে ঝুঁকে পড়েছে তখন শক্তভাবে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন।

আমর ইবনে আসের দু'জন পুত্র ছিল। একজনের নাম মুহাম্মদ যে তার পিতার মতই দুনিয়াদার এবং দুনিয়াপূজারী, অন্যটির নাম আবদুল্লাহ্ যে তুলনামুলকভাবে শান্ত, ভালো ও ভদ্র। সাধারণত এ দু'পুত্রের সঙ্গে পিতা যে পরামর্শ করত তাতে আবদুল্লাহ্ পিতাকে আলী (আ.)-এর দিকে দাওয়াত করত এবং মুহাম্মদ পিতাকে বলত আলীর পক্ষে থেকে কোন লাভ নেই, তাই মুয়াবিয়ার দিকে যাও। রাসূল (সা.) একবার আবদুল্লাহ্র নিকট গিয়ে বললেন, "আমাকে খবর দেয়া হয়েছে যে, তুমি রাত্র হতে সকাল পর্যন্ত ইবাদত কর আর দিনের বেলা রোযা রাখ।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্।" রাসূল বললেন, "আমি এরূপ করি না এবং এটা ঠিকও নয়। তুমি এটা ত্যাগ কর।"

কখনো সমাজ যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা বা আত্মসংযম) অবলম্বন করতে গিয়ে বৈরাগ্যের দিকে ধাবিত হয়। যুহদ একটি প্রয়োজনীয় বস্তু যা অস্বীকার করা যায় না। এটি একটি মূল্যবোধ যার উপকারী ও ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এটি ব্যতীত সমাজ সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারে না। যে সমাজে এটি নেই সে সমাজকে ইসলামী সমাজ বলা যায় না। কিন্তু কখনো কখনো এই মূল্যবোধ সমাজকে এমনভাবে নিজের দিকে টেনে নিয়ে যায় তখন সমাজে যুহদ ছাড়া কিছুই থাকে না।

২. সৃষ্টির সেবা : ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য মূল্যবোধ আল্লাহ্র সৃষ্টির সেবা যা প্রকৃতই একটি মানবীয় মূল্যবোধ। এ বিষয়ে রাসূল (সা.) অত্যন্ত তাকিদ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআন একে অপরকে সহযোগিতা ও সাহায্য করার ব্যপারে বলছে,

ليسَ البرَّ أن تولّوا وجوهكم قبلَ المشرق و المغرب و لكنَّ البرَّ من آمن باللّهِ واليوم الآخر والملائكةِ والكتابِ والنَّبيِّينَ وَ آتىَ المالَ على حبّه ذوى القربىَ وَ اليتامى و المساكينَ و ابن السّبيلِ وَ السّائلينَ وَ في الرّقابِ

"এটা পুণ্যকর্ম নয় যে, তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডলকে পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে ফেরাও, বরং প্রকৃত পুণ্যবান ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ এবং নবিগণের উপর ঈমান রাখে এবং তাঁরই প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীদের এবং বন্দী মুক্তির জন্য ধন-সম্পদ খরচ করে।" (সূরা বাকারাহ্ : ১৭৭)।

কিন্তু মানুষ হঠাৎ করে শেখ সা'দীর মতো হয়ে (যদিও ব্যবহারিক জীবনে সা'দী এরূপ ছিলেন না) কবিতার ভাষায় বলে ওঠে, "ইবাদত সৃষ্টির সেবা ছাড়া কিছুই নয়।" শুধু এটা করলেই যথেষ্ট। কেউ কেউ এটা বলার মাধ্যমে ইবাদতের গুরুত্বকে অস্বীকার করে। আত্মসংযমের মূল্যবোধকে অস্বীকার করে। জ্ঞানার্জন ও জিহাদের গুরুত্বকে অস্বীকার করে। এ সকল মহামূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ যা ইসলামে রয়েছে তা অস্বীকার করে বসে। বলে যে, 'জানেন মনুষ্যত্ব কি? মনুষ্যত্ব হলো আল্লাহ্র সৃষ্টির সেবা।' বিশেষ করে আজকালের কিছু বুদ্ধিজীবী মনে করেন একটি অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি হাতে পেয়েছেন যার নাম মানবতাবাদ ও মানবপ্রেম। মানবপ্রেম কি? তাঁরা বলেন, সৃষ্টির সেবা করা। আমরা আল্লাহ্র সৃষ্টির সেবা করছি। আমরা বলি, অবশ্যই আল্লাহ্র সৃষ্টির সেবা করতে হবে। কিন্তু ঐ খোদার সৃষ্টি নিজে কি হবে? ধরে নিলাম যে, আল্লাহ্র সৃষ্টির উদরকে পূর্ণ করলাম, তার দেহকে বস্ত্র দ্বারা

আচ্ছাদিত করলাম তাতে স্রষ্টার সৃষ্টির সেবা একটি পশুকে সেবা দানের সমান হয়েছে, এর বেশি কিছু নয়। যদি আমরা মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় কোন মূল্যবোধকে গ্রহণ না করে শুধু সৃষ্টির সেবার মূল্যবোধকে গ্রহণ করি তাহলে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মূল্য ছাগল বা ঘোড়ার সমপর্যায়ের হবে। যদি মানুষ একটি প্রণীকে খাদ্য দেয়, তবে অবশ্যই সে একটি কাজ করেছে। কিন্তু মানুষের সর্বোচচ মর্যাদা কি এটা যে, আমার মতো অন্যান্য প্রাণীকে সেবা করব? না, মানব সেবার এর থেকেও বড় মূল্যবোধ রয়েছে। কিন্তু শর্ত হলো 'মানুষ কি' সেটা জানতে হবে। সব সময়ই (এ কথা বলে উদাহরণ দিই) : লুলুম্বাও একজন মানুষ, মুসা চুম্বাও একজন মানুষ। যদি বিষয়টি শুধু সৃষ্টির সেবা হয় তবে মুসা চুম্বাও এক সৃষ্টি লুলুম্বাও অন্য এক সৃষ্টি এদের মধ্যে কেন পার্থক্য করব। আবু যার (রা.) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সেবার দৃষ্টিতে কি দু'জনকেই সেবা করতে হবে?

সুতরাং মানবিকতা অর্থাৎ সৃষ্টির সেবাকে যদি একমাত্র মূল্যবোধ ধরা হয়, তবে তা এক ধরনের বাড়াবাড়িই হবে।

৩. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা একটি বড় ও উচচ পর্যায়ের মানবিক মূল্যবোধ। অন্যভাবে বলা যায়, এটা মানুষের নৈতিকতা ও আত্মিকতার বিষয় অর্থাৎ পশু পর্যায়ের অনেক উপরের বিষয়। স্বাধীনতা মানুষের বস্তুগত মূল্যবোধের ঊর্ধ্বের একটি মূল্যবোধ। কোন মানুষের মধ্যে যদি মনুষ্যত্বের কিছুমাত্র থাকে, তবে সে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, বস্ত্রহীন বা সবচেয়ে কঠিন অবস্থায় জীবন যাপন করতে পারে, কিন্তু কারো দাস হতে রাজী নয়। সে কারো অধীনে থাকতে চায় না, বরং স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে চায়।

নিশ্চয় জানেন দুঃখজনকভাবে ইবনে সিনা কিছুদিন বাদশাহ্‌র উজির ছিলেন। তাঁর জীবনের তৎসময়ের একটি চমৎকার গল্প 'নামেহ্-ই-দানেশওয়ারান' গ্রন্থে এসেছে– একদিন তিনি রাজকীয় আভিজাত্যময় পোশাক পরে রাস্তা দিয়ে যাচিছলেন। তিনি দেখলেন এক মেথর পঁচা ময়লা ও আবর্জনা পরিষ্কার করছে আর এ কবিতা পড়ছে–

"আমি গর্বিত আমার আত্মসম্মানকে নিয়ে,
যেহেতু আমার হৃদয়ের জন্য এ বিশ্বকে সহজ করে দিয়েছে।"

আবু আলী সিনা এটা শুনে মুচকি হেসে চিৎকার করে ডেকে তাকে বললেন, "বাস্তবে সম্মান ও মর্যাদার সীমা কি এটাই যা তুমি তোমার নিজের সম্পর্কে বলছ। চিন্তা করেছ কি যার আত্মমর্যাদাবোধ তাকে নর্দমার গর্তে নিকৃষ্ট মেথরের কাজে নিয়োজিত করেছে। যার ইজ্জত ও সম্মান এটাই যে, অসম্মান ও অমর্যাদার মধ্যে পড়ে আছে, মূল্যবান জীবনকে মানবেতর পথে ধ্বংস করছে, তাকে নিয়ে তুমি গর্ব করছ?" মেথর লোকটি কাজ বন্ধ করে সংক্ষেপে জবাব দিল, "পৃথিবীতে সম্মান এটাই যে, খাদ্যের জন্য নীচ পর্যায়ের কাজ হলেও করা, কিন্তু কোন প্রভুর অধীনে না থাকা" (অর্থাৎ স্বাধীনতার অর্থ কোন প্রভুর মন যুগিয়ে চলা নয়)। আবু আলী লজ্জিত হয়ে দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

আবু আলী দেখলেন বাস্তবিকই এটি এমন যুক্তি যার কোন জবাব নেই। বস্তুগত ও পাশবিক দৃষ্টিতে এর কোন অর্থ হয় না যে, মানুষ মুরগী, পোলাও, দাস-দাসী, অশ্ব ও অর্থকে ত্যাগ করে মেথর হয়ে স্বাধীনতা লাভ ও আত্মতৃপ্তির কথা বলে। স্বাধীনতা ও মুক্তি কি? এটা কি পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব

করার মত বিষয়? না, এ রকম কিছু নয়। কিন্তু মানুষের বিবেকের কাছে স্বাধীনতার গুরুত্ব এত অধিক যে, বন্দিত্ব থেকে মেথর হওয়াকে প্রাধান্য দেয়।

স্বাধীনতা প্রকৃতই একটি বড় মূল্যবোধ। কখনো দেখা যায় একটি সমাজে এই মূল্যবোধ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। কখনো দেখা যায় এই অনুভুতি জেগে উঠেছে। কেউ কেউ বলেন মানুষের মনুষ্যত্ব তার স্বাধীনতা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। তাঁদের মতে এটি ছাড়া অন্য কোন মূল্যবোধই যেন নেই অর্থাৎ তাঁরা চান সকল মূল্যবোধকেই এই এক মূল্যবোধের মধ্যে মুছে ফেলতে। কিন্তু স্বাধীনতা একমাত্র মূল্যবোধ নয়। ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার, প্রজ্ঞা স্বতন্ত্রভাবে একেকটি মূল্যবোধ। জ্ঞান একটি মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিকতা একটি মূল্যবোধ, এরূপ অন্য সকল মূল্যবোধ।

৪. ইশ্‌ক বা ভালবাসা : কখনো কখনো ইশ্‌ক বা প্রেম একমাত্র মূল্যবোধে পরিণত হয় যেরূপ এরফান (আধ্যাত্মিক), তাসাউফ ও সুফী গজলগুলোতে দেখা যায়।

"ফেরেশতা জানে না ভালবাসা কি এই সাকী,
ঢালতে যদি চাও শরাব তবে ঢাল আদমেরই পায়।"

তখন তারা অন্যান্য সকল মূল্যবোধকে, এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবোধকেও ভুলে যায়। আরেফগণ ইশ্‌কের প্রতি যে টান অনুভব করেন অনেক সময় তা পুরোপুরি বুদ্ধিবৃত্তির বিরোধী ও এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। হাফেজ শিরাজী বলেন,

"সুফীর কাছেই রয়েছে রহস্যকে জানার আলো
সব কিছুর গোপন ভেদ এর থেকেই জানো,
ভোরে ডাকা মোরগই জানে 'সকল ফুলের'* ব্যাখ্যা
প্রতিটি কুক কুরুকের অর্থ তার জানা।"

(*সকল ফুল অর্থ আল্লাহ্‌র সত্তা যা সকল পূর্ণতার সমষ্টি।)

তিনি বলতে চান, কেবল আরেফই পারে ভালবাসার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তে পৌঁছতে। কয়েক ছত্র পরেই বলছেন,

"এই আকলের খাতা থেকে প্রেমের যে বাণী শিখেছ হায়,
শংকিত আমি জান না সত্যিই– যা জানার তায়।"

এ ছত্রে তাঁর লক্ষ্য আবু আলী সিনার পুস্তক 'ইশারাত' যাতে তিনি ইশ্‌কের ব্যাপারে কথা বলেছেন। সুতরাং তাঁদের দৃষ্টিতে মানুষ ও মনুষ্যত্বের অর্থ হলো ইশ্‌ক এবং আকল একটি হাতকড়া, বেড়ী বা শৃঙ্খল বৈ কিছু নয়; তাই তা সম্পূর্ণরূপে নিন্দিত।

এক সময় দেখা যায় একমাত্র মূল্যবোধ বলতে হয়ে যায় শুধুই আকল এবং চিন্তা। বলা হয় এগুলো (ভালবাসা ও অন্যান্য মূল্যবোধ) আবার কি? এগুলো খেয়ালী ও গুরুত্বহীন যেমন-তেমন বিষয়। আবু আলী সিনা কখনো তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, "এ শব্দগুলো সুফীদের খেয়ালী ও কল্পিত বস্তু, আমাদের উচিত আকল বা বুদ্ধিবৃত্তির উপর ভর করে এগিয়ে যাওয়া।"

এ সকল প্রকার মূল্যবোধই মানুষের মধ্যে রয়েছে, যেমন বুদ্ধিবৃত্তি, স্নেহ-ভালবাসা, আকর্ষণ, ন্যায়বিচার, খেদমত (মানুষের জন্য কাজ করা), ইবাদত, স্বাধীনতা এবং অন্যান্য। এখন প্রশ্ন হলো কি ধরনের মানুষ পূর্ণ মানুষ? সে ব্যক্তি যে শুধুই উপাসক? নাকি যে ব্যক্তি স্বাধীন? নাকি যে ব্যক্তি শুধুই প্রেমিক? অথবা সে ব্যক্তি যে শুধু চিন্তাশীল? না, প্রকৃতপক্ষে এদের কেউই পূর্ণ মানব নয়। পূর্ণ মানব সেই ব্যক্তি যার মধ্যে এ সকল প্রকার মূল্যবোধই সর্বোচচ পর্যায়ে ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছে। আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.) তেমন একজন মানুষ।

নাহজুল বালাগার সার্বিকতা

নাহজুল বালাগাকে হযরত আলী (আ.)-এর সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি সম্পন্ন গ্রন্থ বলতে পারছি না, তারপরও এটা কেমন গ্রন্থ? (প্রকৃতপক্ষে সাইয়্যেদ রাজী আলী [আ.]-এর বিভিন্ন বক্তব্যের অংশ বিশেষ এনেছেন। যেহেতু তিনি সাহিত্যিক ছিলেন তাই শুধু সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণের বিষয়গুলোই এনেছেন, অথচ মাসউদী [যিনি রাজীর একশ' বছর পূর্বের] বলেছেন তৎকালীন সময়ে মানুষের নিকট আলী (আ.)-এর ৪৮০টি খুতবা লিখিত ছিল।) আমরা লক্ষ্য করব, নাহজুল বালাগায় বৈচিত্রময় বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। যখন কেউ নাহজুল বালাগাহ্ পড়ে তখন কখনো মনে করে সম্ভবত আবু আলী সিনা কথা বলছেন। অন্যস্থানে দৃষ্টিপাত করে মনে করেন মাওলানা রুমী অথবা মহিউদ্দীন আরাবী কথা বলছেন। কোথাও দেখে যে, কবি ফেরদৌসীর মতো কথা অথবা কোন স্বাধীনতাকামী যার মাথায় স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছুই আসে না এরূপ কেউ যেন কথা বলছে, কখনো লক্ষ্য করে, ঘরের কোণে অথবা মসজিদে বসা কোন আবেদ বা যাহেদ (যুহদ অবলম্বনকারী) অথবা কোন ধর্মীয় নেতা বক্তব্য রাখছেন। অর্থাৎ সকল মূল্যবোধই আলী (আ.)-এর মধ্যে লক্ষ্য করে, যেহেতু বক্তব্য ব্যক্তির আত্মার প্রতিফলন। তখন বুঝি হযরত আলী কত বড় আর আমরা কত ক্ষুদ্র!

প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের কথা যখন আমাদের সমাজের (ইরানী) দীনি ও মাযহাবী প্রবণতা শুধু যুহদ ও ইবাদতের দিকে ছিল, দেখা যেত কোন বক্তা মিম্বারে গিয়ে নাহজুল বালাগার বিশেষ অংশই শুধু পড়তেন। দশ-বিশটি খুতবা যা সাধারণত পড়া হতো সেগুলো ওয়াজ-নসিহত ও যুহদ অবলম্বনের আহবান দিয়ে শুরু হয়েছে। যেমন "হে মানব সম্প্রদায়! নিশ্চয় দুনিয়া তোমাদের অস্থায়ী বাসস্থান এবং আখেরাত চিরস্থায়ী বাসস্থান। সুতরাং অস্থায়ী বাসস্থানের পরিবর্তে স্থায়ী বাসস্থানকে গ্রহণ কর।" নাহজুল বালাগার অন্যান্য খুতবাগুলো পড়া হতো না। যেহেতু সমাজ সেগুলো গ্রহণে সক্ষম ছিলো না। সমাজ এক বিশেষ মূল্যবোধের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল এবং নাহজুল বালাগার সেই অংশ যা এ মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত তা-ই প্রচলিত ছিল। শত বছর অতিক্রান্ত হয়ে যেত, কিন্তু একজন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যেত না যে আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর মালেক আশতারের প্রতি লিখিত পত্র যা সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনার এক ভাণ্ডার সেটি পড়বে, যেহেতু সমাজের আত্মা এর জন্য আগ্রহী ও পিপাসু ছিল না। অথবা যেখানে আলী (আ.) বলছেন,

فانّي سمعتُ رسولَ اللّه (ص) يقولُ في غيرِ موطنٍ: لن تقدّسُ امَّة لايؤخذُللضّعيفِ فيها حقّه مِنَ القوىِّ غيرَ متتعتعٍ

"নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে অনন্তর বলতে শুনেছি যে, কোন উম্মতই সম্মান ও মর্যাদার পবিত্র স্থানে পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের ক্ষমতাশীলদের হস্ত হতে দুর্বলদের অধিকার আদায় করবে (অর্থাৎ উম্মতের দুর্বলরা ক্ষমতাশীলদের বিরুদ্ধে তাদের অধিকারের জন্য রুখে দাঁড়াবে) কোন দ্বিধা ও শংকা ছাড়াই।" (নাহজুল বালাগাহ্, পত্র নং ৫৩)

পঞ্চাশ বছর পূর্বের ইরানের সমাজ এ কথার মূল্যকে অনুধাবন করতে পারত না। যেহেতু সমাজ একটি মূল্যবোধের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। অথচ হযরত আলীর বাণীর মধ্যে সকল মূল্যবোধ স্থান লাভ করেছে এবং এ মূল্যবোধগুলো তাঁর ব্যক্তি জীবনের ইতিহাসেও আমরা দেখতে পাই।

হযরত আলী (আ.)-এর গুণাবলী

যদি হযরত আলীকে আমাদের আদর্শ ও নেতা হিসেবে গ্রহণ করি, তবে একজন পূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ মানুষকে যার মধ্যে সকল মানবিক মূল্যবোধ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছে আমাদের অগ্রগামী হিসেবে গ্রহণ করেছি।

যখন রাত্রি নেমে আসে, রাত্রির নিস্তব্ধতা চারিদিক আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন কোন সাধক বা আরেফই আলী (আ.)-এর পদমর্যাদায় পৌঁছতে পারে না। এমন প্রাণবন্ত ইবাদত যেন স্রষ্টার সাধনায় নিমগ্ন ও পরমাকৃষ্ট, তাঁর দিকে ধাবমান প্রবলভাবে। আবার যখন তিনি অন্য কোন বিষয়ে মশগুল, উদাহরণস্বরূপ যখন তিনি যুদ্ধ ও সংগ্রামে লিপ্ত (যুদ্ধক্ষেত্রে) তরবারীর আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষত-বিক্ষত, শরীর থেকে মাংস বিচ্ছিন্ন হয়ে এক দিকে পড়ে গেছে, কিন্তু এতটা নিমগ্ন যে, অনুভব করেন নি এক টুকরা মাংস তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গভীর মনসংযোগের কারণে সে দিকে লক্ষ্যই নেই। আলী ইবাদতের সময় এতটা উষ্ণ হয়ে উঠেন যে, আল্লাহ্‌র প্রেম ও ভালোবাসায় তাঁর অস্তিত্ব যেন এক প্রজ্বলিত শিখা যার অবস্থান এ পৃথিবীতে নয়। নিজেই এক দল ব্যক্তিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

هَجَمَ بِهِم العلم على حقيقة البصيرة و باشروا روح اليقين و استلانوا ما استوعرة المترفون و انسوا بما استوحش منه الجاهلون و صحبوا الدّنيا بابدان ارواحها معلقة بالمحلّ الأعلى

"জ্ঞান তাদের দিকে তার দিব্যতাসহ প্রকৃতরূপে ধাবিত হয়েছে, ইয়াকীনের প্রাণকে তারা কর্মে নিয়োজিত করেছে, যা দুনিয়াদারদের জন্য কঠিন ও অসহ্য তা তাদের নিকট সহজ হয়ে গেছে, জাহেলরা যা থেকে ভীত তারা তার প্রতি আকৃষ্ট, যদিও তারা মানুষের মাঝে শারীরিকভাবে অবস্থান করছে তদুপরি তাদের আত্মা উচচতর এক স্থানে সংযুক্ত।" (নাহজুল বালাগাহ্, হেকমত ১৪৭)

ইবাদতরত অবস্থায় তাঁর দেহ থেকে তীর খুলে ফেলা হয়েছে, অথচ তিনি এমনভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট ও ইবাদতে নিমগ্ন যে অনুভবও করেননি। ইবাদতের মেহরাবে তিনি এতটা ক্রন্দনশীল যার নজীর কেউ দেখেনি। আবার দিনের বেলায় আলী যেন ভিন্ন কোন মানুষ। সঙ্গীদের সাথে যখন বসেন তখন হাসি মুখ, খোলা-মেলা তাঁর আচরণ। তাঁর চেহারা সব সময় হাস্যোজ্জ্বল। আলী (আ.) এত বেশি মুক্ত মনের ছিলেন যে, আমর ইবনে আস আলীর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতো যে, আলী খেলাফতের উপযুক্ত নয়। কারণ হাসিমুখ ও মনখোলা মানুষ খেলাফতের জন্য অনুপযোগী।

খেলাফতের জন্য কঠিন মুখাবয়বের প্রয়োজন যাতে মানুষ তাকে ভয় পায়। এটা নাহজুল বালাগায় আলী নিজেই বর্ণনা করেছেন–

عجباً لابنِ النابغةِ يزعمُ لاهلِ الشامِ أنَّ فيَّ دُعابة وَ انِّي امروٌ تلعابة

"নাবেগার সন্তানের কথায় আশ্চর্যান্বিত হই যে বলে, আলী মানুষের সাথে হাসি মুখে কথা বলে, খুব হাসি-ঠাট্টা করে, মজাদার লোক।"

যখন আলী শত্রুর সাথে যুদ্ধের ময়দানে একজন যোদ্ধার বেশে আবির্ভূত তখনও তিনি মন খোলা ও হাসি মুখ। কবি বলছেন,

هو البكّاءُ في المحرابِ ليلاً هو الضحّاكُ إذا اشتدَّ الضربُ

"তিনি ইবাদতের মেহরাবে যেমন অত্যন্ত ক্রন্দনশীল তেমনি যুদ্ধের ময়দানে হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।"

তিনি কেমন মানুষ? এটাই কোরআনী মানুষ। কোরআন এমন মানুষই চায়।

انَّ ناشية اللّيلِ هي اشدّ وَطاً وَّاقومُ قيلاً انَّ لكَ في النّهارِ سبحاً طويل

"নিশ্চয় (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) রাত্রিকালের উত্থান আত্মশুদ্ধির জন্য সর্বাধিক কঠিন পন্থা এবং বাক্যালাপে সর্বাধিক দৃঢ়তা দানকারী। নিশ্চয় দিবসে তুমি দীর্ঘ কর্ম ব্যস্ততায় নিমগ্ন থাক।" অর্থাৎ রাতকে ইবাদতের জন্য রাখ আর দিনকে সামাজিক কাজকর্মের জন্য। আলী যেন রাত্রিতে এক ব্যক্তিত্ব, আর দিনে অন্য এক ব্যক্তিত্ব।

হাফেজ শিরাজী যেহেতু একজন মুফাস্‌সির ছিলেন সেহেতু কোরআনের রহস্যকে বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতেন। নিজস্ব ভঙ্গিতে ভাষার গাঁথুনীতে এ বিষয়টি তিনি কবিতায় এনেছেন–

"দিনে রত হও অর্জনের চেষ্টায়
রাত তো সময় মাতাল হওয়ার শরাবের নেশায়।
হৃদয়রূপ আয়নায় মরিচা তো পড়বেই
মরিচা সরানোর সময় তো রাতের আঁধারেই।"

আলী (আ.)-এর দিবারাত্রি এমনই ছিল। বিপরীত চরিত্রের সমন্বয়– যা পূর্ণ মানবের জন্য প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য তা হাজার বছর পূর্বের আলীর মধ্যে দেখা যায়। সাইয়্যেদ রাজী নাহজুল বালাগার ভূমিকায় বলছেন, "যে বিষয়টি সব সময় বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করি এবং যাতে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যান্বিত হই তা হলো আলী (আ.)-এর বক্তব্যগুলোর যে কোন একটিতে প্রবেশ করলে মনে হয় যেন এক বিশ্বে যেন প্রবেশ করেছি। কখনো কোন আবেদের জগতে, কখনো বা যাহেদের জগতে, কখনো দর্শনের জগতে, কখনো আধ্যাত্মিকতার জগতে, কখনো সৈনিক বা সামরিক কর্মকর্তার জগতে, কখনো ন্যায়পরায়ণ বিচারক বা শাসকের বা ধর্মীয় নেতার জগতে। সকল বিশ্বেই আলীর উপস্থিত। মানব বিশ্বের কোন স্থানেই আলী অনুপস্থিত নন।"

সাফিউদ্দিন হিল্লী যিনি অষ্টম হিজরী শতাব্দীর একজন কবি ছিলেন তিনি বলেছেন,

جُمِعَتْ في صِفاتِكَ الاَضدادُ فَلِهَذا عزَّتُ لكَ الاَنداد

"বিপরীত বৈশিষ্ট্য হয়েছে তোমায় সমন্বিত
তাই তুমি হয়েছ মহিমান্বিত।"

زاهدٌ حاكمٌ حليمٌ شجاعٌ ناسكٌ فاتِكٌ فقيرٌ جوادٌ •

"আত্মসংযমী শাসক তুমি, সহনশীল বীর
ফকির তুমি, দুনিয়াত্যাগী পীর।"

যেমন সহনশীলতা ও ধৈর্যের ক্ষেত্রে তুমি সর্বোচচ পর্যায়ে তেমনি সাহসিকতার ক্ষেত্রেও সর্বোচচ পর্যায়ে। রক্তপাতের ক্ষেত্রে যেখানে কোন নিকৃষ্ট ব্যক্তির রক্ত ঝরাতে হবে সেখানে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, আবার ইবাদতের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী। নিঃস্ব ও সম্পদহীন তিনি, অথচ সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। দানশীল ছিলেন বলেই সম্পদ তাঁর হাতে গচ্ছিত থাকত না।

"দাতা কভু পারে না সম্পদ সঞ্চয় করতে
প্রেমিক অন্তর পারে না কভু ধৈর্য ধরতে,
পানিরে পারা যায় না কভু ছাকনিতে আটকাতে।"

তেমনি আলী (আ.)-কে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে–

خُلقُ يُخْجلُ النسيمَ مِنَ العطفِ وَ بأسٌ يذوبُ منهُ الجمادَ

কোথাও তোমার চরিত্র এমন যে, তোমার কোমলতা দেখে মৃদুমন্দ বাতাসও লজ্জা পায়
কখনো তোমার দৃঢ়তা পাথরকেও হার মানায়।"

অর্থাৎ সাহসিকতা, শৌর্য আর সংগ্রামী তাঁর আত্মার মোকাবিলায় পাথর, শীলা বা ধাতুও গলে যায়। আবার তাঁর চারিত্রিক কোমলতাই মৃদুমন্দ বাতাসকেও লজ্জা দেয়। একই ব্যক্তির মধ্যে কোমলতা ও কঠোরতার এক অপূর্ব সমন্বয়। তুমি কেমন আশ্চর্য সৃষ্টি?

অতএব, পূর্ণ মানব অর্থ সেই মানুষ যিনি সকল মানবিক মূল্যবোধে বলীয়ান। মানবতার সকল ময়দানে তিনি শ্রেষ্ঠ। এখান থেকে আমরা কি শিক্ষাগ্রহণ করব? এ শিক্ষাগ্রহণ করব যে, ভুল করে শুধু একটি মূল্যবোধকে গ্রহণ করে অন্যান্য মূল্যবোধকে যেন আমরা ভুলে না যাই। যদিও আমরা সকল মূল্যবোধের ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারব না, কিন্তু নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সকল মূল্যবোধই একত্রে ধারণ তো করতে পারি। যদি পূর্ণ মানুষ নাও হই অন্তত ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ তো হতে পারি। আর তখনই একজন প্রকৃত মুসলমান হিসেবে সকল ময়দানে আমরা উপস্থিত হতে পারব।

সুতরাং এটাই পূর্ণ মানুষের রূপ। ইনশাল্লাহ্ আমরা পরবর্তী বৈঠকে বাকী অংশ আলোচনা করব।

হযরত আলী (আ.)-এর জীবনের শেষ দিনগুলো

আলী (আ.)-এর জীবনের শেষ রমযান মাস অন্য এক রকম রমযান যা ভিন্ন এক পবিত্রতা নিয়ে বিরাজ করছিল। আলীর পরিবারের জন্যও এ রমযান প্রথম দিক থেকেই অন্য রকম ছিল। ভয় ও শঙ্কার একটি মিশ্রিত অবস্থা বিরাজমান ছিল। (খাওয়ারেজ আলী (আ.)-কে হত্যার পরিকল্পনা নিয়েছিল) সেহেতু আলীর জীবনধারা এ রমযানে অন্য রমযানের থেকে অন্য রকম ছিল।

হযরত আলীর শক্তিমত্তার একটি বর্ণনা নাহজুল বালাগা থেকে এখানে বর্ণনা করব। আলী (আ.) বলেছেন,

لَمّا انزلَ أللهُ سبحانهُ قو له "الم احسبَ النَّاسُ ان يتركوا ان يقو لوا امنّا و هم لا يفتنون* علمتُ انَّ الفتنة لا تنزلُ بنا و رسلُ الله (ص) بين اَظهرناَ

"যখন এ আয়াত 'মানুষ কি ভেবে নিয়েছে আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না' (আনকাবুত ১-২) নাযিল হলো তখন বুঝতে পারলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর পর এ উম্মতের জন্য ফেতনা ও কঠিন পরীক্ষা আসবে।

فَقُلتُ :يا رَسولُ الله (ص) ماهذهِ الفتنةٌ الّتي اخبرك الله تعالى بها

তখন রাসূলকে প্রশ্ন করলাম : হে রাসূলাল্লাহ্! এ আয়াতে আল্লাহ্ যে ফেতনার কথা বলছেন সেটা কি? তিনি বললেন :

يا عليُّ انِّ امتى سيفتنونَ من بعدي

হে আলী! আমার পর আমার উম্মত পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।" যখন আলী শুনলেন রাসূল মৃত্যুবরণ করবেন এবং তাঁর পরে কঠিন পরীক্ষা আসবে তখন ওহুদের যুদ্ধের কথা স্মরণ করে বললেন,

يا رسول الله اَوَ ليسَ قد قُلتَ لى يومَ اُحدٍ حيثُ استشهدَ مَنِ استشهدَ منَ المسلمينَ و حيّزتِ عنّى الشّهادةُ

"ইয়া রসুলাল্লাহ্! ওহুদের দিনে যারা শহীদ হওয়ার তারা শহীদ হলেন (মুসলমানদের মধ্যে সত্তর জন শহীদ হয়েছিলেন যাদের নেতা ছিলেন হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং আলী ওহুদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের একজন ছিলেন) অর্থাৎ তাঁরা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন এবং শাহাদাত আমার থেকে দূরে চলে গেল, আমি এর থেকে বঞ্চিত হলাম এবং খুবই দুঃখ পেয়ে আপনাকে প্রশ্ন করলাম, কেন এ মর্যাদা আমার ভাগ্যে ঘটল না। (আলী এ সময় পঁচিশ বছরের যুবক ছিলেন এবং এক বছর হলো হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (আ.)-কে বিবাহ করেছেন এবং এক সন্তানের জনক। এ বয়সের যুবক যখন জীবনকে সুন্দরভাবে সাজানোর স্বপ্ন দেখে তখন আলী শাহাদাতের প্রত্যাশী।) আপনি বললেন, ابشرُ فانّ الشّهادةَ مِن ورائك যদিও এখানে শহীদ হওনি কিন্তু অবশেষে শাহাদাত তোমার ভাগ্যে ঘটবে।" তারপর মহানবী বললেন,

انَّ ذٰلك لكذٰلك فكيفَ صبركَ اذن

"অবশ্যই এমনটি হবে তখন তুমি কিরূপে ধৈর্যধারণ করবে। এখানে ধৈর্যের স্থান নয়, বরং শোকর করার স্থান।" (নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ১৫৪)

রাসূল (সা.)-এর নিকট থেকে নিজের শাহাদাত সম্পর্কে যে খবর তিনি শুনেছিলেন সে সাথে বিভিন্ন আলামত যা তিনি দেখতেন, কখনো কখনো তা বলতেন যা তাঁর পরিবারের সদস্য এবং নিকটবর্তী শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাহাবীদের মধ্যে শঙ্কা ও কষ্ট বৃদ্ধি করত। তিনি আশ্চর্যজনক কিছু কথা বলতেন। এ রমযান মাসে নিজের ছেলে-মেয়েদের ঘরে ইফতার করতেন। প্রতি রাতে যে কোন এক ছেলে বা মেয়ের ঘরে মেহমান হতেন– কোন রাতে ইমাম হাসানের ঘরে, কোন রাতে ইমাম হুসাইনের ঘরে, কোন রাতে হযরত যয়নাবের ঘরে (যিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে জা'ফরের স্ত্রী ছিলেন)। এ মাসে অন্যান্য সময়ের চেয়ে কম খাবার খেতেন। সন্তানরা এতে খুবই কষ্ট পেতেন। তাঁরা কখনো প্রশ্ন করতেন, "বাবা, কেন এত কম খান?" তিনি বলতেন, "আল্লাহ্র সাথে এমনাবস্থায় মিলিত হতে চাই যে উদর ক্ষুধার্ত থাকে।" সন্তানরা বুঝতেন তাঁদের পিতা কিছুর জন্য যেন অপেক্ষমান। কখনো কখনো তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন, "আমার ভাই ও বন্ধু রাসূল (সা.) আমাকে যে খবর দিয়েছেন তা অবশ্যই সত্য। তাঁর কথা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। খুব নিকটেই তা সত্যে পরিণত হবে।"

তের রমযান এমন কিছু বললেন যা অন্য সব দিনের চেয়ে পরিবেশকে বেশি ভারাক্রান্ত করে তুলল। সম্ভবত জুমআর দিন খুতবা পড়লেন। ইমাম হুসাইন (আ.)-কে প্রশ্ন করলেন, "বাবা এ মাসের কত দিন বাকি রয়েছে?" উত্তর দিলেন, "পিতা, ১৭ দিন।" তিনি বললেন, "তাহলে আর দেরি নেই। এ মাথা আর দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হবে। এ শ্মশ্রু রঙ্গিন হওয়ার সময় নিকটেই।"

ঊনিশে রমযান আলী (আ.)-এর সন্তানরা রাতের একটি অংশ আলীর সঙ্গে কাটালেন। ইমাম হাসান নিজের ঘরে চলে গেলেন। আলী জায়নামাজে বসলেন। শেষ রাতে উদ্বিগ্নতার কারণে (অথবা প্রতি রাতই হয়তো এ রকম করতেন) ইমাম হাসান আলীর নামাযের স্থানে গিয়ে বসলেন। (ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন হযরত ফাতেমা যাহরার সন্তান বলে ইমাম আলী এঁদের প্রতি আলাদা রকম স্নেহ দেখাতেন। কারণ এঁদের প্রতি স্নেহ রাসূলুল্লাহ্ ও ফাতেমা যাহ্রার প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলে মনে করতেন) যখন ইমাম হাসান তাঁর কাছে আসলেন তখন তিনি বললেন,

ملكتني عيني و انا جالسٌ فسنح لى رسول الله (ص) فقلتُ يا رسول الله ماذا لقيتُ من امّتك من الاود واللددِ فقال ادعُ عليهم فقلتُ ابدلنى الله بهم خيراً منهم و ابدلهم بى شرَّ لهم منِّي

"পুত্র, হঠাৎ স্বপ্নের মধ্যে রাসূলকে আবির্ভূত হতে দেখলাম। যখন রাসূলকে দেখলাম তখন বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার এ উম্মতের হাতে আমার অন্তর রক্তাক্ত হয়েছে।" প্রকৃতপক্ষে তাঁর সঙ্গে মানুষের অসহযোগিতা এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চলার ক্ষেত্রে তাদের অনীহা আলী (আ.)-কে তীব্র যন্ত্রণা দিয়েছে। উষ্ট্রের যুদ্ধের বায়আত ভঙ্গকারীরা, সিফফিনে মুয়াবিয়ার প্রতারণা (মুয়াবিয়া অত্যন্ত ধুর্ত ছিল, ভালোভাবেই জানত কি করলে আলীর হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করা যাবে। আর সে তা-ই করত), সবশেষে খারেজীদের রূহবিহীন আকীদা-বিশ্বাস যারা ঈমান ও এখলাছ মনে করে আলী (আ.)-কে কাফের ও ফাসেক বলত। আমরা জানি না আলীর সঙ্গে এরা কি আচরণ করেছে! প্রকৃতই

যখন কেউ আলীর উপর আপতিত মুসিবতগুলো দেখে, আশ্চর্যান্বিত বোধ করে। একটি পাহাড়ও এ পরিমাণ মুসিবত সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না। এমন অবস্থা যে, আলী তাঁর এই মুসিবতের কথা কাউকে বলতেও পারেন না। এখন যখন রাসূলে আকরাম (সা.)-কে স্বপ্নে দেখলেন তখন বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার এ উম্মত আমার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। এদের নিয়ে আমি কি করব?" তারপর ইমাম হাসানকে বললেন, "পুত্র, তোমার নানা আমাকে নির্দেশ দিলেন এদের প্রতি অভিশাপ দিতে। আমিও স্বপ্নের মধ্যেই অভিশাপ দিয়ে বললাম : হে আল্লাহ্! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে মৃত্যু দান কর এবং এদের উপর এমন ব্যক্তিকে প্রভাব ও প্রতিপত্তি দান কর এরা যার উপযুক্ত।"

বোঝা যায়, এ বাক্যের সাথে কতটা হৃদয়ের বেদনা ও দুঃখ জড়িয়ে রয়েছে! আলী (আ.) সুবহে সাদিকের সময় ঘর থেকে যখন বের হচ্ছিলেন বাড়ির হাঁসগুলো অসময়ে ডেকে উঠল। আলী বললেন,

دعوهنَّ فانّهنَّ صوائحُ تتبعها نوائح

"এখন পাখির কান্না শোনা যাচ্ছে, বেশি দেরি নয় এরপর এখান থেকেই মানুষের কান্না শোনা যাবে। উম্মে কুলসুম আমিরুল মুমিনীনের সামনে এসে বাঁধা দিলেন। তিনি বললেন, "বাবা, আপনাকে মসজিদে যেতে দেব না। অন্য কাউকে আজ নামায পড়াতে বলুন।" প্রথমে বললেন, "জুদাহ ইবনে হুবাইরাকে বলুন জামাআত পড়াতে।" পরক্ষণেই আলী বললেন, "না আমি নিজেই যাব।" বলা হলো, অনুমতি দিন আপনার সঙ্গে কেউ যাক। তিনি বললেন, "না, আমি চাই না কেউ আমার সঙ্গে যাক।"

হযরত আলীর জন্য রাতটি অত্যন্ত পবিত্র ছিল। আল্লাহ্ জানেন আলীর মধ্যে সে রাত্রে কেমন উত্তেজনা ছিল! তিনি বলছেন, "আমি অনেক চেষ্টা করেছি এ আকস্মিক শিহরণের রহস্য উদ্ঘাটন করব। যদিও ধারণা ছিল কোন বড় ঘটনা ঘটবে যা অপেক্ষায় আছে।" যেমন নাহজুল বালাগায় আলী (আ.) নিজেই বলছেন,

كم اطردت الايّام ابحثها عن مكنون هذا الامر فابى الله الا اخفاءهُ

"অনেক চেষ্টা করেছি এ রহস্যের গোপনীয়তা উদ্ঘাটন করব, কিন্তু আল্লাহ্ চাননি, বরং তিনি এটা গোপন রেখেছেন।"

নিজেই ফজরের আজান দিতেন। সুবহে সাদিকের সময় নিজেই মুয়াজ্জিনের স্থানে দাঁড়িয়ে (আল্লাহু আকবার বলে) উচ্চৈঃস্বরে আজান দিলেন। সেখান থেকে নামার সময় সুবহে সাদেকের সাদা আভাকে বিদায় জানালেন। তিনি বললেন, "হে সাদা আভা! এ ফজরে একদিন আলী এ পৃথিবীতে চোখ খুলেছিল। এমন কোন ফজর কি আসবে যে, তুমি থাকবে আর আলী ঘুমিয়ে থাকবে। নাকি এবার আলীর চোখ চিরতরে ঘুমিয়ে পড়বে।" যখন তিনি নেমে এলেন তখন বললেন,

خلّوا سبيلَ المومنِ المجاهدِ في الله ذي الكتبِ و ذي المشاهدِ

في الله لا يعبدُ غيرَ الواحدِ و يوقظُ النّاسَ الى المساجدِ

"এই মুমিন ও মুজাহিদের জন্য রাস্তা খুলে দাও (নিজেকে মুমিন ও মুজাহিদ বলে উল্লেখ করেছেন) যে গ্রন্থ ও শাহাদাতের অধিকারী, একক খোদা ব্যতীত কারো ইবাদত করেনি এবং মানুষকে মসজিদে যাওয়ার জন্য ঘুম থেকে উঠাতো।"

পরিবারের কাউকে অনুমতি দেননি বাইরে যাওয়ার। আলী বলেছিলেন, "পাখিদের কান্নার পর মানুষের আহাজারি শুনতে পাবে।" স্বাভাবিকভাবেই হযরত যয়নাব কোবরা, উম্মে কুলসুম ও পরিবারের বাকী সদস্যরা উদ্বিগ্ন অবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ করে এক প্রচণ্ড চীৎকারে সবাই বুঝতে পারলেন। একটি আওয়াজ চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল–

تهدّمت واللهِ اركان الهدى وانطمست اعلام التّقى و انفصمتِ العروةُ قتلَ ابنُ عمِّ المصطفى قُتِلَ الوصىُّ المجتبى قُتِلَ علىُّ المرتضى قَتَلَهُ اشقى الاشقياء

"দীনের স্তম্ভ ধ্বসে পড়েছে, তাকওয়ার ধ্বজা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, মজবুত বন্ধন ছিন্ন হয়ে পড়েছে, আলী মোর্তজাকে হত্যা করা হয়েছে, তাঁকে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হত্যা করেছে।"

وَ لا حولَ ولا قوّةَ الاّ باللهِ العلى العظيم

৩

বিবিধ দৃষ্টিকোণে মানুষের বেদনার অনুভূতি

و إذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهنّ قال إنّي جاعلك للنّاس إماماً قال و من ذرّيّتي قال لا ينال عهدي الظّالمين

.

মানব সত্তা ও তার স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। সর্বোপরি দু'টি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিই একটি অপরটির বিপরীতে অবস্থান করছে : রূহবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। রূহবাদীদের দৃষ্টিতে মানুষ হলো প্রকৃতপক্ষে দেহ ও আত্মার সমষ্টি এবং মানুষের আত্মা চিরন্তন অমর– যা তার মৃত্যুর ফলে নিঃশেষ হয়ে যায় না। একইভাবে ধর্মীয় যুক্তিতে বিশেষ করে ইসলামের অকাট্য ভাষ্যে এরই যৌক্তিকতা নির্দেশিত হয়েছে। অপর মতবাদটি হলো মানুষ আসলে যান্ত্রিক দেহ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং মৃত্যুর ফলে সম্পূর্ণ বিলীন ও নিঃশেষ হয়ে যায়। আর দৈহিক বিনাশের অর্থই হলো মানবসত্তার বিনাশ।

মানুষের নৈতিকতা

মানবসত্তা ও তার স্বরূপ সম্পর্কে বিশেষ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও এ বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট অন্য একটি বিষয়ে কোন মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। আর তা হলো এমন বিষয়ের অস্তিত্ব যা বস্তু বা বস্তুগত নয়– যাকে 'নৈতিকতা' নামকরণ করা যেতে পারে এবং যা মানুষকে মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব দান করে। মানুষ বলতে তার এই বৈশিষ্ট্য ধারণকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি তাকে এ বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথক করা হয় তাহলে পশুর সাথে তার কোন পার্থক্য থাকে না। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের মনুষ্যত্ব তার বাহ্যিক দেহাবয়বে নয় যে, কারো একটি মাথা, দু'টি কান, প্রশস্ত নখ, পরিমিত উচ্চতা ও যা ইচ্ছে তা-ই করুক না কেন তাকে মানুষ বলা যাবে। না, তেমনটি নয়। শেখ সা'দী যথার্থই বলেছেন,

"দেহ তোমায় মহান করে না, করে যা আত্মায়,
হৃদয় রাঙানো পোশাকে তোমার সৌন্দর্য নয়,
নয় তাতে মনুষ্য পরিচয়।
চক্ষু, কণ্ঠ, জিহ্বা আর নাসিক্যে যদি হয় মনুষ্য পরিচয়,
কি তফাৎ বল দেয়ালের ঐ ছবি আর মানবসত্তায়?"

যদি এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারীকেই মানুষ বলা হয়, তবে সকলেই মানুষ (আমরা দৈনন্দিন জীবনে মানুষ থাকা ও মানুষ হওয়া এ কথাগুলো ব্যবহার করি, এমনকি এ দৃষ্টান্ত ধর্মীয় ছাত্রদের

মধ্যেও ব্যাবহৃত হয়, যেমন মোল্লা হওয়া কত সহজ, কিন্তু মানুষ হওয়া কত কঠিন!) হিসেবেই মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে জন্ম নিত। কিন্তু না। মানুষ হওয়া মানে হলো বিশেষ গুণ, চরিত্র ও অর্থের অধিকারী হওয়া। যার ফলে তাকে মানুষ বলা যায় এবং সে মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব অর্জন করে। ইদানিং এ সকল বিষয়ই (যার উপস্থিতি মানুষকে মূল্যবোধ দান করে আর যার অনুপস্থিতি তাকে পশুর সামিল করে)– 'মানবিক মূল্যবোধ' নামে পরিচিত।

অদ্যকার এ সভায় আমার বক্তব্যকে পূর্ববর্তী সভার আলোচ্য বিষয়ের ধারাবাহিকতায় অনুবর্তন করব। উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিচ্যুতিসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরনের বিচ্যুতি আছে যাতে 'মূল্যবোধহীনতা' 'মূল্যবোধ'-এর বিপরীতে অবস্থান নেয়। যেমন : অন্যায় ন্যায়ের বিরুদ্ধে, ভয়-ভীতি মুক্তির বিরুদ্ধে, খোদার প্রতি উদাসীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা খোদার উপাসনা ও শৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে; অজ্ঞতা ও মূর্খতা জ্ঞান, বিবেক ও প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তবে সম্ভবত অধিকাংশ বিচ্যুতিই উল্লিখিত ধরনের নয় যাতে মূল্যবোধহীনতা মূল্যবোধের বিপরীতে অবস্থান নেয়। যেখানে মূল্যবোধহীনতা মূল্যবোধের বিপরীতে অবস্থান নেয় সেখানে প্রথমোক্তটি (মূল্যবোধহীনতা) অপনোদিত হয়। মানবকুলের অধিকাংশ বিচ্যুতিই নদীর জোয়ার ভাটার মতই। কখনো কখনো কোন বিশেষ মূল্যবোধ অপর মূল্যবোধসমূহ অপেক্ষা এতটা প্রবৃদ্ধি লাভ করে যে, অন্যান্য মূল্যবোধকে ধ্বংস করে ফেলে। যেমন : সংযম ও ধর্মানুরাগ একটি মূল্যবোধ যা মনুষ্যত্বের মানদণ্ডসমূহের মধ্যেও একটি। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যুহদের (দুনিয়া বিমুখতা) প্রতি এতটা ঝুঁকে পড়ে যে, তাতে বিলীন হয়ে যায় এবং অন্য সব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। অবশেষে এমন এক মানুষে পরিণত হয় যার একটি অঙ্গই (যেমন : নাক) প্রবৃদ্ধি লাভ করে এবং অন্যান্য অঙ্গ অপরিবর্তিত থেকে যায়।

কষ্ট এবং তার ফল

চরম বস্তুবাদী মতবাদগুলোও এক নৈতিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী– এ ভূমিকা দিয়ে বলা যেতে পারে সকল মানবীয় মূল্যবোধ এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে সারসংক্ষিপ্ত হয় যা নিজেই একটি শাখায় পরিণত হয় এবং তা এমন এক প্রেক্ষাপট যা আরেফগণের পরিভাষায় যেমনটি এসেছে তেমনি এসেছে সমসাময়িক আলেমগণের পরিভাষায়ও। তবে আরেফগণের পূর্বেই তা ইসলামের মূল পাঠ্যসমূহে ব্যবহৃত হয়েছে। আর ঐ প্রেক্ষাপটকে এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, মূলত মনুষ্যত্বের প্রকৃত মানদণ্ড তা-ই যার ফলে 'কষ্ট' ও 'কষ্ট প্রাপক'-কে ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষ এবং অন্যের (প্রাণীর) মধ্যে পার্থক্য হলো যে, সে কষ্ট ও বেদনাকে অনুভব করে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণী তা পশুই হোক কিংবা মানুষের দেহাবয়বে মনুষ্যত্বহীন মানবই হোক– কষ্টের অনুভূতিসম্পন্ন নয়।

অতএব, প্রারম্ভেই কষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করব। হয়তো প্রথমত একটা আশ্চর্য বিষয় মনে হবে যে, এর মানে কি?

অবশ্য স্মরণযোগ্য, আমরা কষ্ট এবং কষ্টের উৎস এ দু'য়ের মধ্যে ভুল অর্থ করি। যেমন কোন অসুখ বা জখমের মন্দের কারণ হলো জীবাণু; আর তার উপস্থিতিই হলো অসুখ বা জখম– যা দেহে

অনুপ্রবেশ করে কষ্টের সৃষ্টি করে। অনুরূপ কোন ক্ষত যা অন্ত্রে হয় এবং মানুষ তার ব্যথা অনুভব করে তা ঐ ক্ষতের ফলেই। বেদনা মানুষের জন্য অস্বস্তির হলেও জ্ঞান ও জাগরণের কারণও বটে, এমনকি শারীরিক ব্যথা যা মানুষ বা পশুর জন্য অভিন্ন তাও মানুষের জ্ঞান এবং জাগরণের কারণ। যখন কারো মাথা ব্যথা হয় তখন এটা ধারণা করা অসম্ভব যে, কোন কারণ ব্যতিরেকেই ব্যথার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যথা অনুভূত হওয়ার ফলে মাথার কোন অসুস্থতা বা ক্ষত সম্পর্কে মানুষ অবগত হয় এবং তখন তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ঠিক যেন কোন কারখানা বা গাড়ীর সূচকের মতো। যেমন কোন সূচক তৈলের পরিমাণ ইঙ্গিত করে আবার কোনটি পানির তাপমাত্রার পরিমাণ। যদি কোন সূচক ইঙ্গিত করে যে, পানির তাপমাত্রা খুব উচ্চে আছে তাহলে সেটা কি ভালো না খারাপ? অবশ্যই তা ভালো। কারণ তা আপনাকে গাড়ীর অবস্থা সম্পর্কে খবর দেয় বা সতর্ক করে দেয়। যদি ব্যথা বা এর অনুভূতি মানুষের মধ্যে না থাকত তবে প্রথমত এর সম্পর্কে অবগত হতো না। দ্বিতীয়ত এ ব্যথা মানুষকে এক নিযুক্ত কর্মচারীর মতো উপায় অনুসন্ধানের জন্য বাধ্য করে এবং তাকে তড়িৎ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আহ্বান করে। যেহেতু ব্যথা আছে তা তাকে অস্বস্তিকর করে তুলে এবং নিয়মিত তাকে বলে যেভাবেই হোক এ ব্যথার উপশম করো।

সুতরাং ব্যথা এমনকি শারীরিক বা আঙ্গিক হলেও তাতে অনুগ্রহ আছে, অনুভূতি আছে, আছে জ্ঞান ও জাগরণ। অবগতি ও জাগরণ সর্ববস্থায়ই উত্তম, এমনকি তা শারীরিক কোন ক্ষত সম্পর্কে হলেও। এ প্রসঙ্গে মোল্লা অপূর্বই বলেছেন,

"অনুতাপ ও তিক্ততায় জর্জড়িত যে পীড়িত
পীড়ার ক্ষণের সবটুকুতেই সে হয় আলোড়িত
তাই জেনে রাখ, এ সত্যটুকু হে সত্যানুরাগী
তিক্ততা যার জীবনে আছে, সে-ই পেয়েছে সুগন্ধ অমৃতলোভী
যে যতটুকু জাগরিত ততটুকুই ব্যথিত
যে যতটুকু হয অনুতপ্ত, ততটুকুই হয় বিমর্ষিত।"

অতঃপর এখানে এসে বাকচাতুর্য প্রদর্শন করেন এবং বলেন, ব্যথিতের বেদন ব্যথিত ছাড়া আর কেউ অনুভব করতে পারে না। বিশেষ করে সে এ বিষয়ে আর সকলের চেয়ে বেশি অবগত। বেদনাহীনতা মানে উদাসীনতা; বোধহীনতা, অনুভূতিহীনতা বা অবোধ্যতা। অপরদিকে বেদনার উপলব্ধি মানে হলো জ্ঞাতী, জাগরণ, বোধগম্যতা এবং বেদনাহীনতা যার অর্থ অজ্ঞতা।

যদি মানুষের জীবনে দু'টি পর্যায় থাকে– বেদনাহীনতা ও অজ্ঞতা এবং তার বিপরীতে বেদনা ও বোধ্যতা– তবে কোন্‌টিকে নির্বাচন করবে? মানুষ বেদনা ও বোধ্যতাকে প্রধান্য দিবে, না অজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধিতা ও বেদনাহীনতাকে? নিশ্চয়ই বুদ্ধিদীপ্ত কষ্টকর জীবন নির্বোধ সুখকর জীবনের চেয়ে শ্রেয়তর।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্থূল শূকর হওয়ার চেয়ে দুর্বল সক্রেটিস হওয়া অনেক উত্তম। অর্থাৎ যদি মানুষ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হয় কিন্তু বঞ্চিত, তবে তা এক নির্বোধ শূকর– যার জন্য সকল কিছুই সহজলভ্য তার চেয়ে অনেক উত্তম।

জ্ঞানের প্রতি অভিযোগ

একটি বিষয় আমাদের সাহিত্যকর্মে পরিলক্ষিত হয় যা হলো জ্ঞান সম্পর্কে অভিযোগ। আমরা সাহিত্যকর্মে– বিশেষ করে আমাদের কবিতাসমূহে খুব বেশি দেখতে পাই যে, অনেকেই জ্ঞানের প্রতি অভিযোগ করে বলেছেন, "হায়, যদি আমার জ্ঞান না থাকত! কি লাভ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে, আর সমাজে জ্ঞানী, সতর্ক এবং সংবেদনশীল হয়ে? এই সংবেদনশীলতা, জ্ঞান আর সতর্কতাই মানুষের অশান্তির কারণ।"

"আমার বুদ্ধি ও বিবেকই জীবনের শত্রু আমার
হায়, যদি উন্মুক্ত না হতো দৃষ্টি আমার, শ্রবণ আমার।"

আরেক জন বলেছেন,

"জ্ঞানী হয়ো না– বেদনায় হবে উন্মাদ
উন্মাদ হও– তোমার সমব্যথী হবে জ্ঞানীজন।"

অর্থাৎ এ ধরনের লোকেরা জীবনের উন্মাদনাপূর্ণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে, দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জীবন যা জ্ঞান, চিন্তা ও অনুভূতিসম্পন্ন তার উপর প্রাধান্য দান করেন। কিন্তু এ কথাগুলো ভ্রান্ত ধারণার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ব্যক্তি মনুষ্যত্বের ধাপে উন্নীত হয়েছে এবং কষ্ট ও সংবেদনশীলতার অর্থ অনুভব করতে পেরেছেন, তিনি কখনো বলবেন না, 'আমার বুদ্ধি ও বিবেকই জীবনের শত্রু আমার' বরং নবী (সা)-এর হাদীস থেকে বলবেন–

صَدِيْقُ كُلِّ امْرِىءٍ عَقْلُهُ وَ عَدُوُّهُ جَهْلُهُ

"প্রত্যেকেরই প্রকৃত বন্ধু তার বিবেক (আকল) আর তার সত্যিকারের শত্রু তার অজ্ঞতা (জাহেল)।" (উসূলুল কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১)

যিনি বলেছেন 'আমার বুদ্ধি ও বিবেকই জীবনের শত্রু আমার' এবং বুদ্ধি ও বিবেক থেকে উৎসারিত দুঃখ-কষ্টকে এভাবে অভিযুক্ত করেছেন; অনুমান করা যায় তিনি অজ্ঞতা থেকে উৎসারিত দুঃখ-কষ্টকে অনুভব করেননি, যদি তাই হতো তবে এ কথাগুলো বলতেন না। হ্যাঁ, যদি ব্যথার কারণ না থাকে এবং মানুষ ব্যথা অনুভব না করত, তবে ব্যথার কারণ বিদ্যমান না থাকার ফলে ব্যথা না থাকাটাই শ্রেয় হতো। কিন্তু যদি ব্যথার কারণ বিদ্যমান থাকে বা ব্যথার উৎস থাকে, অথচ মানুষ ব্যথা অনুভব না করে, তবে তার জন্য দুরবস্থাই বয়ে আনবে। মানুষের শারীরিক অসুস্থতার ব্যপারটিও তাই। যে সকল অসুস্থতায় ব্যথা বা অস্বস্তি অনুপস্থিতি থাকে তা মানুষকে নীরবে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়। কারণ সে তখনই কেবল বুঝতে পারে যখন নিরাময় তার নাগালের বাইরে চলে যায়। প্রাণঘাতী ক্যান্সারে মানুষের মৃত্যুর কারণও এটাই। ক্যান্সার হলে অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে অস্বস্তি অনুভূত হয় না। যদি প্রাথমিক পর্যায়েই অস্বস্তি অনুভূত হতো তবে হয়তো রক্ত বা লসিকায় প্রবেশের পূর্বেই সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা যেত। আর ক্যান্সারের ভয়াবহতার কারণ এটাই– নীরবে, নিঃশব্দে মানুষের দেহে তার অনুপ্রবেশ ঘটে।

সুতরাং মানুষের অমূল্য সম্পদগুলোর মধ্যে একটি মূল্যবান সম্পদ হলো ব্যথার অনুভূতি থাকা। তাই ব্যথা খারাপ কিছু বলে একে উপেক্ষা করা যায় না।

মানুষ ও ব্যথা

মানুষের ক্ষেত্রে ব্যথা কি? যদি কারো মাথা ব্যথা হয়, তাহলে তা এ দৃষ্টিকোণ থেকে নয় যে, সে মানুষ। কারণ একটি চতুস্পদ প্রাণীরও (যেমন দুম্বা) মাথা ব্যথা হতে পারে। মানুষের হাত-পায়ের ব্যথা অন্যান্য প্রাণীর অঙ্গের ব্যথার মতোই। কিন্তু যারা মানুষের ব্যথা এবং ব্যথার ধারক হিসেবে মানুষ– এ সম্পর্কে কথা বলছেন তাদের লক্ষ্য এ ব্যথা নয়, বরং সে ব্যথা যা মানুষের জন্য অমূল্য রত্ন এবং তা অন্য কিছু।

একদল লোক (যেমন আরেফগণ) ব্যথাকেই মানুষের মধ্যে অনুসন্ধান করেন এবং নিয়মিত যার পবিত্রতা রক্ষা করেন– তা হলো মহান আল্লাহ্‌র অনুসন্ধান। তাঁরা বলেন, এ ব্যথা একমাত্র মানুষেরই বৈশিষ্ট্যগত ব্যাপার, এমনকি ফেরেশতাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হলো মানুষের ব্যথা আছে, ফেরেশতাদের ব্যথা নেই।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ সেই বাস্তবতা যার মধ্যে বিধাতার 'ফু' উদগত হয়েছে, অন্য এক ভূবন থেকে যার আবির্ভাব ঘটেছে এবং প্রকৃতিতে যে সকল বস্তু রয়েছে তার সাথে সে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এখানে সে এক বিশেষ ধরনের নির্বাসন, ভিন্নতা ও সকল সৃষ্টির সাথে বৈসাদৃশ্য অনুভব করে। এর কারণ প্রতিটি জিনিসই ধ্বংসশীল, পরিবর্তনশীল এবং নিরাসক্তিযুক্ত, কিন্তু মানুষের মধ্যে রয়েছে অমরত্বের এক বিশেষ সম্ভাবনা। আর এ ব্যথা (খোদার অনুসন্ধান) তা-ই যা মানুষকে মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত ও উপাসনার দিকে পরিচালিত করে। অনুরূপ আপন চাওয়া-পাওয়ার আর্তি মহান প্রভুর কাছে প্রকাশ করার, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার এবং মূলে ফিরে যাওয়ার দিকে মানুষকে আকর্ষণ করে।

মানুষের কষ্ট সম্পর্কিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত

লক্ষ্য করবেন, কি রকম দৃষ্টান্ত আমাদের এরফানশাস্ত্রে এ সম্পর্কে দৃষ্টিগোচর হয়েছে! কখনো উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, একটি তোতাপাখি হিন্দুস্থানের অরণ্য থেকে এনে খাঁচায় বন্দী করা হয়েছে। সে সব সময় উদ্বিগ্ন থাকে কখন এ খাঁচা ভাঙবে? কখন সে ফিরবে আপন কুলায়? কখনো মানুষকে একটি মোরগ যে তার বাসা থেকে দূরে চলে গেছে তার সাথে তুলনা করা হয়। এমনি একটি চমৎকার তুলনা মৌলভী রুমী তাঁর মাসনভীর প্রথমে উল্লেখ করেছেন। তিনি মানুষকে সেই বাঁশের সাথে তুলনা করেছন যাকে তার জন্মস্থান থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তদবধি সে সারাক্ষণ ক্রন্দনরত। তার এ ক্রন্দন, আর্তনাদ যেন তার জন্মভূমির বিরহ ব্যথাকে চিত্রিত করে।

"শোন ঐ বাঁশের বাঁশীর করুণ কাহিনী
সে করছে বর্ণন তার বিরহগীতি
যখন আমায় করেছে বিচ্ছিন্ন জন্মস্থান থেকে
আর্তনাদ আর ক্রন্দন ধ্বনি বিমর্ষিত করেছে নারী আর নরে।
ইচ্ছে করে হৃদয় বিদীর্ণ করি বিরহে

বলি বেদনার মর্মকথা হৃদয় নিনাদে।”

অতঃপর বলেন,

“যেন দু’টি সুখ রয়েছে আমার
একটি তার লুকিয়ে আছে ওষ্ঠাধরে।”

কখনো মৌলভী একটু ভিন্নতা দিয়ে উপমিত করেন–

“হস্তী যখন ঘুমায়; স্বপনে দেখে হিন্দুস্থান
গাধা কখনো দেখে না হিন্দুস্থান
কারণ হিন্দুস্থান যে নয় তার জন্মস্থান।”

কথিত আছে, যে হাতীকে হিন্দুস্থান থেকে আনা হয়, তাকে সব সময় একটা কঠোর অবস্থার মধ্যে রাখা হয় যাতে করে সে হিন্দুস্থানের স্মরণে নিজেকে ব্যস্ত না রাখতে পারে। মৌলভী এখানে বলেন, একমাত্র হাতীই হিন্দুস্থানকে স্বপ্নে দেখে, কারণ সে হিন্দুস্থান থেকে এসেছে। গাধা কখনো হিন্দুস্থানকে স্বপ্নে দেখে না। কারণ সে হিন্দুস্থান থেকে আগমন করেনি। প্রকৃতপক্ষে তিনি বলতে চান, একমাত্র মানুষই অন্য এক জগতে প্রত্যাবর্তনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়, যার রয়েছে আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক ব্যথা-বেদনা; বেদনার আর্তিতে সে খুঁজে ফিরে সত্য ও মহান প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনের পথ। তারই রয়েছে মুক্তির নিমিত্তে বেদনা, মহাসত্যের সাথে পুনর্মিলনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা।

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর ভাষায় মানুষের বেদনা

কতই না অপূর্ব বলেছেন আলী (আ.) যখন কুমাইল বিন যিয়াদ নাখীর সাথে মরুভূমির দিকে যাচ্ছিলেন! কুমাইল বলেন, “যেমাত্র বিজন মরুভূমিতে পৌঁছলাম আলী (আ.) এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং বললেন :

يَا كُمَيلُ بْنَ زِيَادٍ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوْبَ اَوْعِيَة فَخيرُهَا اَوْعَاهَا فَاحْفَظْ عَنِّىْ مَا أَقُوْلُ لَكَ.

মানুষের অন্তর পাত্র সদৃশ; আর সবচেয়ে ভাল পাত্র সেটাই যার ধারণক্ষমতা সর্বাধিক অথবা ধারণকৃত বস্তুকে উত্তমরূপে রক্ষা করে। শ্রবণ কর যা আমি তোমাকে বলছি। (প্রথমে মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করেন, যেটা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়) সবশেষে বলেন, এমন কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি নেই যে, আমার হৃদয়ের গহীনে লুক্কায়িত বেদনাগুলোকে তার কাছে প্রকাশ করতে পারি। অতঃপর বলেন, এমনটি নয় যে, কেউই নেই, বরং সর্বদা প্রত্যেক যুগেই এ ধরনের ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান।

اَللّٰهُمَّ بَلَى لا تَخلُوْا الاَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لله بِحُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِرًا مَشْهُوْرًا اَوْ خَائِفًا مَغْمُوْرًا... هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيْقَةِ الْبَصِيْرَةِ.

নিশ্চয়ই বিশ্ব কখনই আল্লাহ্‌র হুজ্জাত (দলিল-প্রমাণ) বিহীন থাকে না– হোক প্রকাশিত, পরিচিত অথবা অপ্রকাশিত ও অপরিচিত... অবশেষে তাদের প্রকৃত জ্ঞান তাদের দৃষ্টির সীমানাকে ছাড়িয়ে গেছে এবং দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। তাদের বিশ্বাস তাদের আত্মার সাথে সংযুক্ত হয়েছে এবং আত্মা ও

বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য অপনোদিত হয়েছে। যা সুবিধাবাদী ও বস্তুবাদীদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর তা তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ ও আরামদায়ক। যা মূর্খের (সত্য থেকে দূরে) জন্য ভীতির কারণ, তা তাদের জন্য ইপ্সিত ও কাঙ্ক্ষিত।

وَصَحِبُوْا الدُّنْيَا بِاَبدَانٍ اَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ الاَعْلَى (نَهْج البلاغة)

তারা পৃথিবীতে মানুষের সাথী, তবে তাদের আত্মাসমূহ উর্ধ্বলোকের প্রতি মহনীয়। তারা পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবীতে নেই। তারা এ পৃথিবীতে বসবাস করছে, আবার অন্য এক ভূবনেও রয়েছে।"

আলী (আ.)-এর বেদনা যা আমাদের ভাষায় আলীর আধ্যাত্ম বেদনা। তাঁর প্রার্থনা সম্পর্কীয় বেদনা এবং মোনাজাত এক দিব্য ও আলোকময় সত্য বিষয়। মহান প্রভুর উপাসনায় তিনি যখন মত্ত হতেন যেন আপনাকে ভুলে যেতেন, হারিয়ে যেতেন মহান প্রভুর প্রেমে, ভুলে যেতেন পারিপার্শ্বিকতাকে, এমনকি বিদ্ধ তীর যখন তাঁর দেহ থেকে মুক্ত করা হতো অনুভব করতেন না কিঞ্চিত পরিমাণ ব্যথাও।

আর এটাই হলো মানুষের প্রকৃত বেদনা অর্থাৎ মহাসত্যের বিরহ বেদনা; মহান প্রভুর সান্নিধ্য লাভের অভিপ্রায় এবং তাঁর দিকে ধাবিত হওয়া ও তাঁর নৈকট্য লাভ। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ তার প্রভুর সত্তায় লীন হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার এ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার অবকাশ নেই এবং এ অবস্থা তার মধ্যে সকল সময় বিদ্যমান। যদি মানুষ নিজেকে কোন কিছুর প্রতি ব্যস্ত করে, তবে তা মানুষের বিনোদনের কারণ হয়। তবে বাস্তবিকতা অন্য কিছু। কোরআন এ বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করে (أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ) "জেনে রাখ, একমাত্র মহান প্রভুর স্মরণের মাধ্যমেই অন্তরসমূহ (উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা থেকে) প্রশান্ত হয়।" (সূরা রাদ : ২৮) মানুষের এ বেদনা (প্রভুর সান্নিধ্য লাভ) একমাত্র একটি জিনিসের মাধ্যমে বিদূরিত হয়। আর তা হলো মহান প্রভুর স্মরণ ও তাঁর প্রেম। আধ্যাত্মিক সাধকগণ এ বেদনার উপরই নির্ভর করেন, অন্যান্য ব্যথার প্রতি তাঁরা খুব একটা গুরুত্ব দেন না।

মৌলভীর দেয়া একটি উদাহরণ :

মৌলভী দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কথিত আছে যে, এক ব্যক্তি সব সময় নিজের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করত ও আল্লাহ, আল্লাহ্ বলে চীৎকার করত। একদিন শয়তান সুযোগমত তার কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে ধোঁকা দিল এবং এমন কাজ করল যে, ঐ ব্যক্তি চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। শয়তান লোকটিকে বলল, "ওহে! প্রত্যহ প্রত্যুষে এই যে আকুল হৃদয়ে 'আল্লাহ্' ধ্বনিতে প্রভুকে ডাকছ, একবারও কি তাঁর পক্ষ থেকে সাড়া পেয়েছ? তুমি যদি প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে আপন ফরিয়াদের কথা ব্যক্ত করতে অন্তত একবার কেউ না কেউ এর জবাব দিত।" লোকটি ভাবল কথাটি তো যুক্তিসঙ্গত। অতঃপর সে চুপ হয়ে গেল; আর কখনো আল্লাহ্, আল্লাহ্ করে চীৎকার করল না। কল্পনার জগতে এক অদৃশ্য আহ্বানকারী তাকে বলল, "কেন খোদার কাছে মোনাজাতকে ত্যাগ করেছ?" লোকটি বলল, "দেখলাম এত মোনাজাত, ব্যাকুলতা যে

আমি প্রকাশ করে যাচ্ছি, একবারও তো তার জবাব শুনতে পেলাম না।" অদৃশ্য আহ্বানকারী তখন বলল, "কিন্তু আমি মহান প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তোমার উত্তর দিচ্ছি এবং তোমার ঐ আল্লাহ্ ধ্বনিই আমাদের উপস্থিতি।"

"জান না যে, তোমার আল্লাহ্ ধ্বনিই আমাদের উপস্থিতির প্রমাণ
এই যে তোমার ব্যাকুলতা, অভাব-অভিযোগ সে তো আমাদেরই পাইক।"

তুমি জান না, এই যে ব্যথা-বেদনা, আকুলতা যা আমরা তোমার হৃদয়ে স্থাপন করেছি, এই যে প্রেম ও প্রেমাদ্রতা যা তোমার হৃদয়ের গহীনে আলোড়িত হচ্ছে তা-ই আমাদের সাড়া দানের প্রমাণবহ। কেন আলী (আ.) দোয়া কুমাইলে বলেন,

اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى الذُّنُوْبَ الَّتِىْ تَحْبِسُ الدُّعَاء

"হে প্রভু! যে সকল গুনাহ আমার দোয়ার অন্তরায় হয় ও তোমার প্রতি আমার ব্যাকুলতাকে অপনোদন করে দেয়, আমার সে সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও।" আর এটাই হলো প্রকৃত দোয়া– যা হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও যাঞ্চাকে যেরূপ প্রকাশ করে, সেরূপ গ্রহণযোগ্যতার কারণ সম্বলিতও। অর্থাৎ দোয়া সর্বদা গৃহীত হওয়ার জন্য নয়। তার গ্রহণযোগ্যতা না থাকলেও গৃহীত হয়েছে। দোয়া স্বয়ং কাম্য ও বাঞ্ছিত।

আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি মানুষের অনুভূতি

অপর এক দলের মতে যারা মানুষের ব্যথাকে সকল মূল্যবোধের মূল্যবোধ রূপে মনে করেন, তাঁরা এ ব্যাপারে অন্য একটি বিষয়কে অনুধাবন করেছেন। তাঁরা মনে করেন, মানুষের এ ব্যথা মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং তাঁর সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। তাঁরা বলেন, মনুষ্যত্বের মাপকাঠি হলো অপরের ব্যথাকে উপলব্ধি করা অর্থাৎ অপরের উদ্বেগ ও মানসিক অশান্তি যা তার নিজের সাথে সম্পর্কহীন, তা তারও উদ্বেগ ও মানসিক অশান্তি সৃষ্টি করে। সে অপরের ব্যথায় ব্যথিত হয়।

সা'দীর মতে, যদি অন্যের ব্যথায় কেউ ব্যথিত হয়, তবে অন্যের ক্ষুধা তার নিদ্রাকে দূরীভূত করে। তার জন্য আপন ক্ষুধা অপরের ক্ষুধার চেয়ে সহজতর হয়। যদি অন্যের পায়ে কাঁটা ফোটে তবে তা যেন তার চোখে বিদ্ধ হয়েছে। বলা হয়, মানুষের ব্যথা তা-ই যা মানুষকে ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধ দিয়ে থাকে। আর এটাই হলো মানুষের সকল মূল্যবোধের উৎস। অধুনা আমরা দেখতে পাই, যারা অনবরত বলে থাকেন যে, অমুক বিষয়টি মানবিক; প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মানবতাকে ঐ স্থান ছাড়া অপর কোন স্থানে প্রয়োগ করেন না। যে সকল বিষয় মানুষের দায়িত্ববোধ ও অন্য সকল মানুষের প্রতি আপন বেদনাবোধের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, ঐ সকল বিষয়কেই তাঁরা মানবিক বলে মূল্যায়ন করেন। এটা ছাড়া অন্য কোন বিষয়কে তাঁরা মানবিক বলে মনে করেন না। যা হোক, এটাও মূল্যবোধসমূহের অপর এক মূল্যবোধে বিলুপ্ত হওয়ার ঘটনা।

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যথা

ইসলামী মূল্যবোধের দৃষ্টিতেও কি মানুষ সে-ই যে অপরের ব্যথায় ব্যথিত হয়? অথবা সে শুধু খোদাপ্রেমের অধিকারী? প্রকৃতপক্ষে ইসলামী মূল্যবোধের দৃষ্টিতে মানুষ হলো সে-ই, যে খোদাপ্রেমের অধিকারী। আর এ খোদাপ্রেমের কারণেই অপর মানুষের প্রতিও রয়েছে তার অনুরাগ।

লক্ষ্য করুন, কোরআন অপরের সমব্যথী হওয়া সম্পর্কে কিরূপ কথা বলে। মহানবী (সা.) সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে–

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهَذَا الْحَدِيْثِ أَسَفًا.

"অতঃপর তুমি তাদের আচরণে এতই অসন্তুষ্ট হয়েছ যদি তারা এ কথাগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে যেন তুমি নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলবে।" (সূরা কাহাফ : ৬)

নবী (সা.) মানুষের সৌভাগ্য ও সঠিক পথ প্রদর্শন এবং পার্থিব ও পরজীবনের বন্দীদশা থেকে মানুষকে মুক্তিদানের জন্য এতই ব্যাকুল ছিলেন যেন নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলবেন। ঘোষণা করা হলো কি হয়েছে, তুমি যেন মানুষের জন্য নিজেকে শেষ করে ফেলবে?

طه مَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى إِلا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى.

"আমি তোমার প্রতি কোরআন এজন্য নাযিল করিনি যে, তোমাকে ক্লেশ দিব; বরং যারা ভয় করে কেবল তাদের উপদেশার্থে (নাযিল করেছি)।" (সূরা ত্বাহা : ১-৩)

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

"তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছে। তোমাদের যা বিপন্ন করে তা তার জন্য খুবই কষ্টদায়ক। সে তোমাদর পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; মুমিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।" (সূরা তাওবাহ্ : ১২৮)

লক্ষ্য করুন, কোরআনের ব্যাখ্যা কতটা বিস্ময়কর ও চমৎকার! হে লোক সকল! তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের শ্রেণীরই একজন তোমাদের জন্য নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছে; যার প্রধান বিশেষত্ব হলো عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ (**عَنَت** অর্থ দুঃখ, কষ্ট) তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাকে ব্যথাতুর করে এবং তিনি তোমাদের সমব্যথী। তাহলে (প্রকৃত) মুসলমান কে? মুসলমান সে-ই যার মধ্যে যেমন রয়েছে সৃষ্টিকর্তার প্রেম তেমনি রযেছে সৃষ্টির প্রতি অনুরাগ। حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ কোরআনের এ আয়াতাংশে 'حَرِيْصٌ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন পিতাকে দেখা যায় আপন সন্তানকে আলেম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এতটা বাড়াবাড়ি করে যে, লোকজন তাকে সন্তান শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে লালায়িত (حَرِيْصٌ) বলে অভিহিত করে– পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি লোভাতুর কোন ব্যক্তি অথবা অর্থপূজারী কোন ব্যক্তির মতো যে অর্থ মজুদের জন্য লালায়িত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মানুষের মুক্তির জন্য লালায়িত, তিনি লালায়িত মানুষের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করে তাকে মুক্তি দিতে। আর এটাই হলো প্রকৃত সৃষ্টিপ্রেম।

স্বয়ং আলী (আ.) কি উপরিউক্ত ব্যাখ্যানুরূপ ব্যাখ্যা করেননি? ব্যথা সম্পর্কে স্বয়ং আলী কি কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেননি?

(এ প্রসঙ্গে) বহুল প্রচলিত একটি ঘটনা সম্ভবত আপনারা শুনে থাকবেন। বাসরায় উসমান বিন হুনাইফ নামে এক ব্যক্তি কোন এক নিমন্ত্রণ সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ নিমন্ত্রণ সভার অবস্থা কি ছিল? (আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই) মদ্যপ ছিল? না। জুয়ার আড্ডা ছিল? না। ব্যভিচার-অশ্লীলতা? না, তাও নয়। তাহলে কি ছিল? উসমান বিন হুনাইফের অপরাধ ছিল এটাই যে, সার্বিকভাবে অভিজাতদের জন্য একটা অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন অর্থাৎ দরিদ্র শ্রেণীর কেউ ঐ অনুষ্ঠানে ছিল না। হজরত আলীর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, আপনার প্রতিনিধি ও প্রশাসক এমন এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন যেখানে শুধু ধনিক, বনিক ও পুঁজিপতিগণের উপস্থিতি ছিল, অথচ দরিদ্রদের মধ্যে কেউই সেখানে ছিল না। আলী (আ.) বললেন,

وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيْبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوٌّ وَ غَنِيُّهُمْ مَدْعُوٌّ

"আমি বিশ্বাস করতে পরিনি যে, তুমি এমন এক দস্তরখানায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছ যেখানে পুঁজিপতিগণ নিমন্ত্রিত হয়েছে, অথচ দরিদ্রগণ নিমন্ত্রিত না হয়ে গৃহদ্বারের পশ্চাতে অবস্থান করছিল।" অতঃপর আলী আপন হৃদয়ের ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করতে শুরু করলেন এবং এক পর্যায়ে নিজ সম্পর্কে বলেন,

وَ لَوْ شِئْتُ لاهتَدَيْتُ الطريْق إِلَى مُصَفَّى هَذَا الْعَسَلِ وَ لُبَابِ هَذَا الْقَمْحِ وَ نَسَائِج هَذَا الْقَزِّ.

"যদি আমি চাই তবে আমার জন্য ভোগ ও বিলাস সামগ্রীর রয়েছে প্রাচুর্য, সর্বোৎকৃষ্ট খাবার, পানীয়, সর্বোত্তম পরিচ্ছদ; যা চাইব তা-ই আমার জন্য উপস্থিত।"

وَ لَكِن هَيْهَاتَ أَن يَغْلِبَنِى هَوَاىَ وَ يَقُوْدَنِى جَشَعِى إِلَى تَخَيُّر الاطْعِمَةِ.

"দূর হোক আমা হতে এ অবস্থা যে, আমি এমনটি করব। অসম্ভব, আমি আমার লাগামকে কখনই নাফ্সের চাহিদা ও লোভের নিকট সমর্পণ করব না।"

এখন, কেন আলী এরূপ বলেছেন? তবে কি আল্লাহ্ এ সকল নিয়ামত নিষিদ্ধ করেছিলেন? আলী (আ.) স্বয়ং এ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন যাতে কেউ মনে না করেন যে, ভালো পোশাক পড়া নিষেধ, স্বচ্ছ মধু পান নিষেধ। না, মোটেই তা নয়। বরং ব্যপারটি হলো এর ব্যতিক্রম। এগুলো হারাম নয়, হালাল।

وَ لَعَلَّ بالحجاز اَوِ الْيَمَامَةِ مَن لا طَمَعَ لَهُ فِى الْقُرْصِ وَ لا عَهْدَ لَهُ بِالشَّبعِ.

"যদি এখানে আমি আপন উদর পূর্ণ করি, তবে ইরাক, কুফা, ইয়ামামাহ্ এবং পারস্যপোসাগরের উপকূলে এমন কেউ হয়তো থাকবে যে এক টুকরা রুটির আশাও করতে পারে না।"

او اَبِيْتَ مبطَاناً وَ حَوْلَى بُطُوْنٌ غَرْثَى وَ أَكْبَادٌ حَرَّى.

"আমি কি আপন উদর পূর্ণ করে ঘুমাব। আর আমার চারিদিকে অসংখ্য ক্ষুধার্ত পেট ও তৃষ্ণার্ত বক্ষ অবস্থান করবে?" আমি কি কবির সে কাব্যের মতো হব যে কবি বলেন,

حَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَبِيْتَ بِبِطْنَةٍ وَ حَوْلَكَ أَكْبَادٌ تَحِنُّ إِلَى الْقِدِّ.

"তোমার চারিদিকে যে অসংখ্য ক্ষুধার্ত পেট অবস্থান করছে, তাদের জন্য তোমার সমবেদনাই যথেষ্ট, আর তুমি উদর পূর্ণ করে ঘুমাও।"

এই যে সমবেদনা, এটাই হলো সৃষ্টির প্রতি অনুরাগ। একেই বলে মানবতার মানদণ্ড। সঠিকভাবে বললে বলতে হয়, মূল্যবোধসমূহের দ্বিতীয় মা।

অতঃপর আলী (আ.) বলেন,

أَ أَقْنَعُ مِنْ نَفْسِى بِأَن يُقَالَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ لا أُشَارِكُهُمْ فِى مَكَارِهِ الدَّهْرِ؟

"আমি কি নাম-পদবিতেই পরিতৃপ্ত হব? আমাকে যে সম্বোধন করা হয় : হে আমীরুল মুমিনীন! আমাকে যে খলিফা বলে আখ্যায়িত করা হয় অথবা পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্যের অধিপতি বলা হয়, এতেই কি আত্মতুষ্ট হব এবং নিজেকে আমীরে মুমিনীন বলে জানব, অথচ মুমিনগণের কষ্টে অংশীদার হব না?" (নাহজুল বালাগাহ্, পত্র নং ৪৫)

আলী (আ.)-এর উপরিউক্ত বক্তব্যগুলো থেকে একটি বিষয় স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়– সমবেদনা, অপরের কষ্টকে অনুভব করা।

কাঙ্ক্ষিত ব্যথা

এখন আপনাদের কাছে জানতে চাই, এটা কি মানুষের জন্য ভালো যে, সে বিকলাঙ্গ হবে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হবে অসাড় ও শক্তিহীন অথবা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো হবে সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর, ফলে সে এ ব্যথাকে উপলব্ধি করতে পারবে?

এ ব্যথা যেমনি ব্যথা তেমনি উপভোগ্যও বটে। কারণ অপরের তরে যে ব্যথা, সে ব্যথা সর্বদাই উপভোগ্য হয়ে থাকে। এর মানে কি? সৃষ্টিকর্তাই স্বয়ং জানেন। অপরের নিমিত্তে ব্যথা যেমন কাঙ্ক্ষিত ও উপভোগ্য তেমনি সত্য-প্রভুর বিচ্ছেদ ব্যথাও কাঙ্ক্ষিত ও উপভোগ্য।

বু আলী (ইবনে সিনা) তাঁর 'ইশারাত' গ্রন্থে এ বিষয়ের উপর (কোন ব্যথা যেমনি ব্যথা তেমনি উপভোগ্য) একটি উদাহরণ এনেছেন। তিনি বলেন, "এ ধরনের ব্যথা হলো শরীর চুলকানোর মত। শরীর যখন চুলকায় তখন যন্ত্রণাদায়ক হয়। যখন মানুষ তার শরীরের উক্ত স্থানে আঁচর কাটে তখন

ব্যথা অনুভব করে এবং এ ব্যথা অনুভবের পাশাপাশি সে পরিতৃপ্তিও লাভ করে। এ ব্যথা তিক্ত নয়।" (বু-আলী বলেন, তাঁর এ উদাহরণটি আবর্তনিক।)

এ ব্যথা এমন এক ব্যথা যা অন্তরকে জ্বালায়, অশ্রুর ধারা বইয়ে দেয়। কিন্তু প্রিয়জনের তরে এ বেদনা– কাঙ্ক্ষিত বেদনা। মানুষ এক ধরনের দুঃখ-কষ্ট থেকে সর্বদা পলায়ন করে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে, আমাদেরকে যখন বলা হয়, ইমাম হুসাইন (আ.)-এর উপর মর্সিয়া পাঠের অনুষ্ঠান হবে, দারুণ মর্মস্পর্শী অনুষ্ঠান, তখন আমরা সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করি। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের হৃদয় দাহ হয়, ব্যথা অনুভব করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কপল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে না। এতদসত্ত্বেও আমরা দেখি, মানুষ এ মর্মস্পর্শী অনুষ্ঠানে যায়, এ বেদনাকে উপলব্ধি করে, অশ্রুসম্বরণ করে। যখন মানুষের এ আঁখি বারি ঝড়ায়, এমন এক নির্মল প্রশান্তিও তখন অনুভব করে থাকে যে, উক্ত ব্যথা এর তুলনায় অতি নগণ্য। আর এটাই হলো মনুষ্য বেদনা।

ধন্য হোক ঐ সকল দেহ যাদের আত্মা শুধু তাদেরই দেহের ব্যথা অনুভব করে। ধন্য হোক ঐ দেহ যার আত্মা শুধু আপন দেহের ব্যথাই অনুভব করে। কারণ ঐ আত্মা সর্বদা আপন দেহের ব্যথা নিবারণ করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু সমস্যা হলো সে দেহের যার আত্মা আপন দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সে আত্মা সকল দেহের। এক আত্মা সকল দেহের ব্যথা একাকীই অনুভব করে। এ দেহই সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধার আধিক্য থাকা সত্ত্বেও শুধু দু'লোকমা যবের রুটিতে তুষ্ট হতে বাধ্য। কারণ তার ভয় হয়, হয়তো হিজাজ অথবা ইয়ামামায় এমন কেউ থাকতে পারে যে যবের রুটি খেয়ে থাকে। এ দেহই তালি দেয়া জুতা পরতে বাধ্য। কারণ এ আত্মা হযরত আলী (আ.)-এর আত্মার সমতুল্য। আরব কবির ভাষায়–

وَ إِذَا كَانَت النُّفُوسُ كِبَارًا تَعِبَتْ مُرَدِهَا الاجسَامُ.

"দুঃখ হয় সে আত্মার তরে যে লভিল বিকাশ।"

আত্মা যখন বিকাশ লাভ করে তখন সকল দেহের আত্মা হয়ে যায় এবং অনুভব করে সকল দেহের বেদনাকে। তখন তার কর্ম এমন এক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছে যে কর্মফল দেখতে পায়; কিন্তু কেন? এজন্য যে, সে এক বিধবা নারী ও কয়েকটি অনাথ সন্তানের অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন ছিল। কোন এক গলির মধ্য দিয়ে যেতে দেখা গেল এক নারী কলসী কাঁধে হেঁটে যায়। আলী (আ.) এমন মানুষ নন যে, এ দৃশ্য অবলোকন করলেন, অথচ কোন গুরুত্ব দিলেন না। এটা হতে পারে না যে, এক নারী স্বয়ং পানি বহন করবে। নিশ্চয়ই তার কেউ নেই অথবা থাকলেও তাকে সাহায্য করতে পারে না। তিনি সাহায্য করার জন্য দ্রুত সামনে এগিয়ে যান। বলেন না যে– হে অনুচর! হে প্রহরী! হে গোলাম! হে জনাব! এদিকে এসো; বরং স্বয়ং এগিয়ে যান। পূর্ণ মর্যাদা বজায় রেখে বলেন, "হে ভদ্রমহিলা! আপনি কি আমাকে অনুমতি দেবেন, আপনাকে সাহায্য করব? আপনার পানির কলসী আমাকে বহন করতে অনুমতি দিবেন? এ পরিশ্রম আমাকে করতে দিন।" উক্ত মহিলা বলেন; "আল্লাহ্ আপনার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন।" তিনি ঐ বিধবা মহিলার গৃহে যান। কলসী রেখেই জানতে চান, "কেন আপনি স্বয়ং পানি বহন করে আনেন? সম্ভবত কোন পুরুষ আপনার গৃহে নেই।" মহিলা বলেন, "জী,

ঘটানাক্রমে আমার স্বামী আলী বিন আবি তালিবের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। আমি আমার কয়েকটি অনাথ বাচ্চা নিয়ে আছি।" যখনই আলী (আ.) এ কথাগুলো শুনলেন আপাদমস্তকে তাঁর অগ্নি সঞ্চার হলো। ঐ রাতে আলী ফিরে আসলেন, কিন্তু প্রভাত অবধি ঘুমাতে পারলেন না। প্রাতেই রুটি, মাংস, খোর্মা নিয়ে খুব দ্রুত উক্ত বিধবার দ্বারে উপস্থিত হলেন। যখন দ্বারে আঘাত করলেন তখন মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে?" জবাবে তিনি বললেন, "আমি আপনার শতকালের মুমিন ভাই।" খুব দ্রুত মাংসগুলোকে স্বহস্তে কাবাব করলেন ও অনাথ শিশুদের মুখে তুলে দিলেন। অনাথ বাচ্চাদেরকে আপন জানুর উপর বসিয়ে চুপিসারে বললেন, "আলীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে দাও যে তোমাদের সম্পর্কে উদাসীন ছিল।" অতঃপর চুল্লীতে আগুন দিলেন। যখন চুল্লী অগ্নিতে উত্তপ্ত হলো তখন তার নিকটবর্তী হয়ে অগ্নুত্তাপ উপলব্ধি করেন আর আপন মনে বলেন, "আলী! পার্থিব আগুনের তাপ উপলব্ধি কর যাতে করে নরকের আগুনের কথা স্মরণ করতে পার। ফলে আর কখনও জনগণের অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন হবে না।" যে দেহকে কষ্ট সহ্য করতে হয় এ ধরনেরই হয়ে থাকে। যে দেহের আত্মা সকলের, সকল মানুষের– তার অবস্থা এমনি হয়ে থাকে।

بِاسْمِكَ الْعَظِيْمِ الاَعْظَم الاعز الاجل الاكرم يَا الله.

প্রভু হে! তোমাকে আলী (আ.)-এর কসম, আমাদের অন্তরে ইসলামের অনুরাগ সৃষ্টি কর। আমাদের সকলকে শুভ পরিণতির অধিকারী কর। তোমার প্রেম, পরিচিতি, অনুগত্য ও উপাসনার অনুরাগ আমাদের অন্তরে দান কর। তোমার সৃষ্টির প্রতি সমবেদনা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি কর। আলীর বেলায়েতের আলোতে আমাদের আলোকিত কর। আমাদেরকে ঐ মহান ব্যক্তির সত্যিকারের অনুসারী হিসেবে পরিগণিত কর। আমাদের অন্তরগুলোকে ঈমানের আলোতে আলোকিত কর। আমাদেরকে ইসলামের স্বরূপের সাথে পরিচিত কর।

وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا باللهِ العلى العظِيْمِ.

৪

মানুষের মধ্যে খোদাকে পাওয়ার জন্য বেদনা

وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوة وَ انَّهَا لَكَبِيْرَة إِلا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ

মানুষ সব সময় নিজের জন্য নিজেই নৈতিকতার প্রবেশ পথ। মানুষ নিজেই নিজের জন্য নৈতিকতার প্রবেশ পথ– এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো নিজের অস্তিত্বের ভিতরেই সে আত্মিক জগতকে দেখে এবং উদ্ঘাটন করে। এটা এজন্য যে, মানুষের ভিতরে এমন কিছু আছে যা বস্তুজগতের মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। কেবল যে সকল প্রাচীন আলেম 'মারেফাতে নাফ্স' (নাফ্সের পরিচিতি) বা 'মারেফাতে রূহ' (আত্মার পরিচিতি)-এর কথা বলেছেন তাঁরাই নন, বরং বর্তমানে যে সকল আলেম 'মারেফাতে নাফ্স'-এর কথা বলছেন তারাও স্বীকার করেছেন যে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু নিহিত আছে যা বস্তুজগতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এটার জন্য অন্য কোন মাপকাঠি প্রয়োজন।

রাসূল (সা.)-এর নিকট থেকে একটি হাদীস বহুল প্রচলিত–

مَنْ عَرَفَ نَفْسَه فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه.

"যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সে নিজের প্রভুকে (আল্লাহ্) চিনতে পেরেছে।"

পবিত্র কোরআন সৃষ্টি জগতের অন্য সকল বস্তু থেকে মানুষের বিষয়টি পৃথকভাবে বর্ণনা করেছে। কোরআন বলছে,

سَنُرِيْهِمْ آيَاتِنَا فِى الآفَاقِ و فِي أَنْفُسِهِمْ.

"আমরা আমাদের নিদর্শনগুলোকে জগতের চারিদিকে (প্রকৃতি জগতে) এবং তাদের (মানুষের) মধ্যে দেখাব।" কোরআন মানুষের বিষয়টি স্বাধীনভাবে (আলাদাভাবে) বর্ণনা করেছে। এ আয়াতের ফলশ্রুতিতেই آفَاق ও أَنْفُسِهِمْ পরিভাষা দু'টি সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। বলা হচ্ছে বাইরের জগতের বিষয় (مَسَائِل آفَاق) ও মানুষের অভ্যন্তরীণ বিষয়।

সম্ভবত কেউ প্রশ্ন করবেন কি বস্তু মানুষের সত্তায় রয়েছে যাকে বস্তু দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না? এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় এটা অত্যন্ত ব্যাপক বিষয়। এ বিষয়ে এখন আলোচনা করতে চাচ্ছি না।

মনুষ্যত্বকে মানুষ থেকে আলাদা করা যায়

মানুষের যে সকল বৈশিষ্ট্যকে বস্তুগত হিসেবে মাপা যায় না তার একটি এই বৈঠকে আলোচনা করব যা হলো মানবিক মূল্যবোধ, অন্যভাবে বললে মানুষের মনুষ্যত্ব। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, যে কোন বস্তুকে নিয়ে আমরা চিন্তা করি না কেন দেখব ঐ বস্তু থেকে তার গুণাবলী পৃথকযোগ্য নয়, যেমন নেকড়ে থেকে নেকড়ের স্বভাবকে পৃথক করা যায় না, তেমনিভাবে কুকুর বা ঘোড়া থেকে তাদের স্বভাব পৃথক করা অসম্ভব। আমরা এমন কোন ঘোড়া খুঁজে পাব না যার মধ্যে ঘোড়ার স্বভাব অনুপস্থিত। কিন্তু এটা সম্ভব যে, আমরা এমন মানুষ খুঁজে পাব যার মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই। কারণ মনুষ্যত্বের জন্য যে উপাদান (যা আমাদের পূর্ববর্তী বৈঠকে আলোচনা করেছি) যা মানুষকে ব্যক্তিত্ব দান করে (ব্যক্তিমানুষ নয়) প্রথমত তা যদিও মানুষ সম্পর্কিত ও এই পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত কিন্তু তা মানুষের বস্তুগত গঠনের জন্য নয়, বরং অবস্তুগত– যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবযোগ্য নয়। অন্যভাবে বললে মানুষের আত্মিকতার বিষয়, দৈহিক নয়। দ্বিতীয়ত যে বিষয়গুলো মানুষের মনুষ্যত্বের মাপকাঠি অর্থাৎ তার মানবিক ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড তা প্রকৃতির হাতে তৈরি হয় না, বরং কেবল মানুষ নিজের হাতেই তা তৈরি করতে পারে।

আমার এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো এটা বুঝানো যে, মানুষের নিজের আত্মিক বিকাশের রূপক মানুষ নিজেই। নিজেই নৈতিকতার জগতে প্রবেশ করে। যেমন ইমাম আলী ইবনে মূসা আর-রেজা (আ.) বলেছেন,

لاَ يُعْرَفُ هُنَالِكَ إلا بما هيهنا

"যা সেখানে (আত্মিক জগতে) আছে তা এখানে (মানুষের ভিতরে) কি আছে তা থেকেই জানা যাবে।" এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যে বিষয়গুলোকে মানবিক মূল্যবোধ হিসেবে ধরা হয় এবং মানুষের নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত অনেক কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ সকল মূল্যবোধকে একটি মূল্যবোধের মধ্যে আনা যায়। আর তা হলো 'মানবতার বেদনা'। পৃথিবীতে যত মতবাদই মানবিক মূল্যবোধের ব্যাপারে আলোচনা করেছে দৈহিক বেদনার (যা অন্যান্য জীবও অনুভব করে) বাইরে অন্য এক ধরনের বেদনা মানুষের মধ্যে আছে বলে স্বীকার করে। সেটা হলো 'মানবিক বেদনা'। এ 'মানবিক বেদনা'টি কি?

আমরা বলেছি কেউ কেউ এটাকে শুধু মূল থেকে বিচ্ছিন্নতা ও পৃথিবীর পরিবেশের সঙ্গে মানুষের পরিচয়হীনতা ও অসামঞ্জস্যতার বেদনা বলেছেন। কেননা মানুষ এমন এক অস্তিত্ব যাকে তার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরবর্তী স্থানে (অন্য এক পৃথিবীতে) দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই আসল থেকে দূরে থাকাই তার মধ্যে প্রকৃত আবাসের প্রতি ভালবাসা, টান, আকুতি ও বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। প্রকৃত আবাসে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ অর্থাৎ স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তনের অনুভূতি জন্ম দিয়েছে। সে বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়ে এ ধুলার ধরণীতে এসেছে তাই আবার সেই প্রতিশ্রুত বেহেশতে ফিরে যেতে চায়। অবশ্য তার এ আগমন ভুল করে নয়, বরং দায়িত্ব পালনের জন্য ছিল। কিন্তু এ বিচ্ছিন্নতা তাকে সব সময় বেদনাক্লিষ্ট করেছে। এ মতবাদের মতে মানুষের বেদনা শুধু আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর থেকে দূরে থাকার জন্য এবং সেই সত্যের নিকট (মহান রব্বুল আলামীনের

নিকট) প্রত্যাবর্তনের আশা থেকে সৃষ্ট। মানুষ পূর্ণাঙ্গতার যে পর্যায়েই পৌঁছে থাকুক না কেন তারপরও সে অনুভব করে সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছেনি।

মানুষ সর্বোচ্চ পূর্ণতার প্রত্যাশী

একটি কথা প্রচলিত যে, মানুষ সব সময় সে জিনিসই চায় যা তার নিকটে নেই। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। যা তার নেই তা পেতে চায়। কিন্তু যখন সে জিনিসটি পায় আস্তে আস্তে সেটার প্রতি আগ্রহ কমে যায়। এটা প্রকৃতিতে একটি অযৌক্তিক বিষয় যে, কোন সৃষ্টিতে কিছুর প্রতি আকর্ষণ আছে কিন্তু যখন তা লাভ করে তখন নিজ থেকে সে বস্তুকে বিকর্ষণ করে।

এক ব্যক্তি একটি ঘটনা বলেছিল। একটি বিদেশী জাদুঘরে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। বিছানার উপর ঘুমন্ত একজন খুব সুন্দর রমণীর একটি মূর্তি লক্ষ্য করলাম আর এক সুন্দর যুবকের মূর্তি যার এক পা ঐ বিছানার উপর আর অন্য পা মাটিতে রাখা। যুবকটি তার মুখ বিপরীত দিকে ফিরিয়ে রেখেছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন সে পালিয়ে যাচ্ছে। এটা দেখার পর এর অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না যে, কেন ভাস্কর এ নারী ও পুরুষের মূর্তিতে একে অপরের প্রতি আসক্ত না দেখিয়ে বরং পুরুষ মূর্তিটিকে নারীর প্রতি অনাসক্ত দেখিয়েছেন। যিনি এই ভাস্কর্যগুলো ব্যাখ্যা করছিলেন তাঁকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, "এ যুগল মূর্তি প্লেটোর প্রসিদ্ধ একটি চিন্তা থেকে নেয়া হয়েছে– মানুষ যে প্রেমিকার প্রতি আসক্ত থাকে প্রথমদিকে তার প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি ও আকর্ষণ সহকারে ধাবিত হয়, কিন্তু যখনই সেটাকে লাভ করে তখনই এ আকর্ষণ ও আসক্তির মৃত্যু ঘটে। তখন তার প্রতি অনাসক্তি দেখা দেয় ও তা থেকে পালিয়ে যেতে চায়।"

কেন এ রকম হয়? দৃশ্যত এ বিষয়টি অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক মনে হয়। কিন্তু যারা এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন, এ বিষয়টির সমাধান পেয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, মানুষ এমন এক অস্তিত্ব যা সীমিত কোন বস্তুর প্রেমিক হতে পারে না। সে অস্থায়ী বস্তুর প্রেমিক হতে চায় না। যে বস্তু স্থান ও কালের পরিসীমায় সীমাবদ্ধ তা তার প্রকৃত আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নয়। মানুষ অপরিসীম পূর্ণত্বের প্রেমিক, অন্য কিছুর নয়। সে অসীম সত্তা মহাসত্য খোদার প্রেমিক। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে, তাঁকে গালি দেয় সে নিজেও জানে না তার সত্তার গভীরে সে ঐ অপরিসীম পূর্ণ সত্তার প্রেমিক; কিন্তু সে পথ হারিয়ে ফেলেছে, প্রেমিককে ভুলে গেছে।

মহিউদ্দীন আরাবী বলেন,

مَا أَحَبَّ أَحَدٌ غَيْرَ خَالِقِهِ

"কোন মানুষই স্রষ্টা (আল্লাহ্) ব্যতীত অন্য কাউকে ভালবাসেনি।"

এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুকে ভালবেসেছে।

وَ لَكِنَّهُ تَعَالَى احْتَجَبَ تَحْتَ اسْمِ زَيْنَبِ و سُعَادِ وَ غَيْرِ ذٰلِكَ.

"কিন্তু আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তায়ালা যয়নাব, সোয়াদ বিভিন্ন নামের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন।"

মজনু ভাবে, সে লাইলীর প্রেমিক, কিন্তু সে নিজের সত্তার সম্পর্কে বেখবর। এ জন্যই মহিউদ্দীন আরাবী বলেন, নবিগণ এ জন্য আসেননি যে, মানুষকে আল্লাহ্র ভালবাসা ও ইবাদত শিক্ষা দেবেন (যেহেতু এগুলো মানুষের ফেতরাতের অন্তর্ভুক্ত), বরং তাঁরা এসেছেন এজন্য যে, তাঁরা মানুষকে বক্র ও সরল পথ চিনিয়ে দেবেন। তাঁরা বলতে এসেছেন, "হে মানব! তোমরা সীমাহীন পূর্ণত্বের প্রত্যাশী, কিন্তু তোমরা মনে কর অর্থ বা পদমর্যাদা বা কোন নারী সেই পূর্ণত্ব। তোমরা ঐ অপরিসীম পূর্ণ সত্তা ছাড়া অন্য কিছুই চাও না কিন্তু ভুল করে অন্য কিছুর পেছনে ছুটছো।" রাসূলগণ এসেছেন মানুষকে এ ভুল থেকে বের করে আনার জন্য।

মানুষের বেদনা খোদাকে পাওয়ার বেদনা। যদি ভুলের পর্দা চোখের উপর থেকে সরে যায় তাহলে মানুষ তার আসল প্রেমিককে খুঁজে পাবে। তখন সেও এমন আসক্তি নিয়ে ইবাদত করবে যেমন আমরা আলীকে দেখি।

কেন কোরআন এ কথা বলছে,

أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنَّ الْقُلُوْب

"জেনে রাখ, কেবল আল্লাহ্র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।"

এখানে بِذِكْرِ اللهِ পূর্বে আনা হয়েছে সীমাবদ্ধ করার জন্য যে, একমাত্র এর মাধ্যমেই মানুষের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে এবং অস্থিরতা ও কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করে। মহান আল্লাহ্র স্মরণ ও সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমেই কেবল প্রশান্তি লাভ করা যায়। কোরআন বলছে, মানুষ যদি ভাবে, অর্থ-সম্পদ লাভের মাধ্যমে সে প্রশান্তি লাভ করবে, অস্থিরতা ও মনঃকষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করবে তবে সে ভুল করবে। কোরআন এটা বলছে না যে, তোমরা এগুলোর পেছনে ধাবিত হয়ো না, বরং বলছে এগুলোকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে। কিন্তু যদি মনে করে যে, এগুলোর মাধ্যমে প্রশান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করা যায় না। বরং যখন মানুষ এগুলো লাভ করে তখন অনুভব করে যে, ভুল করেছে। যা সে চেয়েছিল তা এতে নেই। তাই শুধু আল্লাহ্র স্মরণে অন্তঃকরণ শান্তি লাভ করে। অধিকাংশ মতবাদই এ চিন্তা থেকে দূরে।

কোন কোন মতবাদ তাদের মানব বেদনাকে খোদাকে পাওয়ার বেদনার উপর ভিত্তি না করে খোদার সৃষ্টির জন্য বেদনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কেউ কেউ এটাও বলেন যে, মানুষের খোদাকে পাওয়ার বেদনা, এটা আবার কি? উদাহরণস্বরূপ একটি পত্রিকার কথা বলছি যার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'খোদা না মানুষ?' কেউ বলছে খোদা, কেউ বলছে মানুষ, কেউ বা খোদা ও মানুষ দু'টিই। কিন্তু আমি কাউকে দেখিনি যিনি বলেছেন আল্লাহ্ ও মানুষ একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যদি আল্লাহ্ না থাকেন তাহলে মানুষও নেই। আমরা যতক্ষণ মানুষের ভেতরে খোদাকে পাওয়ার বেদনাকে না বুঝব, যতক্ষণ না আল্লাহ্র দিকে যাত্রা করব ততক্ষণ মানবতার জন্য বেদনাও নিষ্ফল হবে।

আরেফগণের দৃষ্টিতে পূর্ণ মানুষের পথ পরিক্রমা

আরেফগণ কেমন সুন্দর রূপে ইনসানে কামেলের পথ পরিক্রমাকে চিহ্নিত করেছেন! তাঁরা বলেছেন, ইনসানে কামেলের পথ পরিক্রমায় চারটি সফর রয়েছে :

১. মানুষের নিজ থেকে খোদার দিকে যাত্রা।

২. আল্লাহ্‌র সঙ্গে আল্লাহ্‌র দিকে যাত্রা (আল্লাহ্‌র পরিচয় জানা)।

৩. আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির যাত্রা (একা নয়)।

৪. আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সফর তাঁর সৃষ্টিকে মুক্তিদানের জন্য।

এর চেয়ে সুন্দরভাবে বলা সম্ভব নয়। প্রথমত সফর হচ্ছে মানুষের আল্লাহ্‌র দিকে যাত্রা অর্থাৎ যতক্ষণ মানুষ স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন ততক্ষণ সব কিছুই অর্থহীন। যখন সে খোদাকে জানবে ও চিনবে, তাঁর নৈকট্য অনুভব করবে ও নিজের মধ্যে তাঁকে অনুভব করবে তখন খোদার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির দিকে ফিরে আসবে এবং সে ব্যক্তিই স্রষ্টার সৃষ্টির মুক্তির জন্য সৃষ্টির মধ্যে ঘুরবে ও তাদেরকে স্রষ্টার নৈকট্য দানের জন্য চেষ্টা চালাবে।

যদি বলি মানুষের পথ পরিক্রমা সৃষ্টি থেকে খোদার দিকে, এখানেই থেমে গেলে মানুষকে চিনতে পারিনি। যদি বলি মানুষকে খোদার দিকে যাত্রা না করে বরং মানুষের দিকে যাত্রা করা উচিত (যেমন বিভিন্ন বস্তুবাদী মতবাদ বলে থাকে), তবে মানুষের মুক্তির জন্য কিছুই করতে পারবে না এবং এ কাজও নিছক ভাঁওতা হবে। তাঁরাই মানুষকে মুক্তি দিতে পারেন যাঁরা নিজেরা পূর্বে মুক্তি পেয়েছেন। তাহলে মানুষের মুক্তির অর্থ কি? কি থেকে মানুষের মুক্তি? পৃথিবীর বন্দিত্ব থেকে, না অন্যান্য মানুষের বন্ধন থেকে? যার অর্থ মানুষ থেকে মানুষের মুক্তি। এগুলো ঠিক, তবে এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষের আমিত্ব ও নাফ্‌সে আম্মারা এবং নিজের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি। যতক্ষণ মানুষ নিজের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি না পাবে ততক্ষণ পৃথিবীর বন্দিত্ব ও অন্যান্য মানুষের বন্দিত্ব থেকেও মুক্তি পাবে না।

বহিঃপ্রবণতা ও অন্তঃপ্রবণতার সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা

আমরা এখনও আমাদের আলোচনার প্রথম পর্যায়ে রয়েছি। আজ রাত মোবারক মাস রমযানের একুশের রাত্রি, রমযানের শেষ দশ রাত্রির প্রথম রাত্রি। যখন রমযানের শেষ দশ দিন আসত তখন রাসূল (সা.) নির্দেশ দিতেন শোবার বিছানা গুটিয়ে ফেলতে এবং শওয়াল মাসে তা খুলতে। অর্থাৎ রাসূল এ শেষ দশ দিনের কোন রাত্রিতেই ঘুমাতেন না। এ রাতগুলো ইবাদত, দোয়া, মোনাজাত ও আল্লাহ্‌র সঙ্গে একাকী কাটানোর রাত।

যা হোক আমরা যে বিষয় নিয়ে পূর্ববর্তী বৈঠকে আলোচনা করেছি, বলেছি যে, কখনো কখনো কোন কোন মূল্যবোধ অন্যান্য মূল্যবোধকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এক সময় ইসলামী সমাজ ইবাদতের মূল্যবোধের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল এবং বাড়াবাড়ি এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, অন্যান্য মূল্যবোধ ধ্বংস

করছিল। বর্তমানে আমি লক্ষ্য করছি অন্য আরেক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে; কেউ কেউ ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধের দিকে দেখেন, কিন্তু এর খোদায়ী দিককে ভুলে যান। তাঁরা আরেকটি ভুল ও বিচ্যুতির মধ্যে পড়েছেন– এক আরবের গাধায় চড়ার মতো যে গাধায় উঠার জন্য এমন জোরে লাফ দিল ফলে অন্য পার্শ্বে গিয়ে পড়ল। ফলে প্রথম প্রচেষ্টায় সে গাধায় উঠতে পারল না। দ্বিতীয় বারও সে তা-ই করল। তখন নিজেই বলল, كَ الاوَّل অর্থাৎ প্রথম বারের মতোই।

যদি এমন অবস্থা হয় যে, ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা থেকে বের হয়ে যাব, তবে সমাজবিমুখ ইবাদতকারী আর ইবাদতবিমুখ সমাজমুখিতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

দেখুন, মহান আল্লাহ্ সূরা ফাত্হের শেষ রুকুতে কি বলছেন (এমন নমুনা কোরআনে আরও রয়েছে),

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَ رُحَمَآءُ بَيْنَهُم

রাসূলুল্লাহ্র প্রশিক্ষিত সাহাবীরা কিরূপ? মুসলমানদের প্রকৃত শত্রু অর্থাৎ কাফেরদের মোকাবিলায় কঠিন, কঠোর, দৃঢ় ও মজবুত যেমন সীমা ঢালা প্রাচীর।

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ

–(সূরা ছফ : ৪)

কিন্তু এরা দু'রূপের অধিকারী– ইসলামের প্রকৃত শত্রুদের মোকাবিলায় তারা কঠোর ও মজবুত, কিন্তু নিজেদের মধ্যে স্নেহশীল, দয়ালু, ঐক্যবদ্ধ, ভালবাসায় সম্পর্কিত। কোরআনের ভাষায় এটা ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য (আমরা কয়েক শতাব্দী হলো সেটাকে ভুলতে বসেছি)। কোরআন সূরা ফাত্হের শেষ আয়াতে বলছে–

تَرَىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِى وُجُوْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ.

সাথে সাথেই খোদায়ী মূল্যবোধের কথা বলছে। ঐ ব্যক্তিটি যে সমাজমুখী সে ব্যক্তিটিই খোদার মোকাবিলায় নত, সেজদাবনত, নিজের মনের কথা ও বেদনা খোদার নিকট ব্যক্ত করে। তাঁর নিকট থেকে এর থেকে উত্তরণের জন্য সাহায্য চায় যেন নিজের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। যা তার আছে তাতে সে সন্তুষ্ট নয়, বরং প্রতি মুহূর্তে নিজের অবস্থার উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষী। তার সকল ইবাদতের লক্ষ্য স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্থাৎ ইবাদতের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় সে আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং তাদের চেহারায় ইবাদতের চিহ্ন লক্ষণীয়।

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرية وَ مَثَلُهُمْ فِى الإِنْجِيْل كزرعٍ اَخرج شطأه

অতঃপর ইসলামী সমাজকে বর্ণনা করছে এটা কেমন? বলছে, এটা এমন এক সমাজ যাকে তুলনা করা যায় একটি বৃক্ষের সঙ্গে; প্রাথমিক অবস্থায় তা দুর্বল ও ক্ষুদ্র থাকলেও পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেয়ে ফুলে-ফলে পূর্ণতা লাভ করে, কৃষকের চোখে আনন্দের জোয়ার আনে।

দেখুন, কোরআন অন্য একটি স্থানে এ দু'প্রবণতার (বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী) সহাবস্থানের কথা কিভাবে বলছে,

اَلتَّائِبُوْنَ العَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ

খোদায়ী দিকগুলো, যেমন পরিশুদ্ধতা অবলম্বনকারী, ইবাদতকারী, খোদার প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী, রুকুকারী, সেজদাকারী বলার সাথে সাথে আবার উল্লেখ করছে,

الامِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْف وَ الناهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر

তারাই সমাজের সংস্কারকারী, সমাজে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী।

অন্য আয়াতে বলছে,

اَلصَّابِرِيْنَ وَ الصَّادِقِيْنَ وَ الْقَانِتِيْنَ وَ الْمُنَفِقِيْنَ

ধৈর্যধারণকারীরা (দৃঢ়তা অবলম্বনকারী বিশেষ করে যুদ্ধের ময়দানে), সত্যবাদীরা, দানকারীরা, সত্যপন্থীরা। এর পরপরই বলছে, وَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالاسْحَار অর্থাৎ শেষ রাত্রিতে ক্ষমা প্রার্থনাকারীরা। অর্থাৎ ইসলামে এ বৈশিষ্ট্যগুলো একটি আরেকটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কেউ যদি এগুলোর যে কোন একটিকে ছোট করে দেখে তবে অন্যগুলোকেও ছোট করে দেখছে।

ইমাম মাহদী (আ.)-এর সঙ্গী-সাথীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে (যা শুধু একটি নয় অনেক হাদীসেই আমি দেখেছি) বলছে, رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ لُيُوْثُ بِالنَّهَارِ রাত্রিতে তারা দুনিয়াত্যাগী উপাসক অর্থাৎ রাত্রি যখন আসে তখন তাদেরকে দেখলে মনে হয় একদল খোদা উপাসক আবার যখন দিনে তাদেরকে দেখবে তখন তারা যেন একদল সিংহ।

ইসলামের ইতিহাসের নমুনা

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীরা কিরূপ অবস্থায় ছিলেন সে ব্যাপারে আল কাফীর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস (মাওলানা রূমী তা কবিতায় বর্ণনা করেছেন) যা শিয়া-সুন্নী হাদীস বর্ণনাকারীরা সবাই বর্ণনা করেছেন, খুবই শিক্ষণীয়।

একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফজরের নামাজের পর আসহাবে ছোফফার নিকট গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ প্রায়ই তাদের দেখতে যেতেন। সে দিন হঠাৎ এক যুবকের উপর রাসূলের চোখ আটকে গেল। তিনি দেখলেন এ যুবকের মধ্যে অন্য রকম অবস্থা বিরাজ করছে– পা দু'টি টলায়মান, চোখ দু'টি কোটরের মধ্যে ঢুকে গেছে। তার রংও স্বাভাবিক নেই।

তার কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, كَيْفَ أَصْبَحْتَ "কিরূপে রাত কাটিয়েছ?" সে জবাব দিল, أَصْبَحْتُ مُوْقِنًا يَا رَسُوْلَ اللّٰه "হে রাসূলল্লাহ্! এমনভাবে সকালে প্রবেশ করেছি যে, ইয়াকীনের অধিকারী হয়েছি। যা আপনি মুখে বলেছেন ও আমি কান দিয়ে শুনেছি তা এখন চোখ দিয়ে দেখতে

পাই।" রাসূল চাইলেন সে আরো কিছু বলুক। তিনি বললেন, "সব কিছুরই আলামত (চিহ্ন) থাকে। তোমার ইয়াকীনের আলামত কি?"

সে বলল, إِنَّ يَقِيْنِىيَا رَسُوْلَ اللَّه هَوَ الَّذِى أَحْزَنَنِى وَ أَسْهَرَ لَيْلِى وَ أَظْمَأَ هَوَا جَرِى "আমার ইয়াকীনের আলামত হলো দিনগুলো আমাকে তৃষ্ণার্ত করে রাখে আর রাতগুলো আমাকে জাগ্রত করে রাখে" (অর্থাৎ দিনে রোযা আর রাত্রিতে ইবাদত আমার ইয়াকীনের আলামত। আমার ইয়াকীন আমাকে রাত্রে বিছানায় শুতে দেয় না, আর দিনগুলোতে খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত রাখে।) রাসূল বললেন, "এটা যথেষ্ট নয়, আরো কোন আলামত আছে কি?" সে বলল, "হে রাসূলুল্লাহ্! যদিও এখন এ পৃথিবীতে আছি কিন্তু ঐ দুনিয়াকে (অর্থাৎ আখেরাত) দেখতে পাই, সেখানকার শব্দ শুনতে পাই। বেহেশত থেকে বেহেশতবাসীদের কণ্ঠ আর জাহান্নাম থেকে দোযখবাসীদের চীৎকার শুনতে পাই। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি অনুমতি দেন, তবে আপনার সাহাবীদের একে একে পরিচয় বলে দিই, কে বেহেশতী, আর কে জাহান্নামী।" রাসূল বললেন, 'নীরব হও। আর কোন কথা বল না।" মাওলানা রূমী বলছেন,

"বললেন রাসূল সাহাবী যায়েদকে কিভাবে রাত কাটিয়েছো বন্ধু হে!
ইয়াকীনের অধিকারী হয়ে বলল সে।
পুনঃ শুধায় চিহ্ন সে বাগানের দেখাও আমায়।
বলে তৃষ্ণার্ত আমি এই দিনগুলোতে হায়,
না ঘুমিয়ে কাটাই কষ্ট আর ভালবাসায়।
বললেন বল যা অর্জন করেছো তায়,
তা থেকে যেন বুঝতে পারে এরা সবাই।
বলল দু' সৃষ্টি যখন দেখে এ আকাশ,
আমি দেখি তার অধিবাসীদের যেথায় বাস।
বলব কি কিছু কথা রয়েছে খাছ
ঠোঁট কামড়ে বলেন রাসূল, হয়েছে ব্যাস।"

অতঃপর রাসূল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ইচ্ছা কি? কি করতে চাও?" সে বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র পথে শাহাদাত বরণ করতে চাই।"

তার ইবাদত আর ইচ্ছা হলো এ রকম, তার রাত্রি হলো ইবাদত, আর দিন জিহাদ আর শাহাদাতের জন্য। এটাই ইসলামের কথিত মুমিন, ইসলামের মানুষ। দু'টি ভিন্নমুখী কষ্ট, কিন্তু দ্বিতীয় কষ্টটি তার প্রথম কষ্ট থেকে উৎসারিত। আর সেটা হলো স্রষ্টাকে পাওয়ার বেদনা।

আমার বক্তব্যের শুরুতে যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি তা হলো :

وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَوة وَ انَّهَا لَكَبِيْرَة إِلا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ.

কোরআনের বর্ণনা সত্যিই আশ্চর্যজনক। বলছে, "হে ঈমানদারগণ! নামাজ ও ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য চাও।" তাফসীরকারগণ বলছেন, ধৈর্যের অর্থ রোযা, যেহেতু রোযা এক ধরনের সবর। তাই

নামায ও রোযা থেকে সাহায্য নাও। নামায থেকে কি ধরনের সাহায্য পাওযা যায়? আল্লাহ্‌র ইবাদত ও উপাসনার মাধ্যমে কি শক্তি পাওয়া যায়? উত্তর আল্লাহ্‌র ইবাদত নিজেই একটি শক্তি। প্রকৃত পক্ষে যে কোন প্রেরণাই এখান থেকে পাওযা যায়। যদি আপনি চান সমাজে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে থাকবেন, যদি চান একজন সংগ্রামী হতে, তবে অবশ্যই আপানাকে প্রকৃত নামাযী হতে হবে।

অনেকে বলেন, নামায পড়ার কি আছে? ইবাদতের প্রয়োজন কি? এগুলো বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কাজ। যুবকদের অবশ্যই সামাজিক হতে হবে। এগুলো এক ধরনের বুদ্ধিজীবীদের কথা যার নজীর ইতিহাসে পুরাতন। হয়তো জানেন, হযরত উমর حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَل (হাইয়া আলা খাইরিল আমাল) বাক্যটিকে আযান থেকে প্রত্যাহার করেন। কেন? তাঁর নিজের যুক্তিতে মনে হয়েছে এটা করা দরকার। যেহেতু তাঁর শাসনকাল ইসলামের বিজয় ও সংগ্রামের সময় এবং মুসলমানদের দলে দলে যুদ্ধে যোগদান করতে হচ্ছে, অল্প সৈনিক নিয়ে অধিক সংখ্যক সৈন্যের মোকাবিলায় জয়ী হতে হবে (কখনো সমগ্র যোদ্ধা মুসলমানের সংখ্যা পঞ্চাশ বা ষাট হাজার আর তা নিয়ে রোম বা পারস্য সাম্রাজ্যের লক্ষ সৈনিকের মোকাবিলায় দাঁড়াতে হয়েছে), তাই মুজাহিদদের নিকট যুদ্ধের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যখন মুয়াজ্জিন আযানের সময় চীৎকার করে 'আল্লাহু আকবার' ও দু'শাহাদাতের পর حَيَّ عَلَى الصَّلَوةِ (হাইয়া আলাস সালাহ্–নামাযের দিকে এসো) এবং حَيَّ عَلَى الفلاح (হাইয়া আলাল ফালাহ–কল্যাণের দিকে এসো) বলে, তার মধ্যে কোন সমস্যা নেই কিন্তু 'হাইয়া আলা খাইরিল আমাল' (সর্বশ্রেষ্ঠ আমলের দিকে এসো) যার অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হলো নামায, এটা বলা হবে তখন মুজাহিদদের মন দুর্বল হয়ে যাবে। কেননা তাদের নিজেদের কাছে মনে হবে নামায যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ আমল আমরা যুদ্ধের ময়দানে বা জিহাদে যাওয়ার চেয়ে মদীনার মসজিদে বসে নামায পড়ি, কি প্রয়োজন অন্যদের হত্যা করে, নিজেদের নিহত হতে দিয়ে, আহত হয়ে, কারো চোখ অন্ধ হবে, কারো হাত বা পা কাটা যাবে, অভুক্ত থাকার কষ্ট করতে হবে, বরং আমরা এখানে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের পাশে বসে চার রাকাত নামায পড়ে তাদের চেয়ে উত্তম হতে পারি। তাই আযান থেকে এ অংশটি বাদ দিতে হবে। তার চেয়ে বরং বলব اَلصَّلَوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম–নামায ঘুম থেকে উত্তম)। যখন ঘুমাব তখন মনে করতে হবে ঘুমানোর চেয়ে মসজিদে গিয়ে নামায পড়ি।

কিন্তু এ রহস্য আমাদের জানতে হবে কোন্ শক্তির বলে মুসলমানরা (যাদের সংখ্যা এক লক্ষেরও কম) তাদের থেকে কয়েকগুণ শক্তিশালী (সংখ্যায় কয়েক লক্ষ) প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়। এ জয় কিরূপে সম্ভব অনেকেই চিন্তা করে দেখেনি। এ জয় তো অস্ত্রের বলে নয়। যদি তাই হতো তবে আরবদের অস্ত্র কি রোমানদের বা পারসিকদের চেয়ে অধিক ধারালো ছিল? অবশ্যই নয়। বরং রোমান ও পারসিকরা সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ অস্ত্রের অধিকারী ছিল। অপর পক্ষে আরবদের অস্ত্র সে রকম ছিল না। জাতি হিসেবেও আরবরা কি রোম ও ইরানের মোকাবিলায় শক্তিশালী ছিল? অবশ্যই নয়। শাপুর জুল আকতাফ ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবদের পদদলিত করেছিল। শত-সহস্র আরবকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের কপালে কালিমা লেপন করে দিয়েছিল। তখন আরবদের শক্তি কোথায় ছিল? কিন্তু মাত্র একশ' বছর পর সেই আরবরাই ইরানকে পরাজিত করেছিল। তাহলে কোন্ শক্তির

বলে আরবরা ইরান ও রোমের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের মালা পড়েছিল আর তাদের মুখে পরাজয়ের চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল? এ শক্তি ঈমানের শক্তি ছিল। যে শক্তি সে حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَل থেকে লাভ করেছে। তার নামায থেকে সে এ শক্তি অর্জন করেছে স্রষ্টার কাছে একান্ত প্রার্থনার মাধ্যমে। কোরআনে বর্ণিত মানুষ রাত্রিতে তার স্রষ্টার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মনের গোপন আকাঙ্ক্ষা পেশ করে, তাঁর নিকট এ শক্তি চায়। সেই মহান প্রভু থেকেই সে এ আত্মিক শক্তি লাভ করেছে অর্থাৎ আরবরা যখন স্রষ্টার নিকট থেকে এ আত্মিক শক্তি অর্জন করেছে তখন এর বলেই সে ইরান ও রোমকে পরাজিত করেছে। এ আত্মিক শক্তি সে কিভাবে পেয়েছে? তার ঈমান থেকে পেয়েছে। নামায কি? নামায হলো ঈমানের ঝালাই। নামাযের 'আল্লাহু আকবার' থেকেই সে এ শক্তি অর্জন করেছে। যখন সে নামাযে কয়েকবার বলে, 'আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ', তখনই অনুভব করে বাকী সকল কিছুই তুচ্ছ। যখন যুদ্ধের ময়দানে কয়েক লক্ষ যোদ্ধাকে তাদের মোকাবিলায় দেখে তখন বলে, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম। সকল ক্ষমতা আল্লাহ্র হাতে। মানুষের অবশ্যই তাঁর উপর নির্ভর করা উচিত। তাঁর থেকে শক্তি ও সাহায্য চাওয়া উচিত। নামাযই তাকে এ শক্তি ও সাহস দান করেছে। যদি এ নামায না থাকতো তবে এ ধরনের মুজাহিদ (জিহাদকারী) যোদ্ধা তৈরি হতো না।

ইসলাম কি এটা বলে না যে, ইসলামের বিধি-বিধান একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যার উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে তার নামাযের জন্য মদীনার মসজিদে পড়ে থাকা হারাম। তাকে অবশ্যই জিহাদের জন্য যেতে হবে। তার নামায কবুল হওয়ার শর্ত হলো জিহাদ। আবার জিহাদ কবুল হওয়ার শর্তও নামায। কোন মুজাহিদের জন্য শর্তাবলী উপস্থিত হলে তার জন্য জিহাদ ফরয। কিন্তু তাকে বলতে হবে, ইসলাম বলে নামায ব্যতীত জিহাদ বাতিল ও মূল্যহীন, তেমনি জিহাদ ব্যতীত নামাযও বাতিল। তখন এটা 'খাইরুল আমাল' বা সর্বোত্তম ইবাদত না হয়ে 'শাররুল আমাল' বা নিকৃষ্ট ইবাদতে পরিণত হবে। নামায মুসলমানকে ইসলাম কি তা শেখায়। যে নামায মুসলমানকে জিহাদ থেকে পালানোর জন্য মসজিদে বসে থাকার কথা বলে সেটা ইসলামের নামায নয়। ইসলামের নামায সর্বোত্তম কর্ম (খাইরুল আমাল)। তাই এটা ঠিক নয় যে, حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَل-কে আযান থেকে এ যুক্তিতে বাদ দেয়া হবে যে, এর খারাপ প্রভাব রয়েছে, যেহেতু মুসলমানরা জিহাদ বাদ দিয়ে নামায পড়তে যাবে। এটা ভুল। এটাই ইসলামের যুক্তি। বর্তমানের পরিভাষায় যদি বলি, ইসলামী মূল্যবোধের দৃষ্টিতে সকল মূল্যবোধের মূল্য ইবাদতে নিহিত, তবে বলতে হবে সে ইবাদত হলো শর্তযুক্ত ইবাদত। কোরআন আমাদের বলছে নামায তখনই নামায হবে যখন তার প্রভাব স্বতঃপ্রকাশিত। কিরূপে তা প্রকাশিত হবে? নিশ্চয়ই নামায মন্দ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। প্রকৃত নামায এটাই যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। যদি দেখ নামায পড়ছ সে সাথে অন্যায় কাজও করছ, তবে জেনে রাখ, তোমার নামায নামায নয়। সুতরাং তোমার নামাযকে ঠিক কর। নামায তোমাকে সকল মূল্যবোধ দান করবে এ শর্তে যে, তোমার নামায প্রকৃতই নামায হয়।

এ সকল শিক্ষা হযরত আলী (আ.)-এর নিকট থেকে শিক্ষণীয়। আলী (আ.) ইসলামের সকল মূল্যবোধের সমষ্টি। নাহজুল বালাগাহ্ তাঁর বাণী। যা এমন এক গ্রন্থ মানুষ এর যেখানেই লক্ষ্য করে যেন নতুন এক যুক্তি খুঁজে পায়, খুঁজে পায় নতুন এক মানুষকে– এর প্রতিটি অধ্যায়ে যেন নতুন নতুন

মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রতিটি স্থানেই আলী (আ.) সামগ্রিক মূল্যবোধের প্রতিভূ এক ব্যক্তিত্ব। কোথাও তাঁর যুক্তি বীরোচিত যেন এক নবযুবক যে সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করে সমর নেতা হয়েছে; যে সমরবিদ্যা ছাড়া কিছুই বোঝে না। কোথাও সে আলীকেই মনে হবে এক আরেফ ও সূফী যে স্রষ্টার সঙ্গে গভীর প্রেমে লিপ্ত, অন্য কিছুর প্রতি তাঁর খেয়াল নেই।

আলী (আ.)-এর পৌরুষত্ব ও সাহসিকতা

আজ একুশে রমযানের রাত হযরত আলী (আ)-এর শাহাদাতের রজনী। যাতে ইসলামের বৈশিষ্ট্যের সাথে পুরোপুরি পরিচিত হতে পারি এজন্য নাহজুল বালাগায় দ্বৈত বৈশিষ্ট্যের আলীর পরিচয় রয়েছে এমন দু'টি অংশ থেকে আলাচনা রাখছি। সিফফিনের যুদ্ধে আলী (আ.)-এর সৈন্যরা ফোরাত কিনারায় পৌঁছার পূর্বেই মুয়াবিয়ার সৈন্যবাহিনী সেখানে পৌঁছায়। মুয়াবিয়া নির্দেশ দেয় পানির পথগুলো আলী ও তাঁর সৈন্যদের জন্য বন্ধ করে রাখতে। আলীর সৈন্যদের পরাস্ত করার খুব ভালো এক কৌশল হস্তগত করেছে এটা ভেবে মুয়াবিয়ার সৈন্যবাহিনী মনে মনে খুব আনন্দিত হলো। হযরত আলী যখন সেখানে পৌঁছে এ অবস্থা দেখলেন তখন বললেন, পরস্পর আলোচনা করে বিষয়টি ফয়সালা করবেন যাতে করে এ বিষয়টি নিয়ে দু'পক্ষের মুসলমানদের মধ্যে রক্তক্ষয় না হয়। তাই মুয়াবিয়াকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমরা এখনও এসে পৌঁছাইনি, তুমি এ ধরনের কাজ করলে!" (পানি পথ ছেড়ে দাও যাতে এ পক্ষও পানি পায়)। মুয়াবিয়া পরামর্শ সভা ডেকে নিজের সেনাপ্রধানদের কাছে পরামর্শ চাইল। কেউ বলল পানির পথ ছেড়ে দেয়াই উত্তম, কেউ বলল, না। আমর ইবনে আস বলল, "ছেড়ে দাও। কারণ যদি তুমি না ছাড় তবে বল প্রয়োগে তোমার নিকট থেকে সে নিয়ে নেবে। তখন তোমার সম্মান ভূলুণ্ঠিত হবে।" কিন্তু মুয়াবিয়া সিদ্ধান্ত নিল পানি পথ ছাড়া হবে না। তখন হযরত আলী (আ.) তাঁর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে এক বিপ্লবী ভাষণ দিলেন যার প্রভাব শত রণতুর্য আর দামামা থেকেও অনেক বেশি। তিনি বললেন, "তারা যুদ্ধ চায়, এখন তোমরা ভেবে দেখ অপমান ও অমর্যাদাকে গ্রহণ করে সাহস ও সম্মান হারাবে, নাকি তোমাদের তরবারীকে তাদের রক্তে পূর্ণ করে নিজেরা পানির তৃষ্ণা মেটাবে।" (নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ৫১)

মুয়াবিয়া তোমাদের জন্য পানি বন্ধ করেছে। আমার সহযোগীরা! তোমরা তৃষ্ণার্ত। পানি চাও। আমার কাছে এসেছ, পানি চাও। যদি পানি চাও তবে কি করা উচিত? তোমাদের তরবারীগুলোকে প্রথমে এই শত্রুদের দূষিত রক্ত দ্বারা পূর্ণ কর। তারপর নিজেরা তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারবে। এর পর এমন এক বাক্য উচ্চারণ করলেন যা সবার মধ্যে উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। জীবন ও মৃত্যুকে যুদ্ধ ও বিপ্লবের ভাষায় সংজ্ঞায়িত করলেন। হে জনগণ! জীবন কি? বেঁচে থাকার অর্থ কি? মৃত্যু কি? বেঁচে থাকার অর্থ কি পৃথিবীর উপর বিচরণ, খাদ্য গ্রহণ আর বিশ্রাম? মৃত্যুর অর্থ কি কবরে শয়ন? না, ঐ জীবনকেও জীবন বলা যায় না, ঐ মৃত্যুকেও মৃত্যু বলা যায় না।

فَالْمَوْتُ فِى حَيَاتِكُمْ مَقْهُوْرِيْنَ وَ الْحَيَاتُ فِى مَوْتِكُمْ قَاهِرُوْنَ

"জীবন হচ্ছে মৃত্যুবরণের মাধ্যমে জয়ী হওয়া। আর মৃত্যু হলো বেঁচে থাকা, কিন্তু অপরের অধীনে থাকা।"

এ বাক্যটি কতটা বিপ্লবী ও উঁচু পর্যায়ের! এরপর কি শক্তির মাধ্যমে আলী (আ.)-এর সৈনিকদের প্রতিরোধ করা সম্ভব? কিছুক্ষণের মধ্যেই আলীর সেনাবাহিনী হামলার মাধ্যমে মুয়াবিয়ার সেনাবাহিনীকে নদীকূল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে বিতাড়িত করল। আলীর সহযোগীরা নদীকূলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করল। এবার মুয়াবিয়ার সেনাবাহিনী পানির জন্য আবেদন করল। আলীর সৈন্যরা বলল, "অসম্ভব। আমরা পানি দিতে রাজী নই। আমরা প্রথমে এ ধরনের কাজ করিনি, বরং তোমরাই এ পথ বেছে নিয়েছিলে।" হযরত আলী এ কথা শুনে বললেন, "না, আমি পানি বন্ধ করতে রাজী নই। কারণ এ কাজ কাপুরুষোচিত। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সাথে মোকাবিলা ভিন্ন কথা। কিন্তু এ পথে জয়লাভ করা কোন সম্মানিত মুসলমানের জন্য ঠিক নয়।" এটাকেই বলে পৌরুষত্ব। পৌরুষত্ব সাহসিকতার থেকেও উচ্চ পর্যায়ের। হযরত আলীকে উদ্দেশ্য করে মাওলানা রুমী কত সুন্দর বলেছেন (হযরত আলীর শানে ও প্রশংসায় রচিত তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা)!

"সাহসিকতায় তুমি শেরে খোদা জানি
পৌরুষত্বে কি তুমি, জানেন শুধু অন্তর্যামী।"

অর্থাৎ সাহসিকতায় তিনি শেরে খোদা সকলে জানলেও পৌরুষত্বে কেউই আলীকে চিনতে পারেনি। এখানে আমরা হযরত আলীকে তাঁর এক বিশেষ রূপে দেখতে পাই।

হযরত আলী (আ.)-এর মোনাজাত

যখন আলী (আ.) মানুষ থেকে দূরে– একান্তে স্রষ্টার সাথে ইবাদত ও গোপন সংলাপে লিপ্ত তখন দেখি অন্য এক আলী। যেমন নাহজুল বালাগায় পাই

اَللَّهُمَّ انَّكَ آنِس الآنِسِيْنَ لاوْلِيَائِك

"হে আল্লাহ্! আপনি আপনার আউলিয়াদের নিকটতম বন্ধুর থেকেও নিকটে অবস্থান করছেন।" অর্থাৎ কোন বন্ধুর সঙ্গেই আপনার মতো নৈকট্য অনুভব করি না। আপনি আমার নিকটতম সাথী। আপনি ব্যতীত যার সঙ্গেই থাকি যেন একাকিত্ব অনুভব করি। শুধু যখন আপনার সঙ্গে থাকি তখনই অনুভব করি নিকটতম কারো সঙ্গে আছি।

وَ احْضَرُهُمْ بِالْكفَايَةِ لِلْمُتَوَكِّلِيْنَ عَلَيْك

যে কেউ আপনার প্রতি নির্ভর করে, অনুভব করে অন্য সকল কিছুর থেকে আপনি তার নিকটতর উপস্থিত অস্তিত্ব যেন আপনি আপনার উপর নির্ভরকারী ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হন।

تشَاهِدُهُمْ فِى سرَائِرهم وَ تَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ فِى ضَمَائِرِهِمْ وَ تَعْلَمُ مَبْلَغَ بَصَائِرِهِمْ

হে প্রভু! আপনি আপনার বন্ধু ও প্রেমিকদের হৃদয়ের অন্তস্তলের রহস্যও পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাদের অন্তঃকরণের অপ্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কেও অবহিত। তাদের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি কোন্ পর্যায়ে অবস্থান করছে তাও আপনার জানা।

فَاَسْرَارُهُمْ لَكَ مَكْشُوْفَه وَ قُلُوْبُهُمْ إِلَيْكَ مَلْهُوْفَة

তাদের রহস্য আপনার নিকট প্রকাশিত ও তাদের অন্তর আপনার প্রতি উড্ডয়নশীল।

আলী (আ.)-এর দোয়াগুলোর মধ্যে দোয়ায়ে কুমাইল জুমআর রাতগুলোতে পড়বেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ দোয়াটি পড়ুন। দেখবেন, না এর মধ্যে দুনিয়া আছে, না আখেরাত (আখেরাত বলতে বেহেশত ও দোযখ)। যা দেখবেন তা দুনিয়া ও আখেরাতের ঊর্ধ্বে। স্রষ্টার সাথে একজন খাঁটি বান্দা, উপাসক ও প্রেমিকের সম্পর্ক এটাই যে, তাঁর প্রেমে নিমগ্ন থাকবে। প্রকৃত ইবাদত এটাই। আলী নিজেই তা বলছেন। দোয়ায়ে কুমাইলে আলী (আ.) নিজের স্রষ্টার সাথে কিরূপে কথোপকথন করছেন লক্ষ্য করুন, কিভাবে মোনাজাত করছেন দেখুন, তেমনিভাবে ইমাম যয়নুল আবেদীন (আ.) রমযান মাসের সুবহে সাদিকের পূর্বে সেহ্‌রীর সময় কিভাবে আল্লাহ্‌র নিকট আবেদন-নিবেদন করছেন তা আবু হামযা সোমালীর দোয়ায় লক্ষ্য করুন। মুসলমানের প্রথম ধাপ এটাই যে, সে তার স্রষ্টার নিকটবর্তী হবে। স্রষ্টার নৈকট্যের মাধ্যমেই অন্যান্য দায়িত্ব, বিশেষ করে সামাজিক দায়িত্বসমূহ সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে পারব।

আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে আমাদের প্রবণতাগুলো এককেন্দ্রিক না হয়ে পড়ে– যে সমস্যায় বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ্ আক্রান্ত। আমাদের এ এককেন্দ্রিকতা পরিহার করে সামগ্রিকতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। ইবাদতের গুরুত্বকে কম করে দেখলে চলবে না। ইমাম সাদিক (আ.) তাঁর মৃত্যুলগ্নে তাঁর সকল নিকটাত্মীয়কে ডেকে সমবেত করে একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করে বিদায় নেন। তিনি বলেন, لَنْ تَنَالَ شَفَاعَتُنَا مُسْتَخِفًّا بِالصَّلٰوة "যারা নামাযকে ছোট করে দেখে (কম গুরুত্ব দেয়), আমার শাফায়াত তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।"

জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোতে ইমাম আলী (আ.)

আলী (আ.)-এর জীবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও আশ্চর্যজনক সময় তাঁর জীবনের শেষ দু'দিন। তাঁর জীবনের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে– তাঁর জন্ম থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত, রাসূলুল্লাহ্‌র নবুওয়াত থেকে হিজরত পর্যন্ত, হিজরত থেকে রাসূলের ইন্তেকাল পর্যন্ত, রাসূলুল্লাহ্‌র ইন্তেকাল থেকে নিজের খেলাফত প্রাপ্তির পূর্বের ২৫ বছর এবং খেলাফত প্রাপ্তির পর সাড়ে চার বছর। এর বাইরেও তাঁর জীবনের আরেকটি পর্যায় রয়েছে যা তিন দিনেরও কম সময়ের, কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর মুহূর্তগুলো এখানে দেখা যায়। সেটা হলো আলী (আ.) যখন তরবারীর আঘাতে শয্যাশায়ী হলেন তখন থেকে ওফাত পর্যন্ত। তিনি যে এক পূর্ণ মানুষ তা এখানেই প্রকাশিত হয়। তিনি যখন মৃত্যুর মুখোমুখি তখন মৃত্যুর প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়া কি? যখন তরবারী তাঁর কপালে আঘাত হানলো তখন তিনি দু'টি বাক্য বলেছেন। একটি 'এ ব্যক্তিকে ধর', অপরটি فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَة 'কাবার প্রভুর শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি– শাহাদাত আমার জন্য সফলতা'।

আলী (আ.)-কে এনে বিছানায় শোয়ানো হলো। চিকিৎসক আসির ইবনে আমর যিনি কুফায় আঘাত বিষয়ক খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি আমীরুল মুমিনীনের চিকিৎসার জন্য আসলেন।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বুঝতে পারলেন, তরবারীতে বিষ মিশ্রিত ছিল এবং বিষ তাঁর রক্তে প্রবেশ করেছে। তাই চিকিৎসায় লাভ হবে না এটা নিশ্চিত হয়ে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। সাধারণত যে রোগীর আরোগ্যের সম্ভাবনা নেই তাকে এ কথা বলা হয় না। কিন্তু আসির জানতেন, আলী (আ.) অন্য দশজনের মতো নন। তাই তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমীরুল মুমিনীন, যদি কোন অসিয়ত থেকে থাকে তাহলে তা ঘোষণা করুন।"

হযরত উম্মে কুলসুম (আলীর কন্যা) এ কথা শুনে ইবনে মুলজিমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমার পিতা তোর কি ক্ষতি করেছিল যে, তাঁর প্রতি এ আচরণ করেছিস? আল্লাহ্ চাইলে আমার পিতা যদি সুস্থ হয়ে উঠেন, তোর চেহারা কলঙ্কিত করে দেবেন।" যখন উম্মে কুলসুম এ কথা বললেন তখন ইবনে মুলজিম (আল্লাহ্র রহমত থেকে তাকে বঞ্চিত করুন) জবাব দিল, "আমি তরবারীটা এক হাজার দিরহাম দিয়ে কিনেছি, আর এক হাজার দিরহামের বিষ ওটাতে মাখিয়েছি। যে পরিমাণ বিষ ওটাতে মাখিয়েছি যদি কুফার সকল মানুষের মাথায় আঘাত করি তাহলে তারা মৃত্যুবরণ করবে। তাই তোর বাবার বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনা নেই তা জেনে রাখ।"

আলী (আ.)-এর অলৌকিকত্ব এখানেই প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর অসিয়তে বলেন, বন্দির প্রতি সঠিক আচরণ কর।

يَا بَنِى عَبْدُ الْمُطَّلِب لا الفِيَنَّكُمْ تَخُوْضُوْنَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ خَوْضًا, تَقُوْلُوْنَ قُتِلَ امِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَ لا لا تَقْتُلُنَّ بْنَ الا قَاتلى

"আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানেরা তোমরা এমন যেন না কর, যখন আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নেব তখন মানুষের উপর হামলা কর এ অজুহাতে যে, আমীরুল মুমিনীনকে শহীদ করা হয়েছে। অমুকের এটার পেছনে হাত ছিল, অমুক এ কাজে উৎসাহিত করেছে। এ সকল কথা বলে বেড়াবে না, বরং আমার হত্যাকারী এ ব্যক্তি।" ইমাম হাসান (আ.)-কে বললেন, "বাবা হাসান! আমার মৃত্যুর পর এ বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার। যদি চাও আমার হত্যাকারীকে মুক্তি দেবে তাহলে মুক্তি দিও, যদি চাও কেসাস গ্রহণ করবে তাহলে লক্ষ্য রাখবে, সে তোমার পিতাকে একটি আঘাত করেছে, তাকেও একটি আঘাত করবে। যদি তাতে মৃত্যুবরণ করে তো করল, নতুবা ছেড়ে দেবে।" (নাহজুল বালাগাহ্, পত্র নং ৪৭)

তারপর আবার বন্দির চিন্তায় মগ্ন। বন্দিকে ঠিক মতো খেতে দিয়েছ তো? পানি দিয়েছ খেতে? ঠিক মতো দেখাশোনা কর ওর। কিছু দুধ তাঁর জন্য আনা হলে কিছুটা খেয়ে বললেন, বাকীটা বন্দিকে দাও। এটাই আলী (আ.)-এর আচরণ তাঁর শত্রুর সাথে। এ জন্যই মাওলানা রুমী বলেছেন,

"সাহসিকতায় তুমি শেরে খোদা জানি
পৌরুষত্বে কি তিনি, জানেন শুধুই অন্তর্যামী।"

এখানেই আলীর পৌরুষত্ব ও মানসিকতার সর্বোচ্চ স্তরের প্রকাশ ঘটেছে। আলী মৃত্যুশয্যায় শায়িত, প্রতি মুহূর্তে তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটছে, বিষ তাঁর পবিত্র শরীরে প্রতিক্রিয়া করছে। তাঁর

সঙ্গীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, সবাই ক্রন্দনরত, চারিদিকে ক্রন্দনের শব্দ, কিন্তু আলী (আ.)-এর মুখ হাস্যোজ্জ্বল। তিনি বলছেন,

وَ اللّٰهِ ما فَجَأَنِى مِن الْمَوْتِ وَارِدٌ كَرِهْتُه وَ لا طَالِعٌ انْكَرْتُه وَ مَا كُنْتُ إِلا كَقَارِبٍ وَرَدَ, وَ طَالِبٍ وَجَد

"আল্লাহ্‌র শপথ! যা আমার নিকট এসেছে (মৃত্যু) এমন কিছু নয় যে, আমি তা অপছন্দ করি। আল্লাহ্‌র পথে শাহাদাত সব সময়ই আমার নিকট সর্বাধিক ঈর্ষান্বিত বস্তু ছিল, আমার জন্য শাহাদাত এমন বস্তু যেন কোন ব্যক্তি যার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিল তা পেয়েছে। আমার জন্য এর চেয়ে উত্তম কি হতে পারে যে, ইবাদতরত অবস্থায় শহীদ হব?" (নাহজুল বালাগাহ্, পত্র নং ২৩)

وَ مَا كُنْتُ إِلا كَقَارِبٍ وَرَدَ, وَ طَالِبٍ وَجَد

অতঃপর এমন এক উদাহরণ এনেছেন যে উদাহরণের সঙ্গে আরবরা খুবই পরিচিত। আরবরা বেদুইনদের মতো যাযাবর জীবন যাপন করত। যতদিন কোন স্থানে পানি ও তাদের মেষ, উট ইত্যাদির জন্য ঘাস ও লতা জাতীয় উদ্ভিদ পেত ততদিন সেখানে থাকত; তারপর অন্য স্থানে পানি ও ঘাস পেলে সেখানে চলে যেত। যেহেতু মরুভূমিতে প্রচণ্ড গরম সেহেতু রাত্রিতে পানির সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। قَارِب পানির অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিকে বলা হয়। আলী তাঁর সহযোগীদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, "আমার সঙ্গীরা! গভীর রাতে পানির অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি আকস্মিকভাবে পানির সন্ধান পেয়ে যেমন উল্লসিত হয় আমিও তেমন শাহাদাতের সুযোগ পেয়ে আনন্দিত। আমার উদাহরণ সেই প্রেমিকের মত যে তার ভালবাসার বস্তুটি লাভ করেছে।"

"রাত্রির শেষলগ্ন আমায় দিল দুঃখ থেকে মুক্তি
অর্ধরাত্রিতে যেন পেলাম আবে হায়াতের পরিতৃপ্তি।
কি পবিত্র এ রাত, আনন্দে আমার মন ভরে গিয়েছিল
শবে কদরে আমার ভাগ্যে যা লেখা হয়েছিল।"

এ কবিতার প্রথম দু'লাইন فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَة-এর অর্থ । আলী (আ.)-এর সবচেয়ে উষ্ণ উক্তিগুলো যেন তাঁর জীবনের শেষ দু'দিনে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি ১৯ রমযানের ফজরের ওয়াক্তের কিছু পরেই আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং ২১ তারিখের রাত্রির দ্বিপ্রহরে স্রষ্টার নিকট তাঁর পবিত্র আত্মার প্রত্যাবর্তন ঘটে।

শেষ মুহূর্তগুলোতে সবাই তাঁর চারপাশে সমবেত হয়েছে। বিষের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বারবার বেহুশ হয়ে পড়ছেন। কিন্তু যখনই জ্ঞান ফিরে পাচ্ছেন তখনই তাঁর কণ্ঠে হেকমতপূর্ণ উপদেশ ও নসিহত উচ্চারিত হচ্ছে। তাঁর শেষ উপদেশ যা অত্যন্ত উষ্ণতাপূর্ণ ও গুরুত্ববহুল তা তিনি বিশটি বাক্যে বর্ণনা করেছেন। প্রথমে ইমাম হাসান (আ.), এরপর ইমাম হুসাইন (আ.), তারপর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের লক্ষ্য করে বলেছেন। ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন (আ.), আলী (আ.)-এর অন্যান্য সন্তানসহ আমরা সকলেই, এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে আলী তাদের উদ্দেশ্যে এ বক্তব্য দিয়েছেন। এ বাক্যগুলোতে ইসলামকে যেন পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন– সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

اَللَّه اَللَّه فِى الايتَام, اَللَّه اَللَّه فِى الْقُرْآن, اَللَّه اَللَّه فِى جيرانكُمْ, اَللَّه اَللَّه فِى بَيْتِ رَبِّكُمْ, اَللَّه اَللَّه فِى الصَّلَوةِ, اَللَّه اَللَّه فِى الزَّكَوةِ

(বিহারুল আনওয়ার, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৭৪৬ ও নাহজুল বালাগাহ্, পত্র নং ৪৭)

তিনি একে একে সব বর্ণনা করছেন। "আল্লাহ্, আল্লাহ্, ইয়াতীমদের ব্যাপারে সতর্ক থেক; আল্লাহ্, আল্লাহ্, কোরআনকে আঁকড়ে ধর; আল্লাহ্, আল্লাহ্, প্রতিবেশীদের ব্যাপারে দায়িত্বের কথা মনে রেখ; নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত...।" সবাই আলী (আ.)-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন আলীর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। সবাই কান পেতে আছে তিনি আর কি বলেন। সবাই দেখছেন আলী (আ.) উচ্চৈঃস্বরে পড়ছেন, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ্।"

وَ لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم

৫

বিভিন্ন মতাদর্শের দৃষ্টিতে পূর্ণ মানব

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلالٍ مُبِيْنٍ.

যে কোন মতাদর্শের প্রবক্তা যখনই কোন মতাদর্শ উপস্থাপন করেছেন একই সঙ্গে তাঁর নিজের দৃষ্টিতে পূর্ণ মানবের অথবা মানুষের পূর্ণত্বের বিষয়টিও উপস্থাপন করেছেন। ঐ বিষয়কে 'আখলাক' বলা হয়। তাঁদের মতে 'আখলাখ' বা নৈতিকতা জ্ঞান নয়; বরং শিল্প বা কৌশল। অর্থাৎ আখলাক কিরূপ হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করে। বাস্তবে মানুষ কিরূপ অবস্থায় বিরাজ করছে তা আখলাকের বিষয়বস্তু নয়। সামগ্রিক যে বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের মধ্যে থাকা উচিত বা যে বৈশিষ্ট্যগুলো লাভ করলে সে সর্বোত্তম মানুষে পরিণত হবে ও বলা যাবে যে, সে মানবিকতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে সেটাই পূর্ণ মানবের প্রতিকৃতি।

বৃদ্ধিবৃত্তিক (আকলগত) মতাদর্শ

বিভিন্ন মতাদর্শের প্রবক্তাদের দৃষ্টিতে পূর্ণ মানব বা ইনসানে কামেল সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিকে কয়েকটি মৌলিক ভাগে ভাগ করা যায়। তার একটি বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলভিত্তিক মতাদর্শ। যাঁরা খুব বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে দেখেন তাঁরা এ দলের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা মানুষের মূল উপাদান 'আকল' ব্যতীত অন্য কিছু নয় বলে মনে করেন। বুদ্ধিবৃত্তি অর্থ চিন্তাশক্তি বা চিন্তা করার ক্ষমতা। অতীতের দার্শনিকদের মধ্যে অনেকেই, যেমন বু আলী সিনা এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। তাঁরা চিন্তা করতেন, প্রজ্ঞাবান মানুষই পূর্ণ মানুষ এবং মানুষের পূর্ণতা তার প্রজ্ঞার মধ্যে নিহিত।

প্রজ্ঞা বলতে তাঁরা কি বুঝাতেন? প্রজ্ঞা বলতে কি তাঁরা যাকে আমরা বর্তমানে বিজ্ঞান বলি তা বুঝতেন? না, বরং তাঁরা প্রজ্ঞা বলতে (ব্যবহারিক নয় তত্ত্বগত প্রজ্ঞা) অস্তিত্ব জগৎ থেকে সামগ্রিক যে রূপটি আমরা বুঝি তা-ই বুঝতেন। এটা বিজ্ঞান নয়, যেহেতু বিজ্ঞান অস্তিত্বের একটি অংশের প্রতিচ্ছবি মাত্র। যাতে করে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার হয় এজন্য একটি উদাহরণ পেশ করছি।

ধরুন, আপনি তেহরান শহর সম্পর্কে ধারণা পেতে চান। দু'ভাবে আপনি এ ধারণা পেতে পারেন। প্রথমত আপনি তেহরান সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভ করতে পারেন, কিন্তু অস্পষ্ট। দ্বিতীয়ত আপনার ধারণা আংশিক, তবে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট। কখনো তেহরান সম্পর্কে আপনার ধারণা পৌরসভার একজন প্রকৌশলীর মতো। তাঁকে বলেন তেহরান শহরের একটা মানচিত্র আঁকুন। তিনি আপনার জন্য হয়তো একটি মানচিত্র আঁকবেন যার মধ্যে শহরের মহল্লা, পথগুলো, চৌরাস্তা, পার্ক ইত্যাদি মোটামুটি অধিকভাবে কাগজের উপর এঁকে দেখাবেন। যেমন এখানে

নিয়াভারন, ওখানে তাজরিস, ওপাশে শাহ আবদুল আজিম ইত্যাদি অর্থাৎ তেহরান সম্পর্কে একটা সাধারণ ও সার্বিক ধারণা আপনাকে দেবেন, কিন্তু এ ধারণা স্পষ্ট নয়। যদিও তিনি সম্পূর্ণ তেহরানের বিষয়ে আপনাকে তথ্য দিয়েছেন এবং সমগ্র তেহরানের মানচিত্র আপনার জন্য এঁকেছেন, কিন্তু তাতে আপনি আপনার বাড়ীটি যা এ শহরে রয়েছে তা খুঁজে পাবেন না। ঐ প্রকৌশলীও তা বলতে পারবেন না।

কিন্তু কোন এক ব্যক্তি হয়তো জানেন না তেহরানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত, কতটি চৌরাস্তা ও রাজপথ রয়েছে; তেহরানের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো কোথায়, এ শহরে কতটি পাহাড় রয়েছে, কিন্তু এ শহরের কোন এক বিশেষ এলাকা বা মহল্লার বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঐ এলাকার বর্ণনা সে আপনাকে দান করবে। যেমন এ মহল্লায় কতটি গলি রয়েছে, গলিগুলোর মধ্যে কোন সংযোগ আছে কিনা, প্রতি গলিতে কতটি বাড়ী রয়েছে, এমনকি দালানগুলোর কোন্‌টি হলুদ, কোন্‌টি সাদা, কোন্‌টি লাল রংয়ের সবই সে জানে।

যদি ঐ প্রকৌশলী যিনি এ শহর সম্পর্কে সার্বিক ধারণা রাখেন তাঁকে এ মহল্লার গলিগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন করেন তাহলে দেখবেন তিনি হয়তো এর কিছুই জানেন না। এ শহরের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কেও তাঁর জানা নেই।

দার্শনিক তাকেই বলা হয় যিনি অস্তিত্ব জগতের ব্যাপারে সার্বিকভাবে গবেষণা ও পড়াশোনা করেন। তিনি অস্তিত্বের মূলকে জানতে চান, এর সমাপ্তি কোথায় তা জানতে চান– জানতে চান এ অস্তিত্ব জগতের উপর ক্রিয়াশীল সার্বিক কানুনগুলো কি। কিন্তু এই দার্শনিককে যদি আপনি বিশেষ কোন বৃক্ষ, প্রাণী বা খনিজ অথবা পৃথিবী ও সূর্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রশ্ন করেন হয়তো দেখবেন তিনি কোন তথ্যই জানেন না।

দার্শনিকের নিকট প্রজ্ঞার অর্থ অস্তিত্ব জগৎ সম্পর্কে সার্বিক ধারণা। বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে যে সার্বিক ধারণা একজন বিজ্ঞের মানসপটে প্রতিফলিত হয় অথবা সমগ্র অস্তিত্ব জগৎ যে অস্পষ্টরূপে কোন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিতে ধরা দেয় সেটাই দার্শনিকের জ্ঞান। একজন দার্শনিকের দৃষ্টিতে মানুষের পূর্ণতা এটাই যে, সে সমগ্র অস্তিত্ব জগতকে তার বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিফলিত করবে। তার এ জ্ঞান আংশিক নয় যে, অস্তিত্ব জগতের এক অংশ সম্পর্কে সে জ্ঞাত অন্য অংশ সম্পর্কে নয়। এ বিষয়টিকে তাঁরা এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন,

صَيْرُوْرة الإِنْسَان عَالِمًا عَقليًا مضاهيًا لِلْعالِمِ العَيْنِيِّ

বাস্তব পৃথিবীর অনুরূপ বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বের মানুষ হওয়া অর্থাৎ মানুষ বহির্বিশ্বের বিপরীতে নিজে এক বিশ্ব হবে। তবে ঐ বহির্বিশ্ব হলো বাস্তব বিশ্ব, আর মানুষের ভেতরের বিশ্ব হলো বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্ব।

"যে কেউ জ্ঞান করেছে আহরণ
এক বিশ্ব তারই অনুরূপ করেছে ধারণ।"
কবিতার এ ছত্র এটাই বলতে চায়।

দর্শনের ধারণায় পূর্ণ মানব তিনিই যাঁর বুদ্ধিবৃত্তি পূর্ণতায় পৌঁছেছে এ অর্থে যে, অস্তিত্ব জগতের আকৃতি ও প্রকৃতি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিতে পূর্ণরূপে ধরা দিয়েছে। কিন্তু কিসের মাধ্যমে? চিন্তার মাধ্যমে, দলিল-প্রমাণ ও যুক্তির মাধ্যমে সে এখানে পৌঁছেছে।

কিন্তু দর্শন এখানেই পরিতৃপ্ত নয়। তাঁরা বলেন প্রজ্ঞা দু'ধরনের : এক, তত্ত্বগত প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিশ্বজগতের পরিচয় লাভ যেভাবে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি; দুই, ব্যবহারিক প্রজ্ঞা। ব্যবহারিক প্রজ্ঞা কি? ব্যবহারিক প্রজ্ঞা (ব্যবহারিক প্রজ্ঞাও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে সম্পর্কিত) হলো মানুষের সকল প্রবৃত্তি, শক্তি ও ক্ষমতার উপর বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ। (আমাদের নৈতিকতা সম্পর্কিত গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করলে দেখবেন, নৈতিকতার আলোচনাগুলো 'সক্রেটিয় নৈতিকতা'। সক্রেটিয় নৈতিকতায় সব সময়ই বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করা হয়েছে। যেমন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তার প্রবৃত্তির উপর প্রাবল্য লাভ করেছে নাকি প্রবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তির উপর?) যদি আপনি তাত্ত্বিক প্রজ্ঞায় চিন্তা ও যুক্তির মাধ্যমে যেমনভাবে বলা হয়েছে ঠিক তেমনভাবে বিশ্বকে আপনার চিন্তার জগতে প্রতিফলিত করতে পারেন সে সাথে ব্যবহারিক প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধিবৃত্তিকে নাফ্‌স বা প্রবৃত্তির উপর বিজয় দান করতে পারেন এমনভাবে যে, আপনার প্রবৃত্তি ও কামনা বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে তখন আপনাকে পূর্ণ মানব বা ইনসানে কামেল বলা যাবে। এই মতবাদকে আকলের মতবাদ বা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞার মতবাদ বলা হয়। পরবর্তী বৈঠকগুলোতে এ মতবাদগুলো সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করব। প্রথমে মতবাদগুলোকে ব্যাখ্যা করব। অতঃপর ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা রাখব।

প্রেম বা ভালবাসার মতাদর্শ

পূর্ণ মানব সম্পর্কিত অন্যতম মতবাদ হলো প্রেম বা ভালবাসার মতবাদ। প্রেমের মতবাদ যাকে এরফানও বলা হয়। এ মতবাদ মানুষের পূর্ণতাকে প্রেম বলে জানে। প্রেম বলতে এখানে স্রষ্টা বা আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ভালবাসা বোঝানো হয়েছে। মানুষকে জানতে হবে প্রেম কিভাবে তাকে সেই মহাসত্যের নিকট পৌঁছে দেয়। বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ গতির মতবাদ নয়, বরং চিন্তাগত মতবাদ (প্রজ্ঞাবান দার্শনিক গতির কথা বলেন না, বরং তাঁর ধারণায় সকল গতিই চিন্তাগত)। এর বিপরীতে প্রেমের মতবাদ গতির মতবাদ। কিন্তু এ গতি সমান্তরাল নয়, বরং লম্বিক ও আরোহ গতি। প্রাথমিকভাবে মানুষ যখন পূর্ণতায় পৌঁছতে চায় তার গতি ঊর্ধ্ব বা আরোহী হওয়া উচিত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দিকে আরোহণ ও উড্ডয়ন।

তাঁরা বিশ্বাস করেন এখানে চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তির অবকাশ নেই। এখানে শুধু আত্মার কার্যক্রম ও গতি রয়েছে এবং আত্মার এ গতি আল্লাহ্‌য় গিয়ে পৌঁছে। সমস্যা এখানেই সৃষ্টি হয়েছে যে, 'মানুষ আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছায়'– এর অর্থ কি? যদিও তাঁরা তাঁদের এ বাণীকে বিভিন্ন স্থানে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু সে সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক মতাদর্শের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

আমাদের (ফার্সী) সাহিত্যের খুবই আকর্ষণীয় একটি আলোচনা বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রেমের দ্বন্দ্ব নিয়ে আবর্তিত হয়েছে। মূলত আরেফরা এ বিষয়টি নিয়ে অধিক আলোচনা রেখেছেন এবং সব সময়ই প্রেমকে বুদ্ধিবৃদ্ধির উপর বিজয়ী ঘোষণা করেছেন।

খোদাপ্রেমের মতবাদ মানুষের পূর্ণতায় পৌঁছার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিকে যথেষ্ট বলে মনে করে না। তাঁরা বলেন, বুদ্ধিবৃত্তি মানুষের অস্তিত্বের একটি অংশ মাত্র– পূর্ণ অস্তিত্ব নয়। চক্ষু যেমন মানুষের অন্যতম মাধ্যম, বুদ্ধিবৃত্তিও তাই। মানুষের সত্তা তার বুদ্ধিবৃত্তি নয়, বরং মানুষের সত্তা হলো তার আত্মা এবং আত্মা খোদাপ্রেমের প্রতিভূ– যেখানে তাঁর প্রতি যাত্রা ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। এ কারণেই এ মতবাদে বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে সমালোচনা করা হয়। কবি হাফেজ এ বিষয়টি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন–

"প্রেমের শরাব পেতে চাই আমি আকলের মূল্যে
সেই তো ধন্য যে এ ব্যাবসা করলে।"

আরেফগণ সব সময়ই প্রেমাকুল হওয়াকে বুদ্ধিবৃদ্ধির উপর প্রাধান্য দেন। তাঁদের নিজস্ব কিছু বক্তব্য ও কথা রয়েছে। তাঁদের নিকট একত্ববাদের বিশেষ অর্থ রয়েছে, একত্ববাদ তাঁদের নিকট অস্তি ত্বসমূহের একতা (ওয়াহ্‌দাতে উজুদ)। এ একত্ববাদ এমন যে, যদি কোন মানুষ সেখানে পৌঁছায় তাহলে সব কিছুরই অন্য রকম অর্থ অনুভব করে। এ মতবাদে পূর্ণ মানব অবশেষে খোদার অনুরূপ হয়ে যায়। তাঁদের ভাষায় প্রকৃত পূর্ণ মানব খোদ স্রষ্টা এবং যে মানুষই কামেল মানুষ হয়, নিজে বিলীন হয়ে খোদায় পৌঁছায়। এ মতবাদ সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব।

শক্তি বা ক্ষমতার মতবাদ

অন্য একটি মতবাদ পূর্ণ মানবের রূপ উপস্থাপন করে যা বুদ্ধিবৃত্তি বা ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং ক্ষমতা বা শক্তির উপর প্রতিষ্টিত। পূর্ণ মানব তাদের ভায়ায় ক্ষমতাবান মানুষ এবং পূর্ণতার অর্থ ক্ষমতা ছাড়া কিছু নয়।

প্রাচীনকালে গ্রীসে একদল ব্যক্তি ছিল যাদের সন্দেহবাদী বলা হয়। তারা এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলত যে, সত্য অর্থ ক্ষমতা। যার ক্ষমতা আছে সত্যও তার সঙ্গে। যেখানেই ক্ষমতা আছে সত্যও সেখানে। দুর্বলতা ও ক্ষমতাহীনতা অসত্যের সমান। তাদের ভাষায় ন্যায় ও অন্যায়ের কোন অর্থ নেই। তাই তাদের উৎস হতো শক্তিমত্তা ও ক্ষমতা। তাদের বিশ্বাস মানুষের উচিত তাদের সমগ্র চেষ্টাকে ক্ষমতা ও শক্তি অর্জনের জন্য ব্যয় করা। শক্তি ও ক্ষমতার কোন সীমারেখায় তারা বিশ্বাসী নয়।

দু'শতাব্দী পূর্বে জার্মান দাশনিক নী'চে বা নীটসে () এ মতবাদের পুনর্জন্ম দান করেন। তাঁর মতে 'সত্য ভালো', 'সততা ও আমানতদারী ভালো', 'মানবকল্যাণ ভালো' এগুলো মূল্যহীন কথা। যে দুর্বল তার হাত ধর, সাহায্য কর এ কেমন কথা, বরং তাকে পারলে লাথি মেরে নীচে ফেলে দাও। দুর্বলতার চেয়ে বড় অন্যায় কিছু আছে নাকি? যেহেতু সে দুর্বল তাই তুমিও তার মাথায় পাথর ভাঙ্গ। নী'চে যিনি নিজেও খোদা ও দীনবিরোধী তাঁর মতে ধর্ম এ দুর্বলরাই সৃষ্টি করেছে। তাঁর এ মত ঠিক কার্ল মার্কসের মতের বিপরীত যিনি মনে করেন ক্ষমতাবানরাই ধর্মের সৃষ্টি করেছে যাতে করে দুর্বলদের নিজেদের অধীনে রাখতে পারে।

নী'চের মতে দুর্বলরা ধর্মের সৃষ্টি করেছে যাতে করে ক্ষমতাবানদের শক্তি ও ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা যায়। তাঁর মতে দান, অনুগ্রহ, মানবতা, কল্যাণ, ন্যায়, সততা, প্রেম এগুলো মানুষের মধ্যে প্রচার

করে ধর্ম মানুষের প্রতি খিয়ানত করেছে। এভাবেই ক্ষমতাবানদের প্রতারিত করে তাদের ক্ষমতাকে সীমিত করে রেখেছে।

নী'চে বলছেন, ধর্মসমূহ আহ্বান জানায় প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামের জন্য। কেন আমরা প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে যাব? ধর্ম বলে আত্মার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে গড়া উচিত যাতে সাম্যের মনোভাব সৃষ্টি হয়। সাম্য কি? সাম্য এক অর্থহীন বস্তু। সব সময়ই উচিত এক দল ক্ষমতাবান থাকা এবং আরেক দল তাদের অনুগত থাকা। অনুগত দলকে তাদের জীবন ও শ্রম ব্যয় করে ক্ষমতাবানদের জন্য কাজ করা উচিত যাতে ক্ষমতাশীলরা উন্নতি করতে পারে, উন্নত শক্তির মানুষ তৈরি করতে পারে।

ধর্ম বলে, পুরুষ ও নারী মানবীয় বৈশিষ্ট্যে সাম্যের দাবিদার। তাঁর মতে এটাও অর্থহীন। পুরুষ শক্তিশালী ও নারী থেকে শ্রেষ্ঠ। নারী পুরুষের জন্য সৃষ্ট, এ ছাড়া নারীর কোন মূল্য নেই। নারী-পুরুষের সাম্য এটা ভুল। এ মতবাদ প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ মানব ও পূর্ণ মানব বলতে ক্ষমতাবান মানুষ বোঝে এবং পূর্ণতা ক্ষমতা ও শক্তির সমান বলে মনে করে।

জীবন কি শুধুই বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম?

এ ধরনের কথা আমাদের মধ্যেও অজ্ঞাতসারে প্রচার লাভ করেছে। যেমন কখনো কখনো আমরা বলি, জীবন বেঁচে থাকার সংগ্রাম ছাড়া কিছু নয়। না, জীবন বেঁচে থাকার সংগ্রাম নয়, বরং জীবন হলো সত্যের জন্য সংগ্রাম। কখনো কখনো কোনো কোনো ইসলামী ব্যক্তিত্ব, যেমন ফরিদ ওয়াজেদী বলেছেন, যুদ্ধ মানুষের জন্য অপরিহার্য, যতদিন মানুষ আছে যুদ্ধও রয়েছে, যুদ্ধ যেন মানুষের জীবনের অঙ্গ। তিনি বিশ্বাস করেন কোরআনও তার বিভিন্ন আয়াতে এ কথাকে সত্যায়ন করেছে। যেমন সূরা হজ্বের এই আয়াতে– "যদি মহান আল্লাহ্ মানুষের একদল দ্বারা অন্য দলকে প্রতিরোধ না করতেন তবে ইহুদী, নাছারাদের উপাসনালয়সহ সকল মসজিদ যেখানে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয় সব ধ্বংস হয়ে যেত।" (সূরা হজ্ব : ৪০) এবং সূরা বাকারার এই আয়াতে– "যদি আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে এক দল দ্বারা অন্য দলকে প্রতিরোধ না করতেন, তবে প্রথিবীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।" (সূরা বাকারা : ২৫১)

তাঁর মতে এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ যুদ্ধকে বৈধতা দান করেছেন। যেমনভাবে এ আয়াতগুলোতে বলছেন, যুদ্ধ না থাকলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত বা কোন উপাসনালয়ই অবশিষ্ট থাকত না।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সকল ব্যক্তি কোরআনের এ আয়াতকে ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। কোরআনের এ সকল আয়াত প্রতিরোধের ও জিহাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছে। যেহেতু খ্রিষ্টানরা বলে, যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে নিন্দনীয় ও অন্যায়; আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী, কোরআন তাদের জবাবে বলছে, যে সকল যুদ্ধ অধিকার হরণ ও সীমালঙ্ঘনের জন্য ঘটে তা অন্যায়। কিন্তু যে যুদ্ধ সত্যকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তা অন্যায় নয়। হে খ্রিষ্টান পাদ্রীসকল! যদি প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ না থাকত, তবে তোমরাও গীর্জায় বসে ইবাদতের সুযোগ পেতে না। কোন মুমীন ব্যক্তিও মসজিদে বসে ইবাদত করতে পারত না। জিহাদই সে বস্তু যা সত্য ও সত্যপথকে রক্ষা করছে। তাই পাদ্রীমহোদয়! আপনারও যে সৈনিক এজন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে তার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

সুতরাং মানুষের পক্ষে সম্ভব পূর্ণতা ও প্রশিক্ষণের সে পর্যায়ে পৌঁছা যে পর্যায়ে প্রকৃতপক্ষে কোন সীমালঙ্ঘনকারীও থাকবে যার সঙ্গে যুদ্ধ বৈধ হবে। এজন্যই যখন বলা হয় জীবন বেঁচে থাকার সংগ্রাম ছাড়া কিছু নয়থ– যার অর্থ জীবনের জন্য যুদ্ধ ও সংগ্রাম অপরিহার্য কথাটি ঠিক নয় (সম্প্রতি ইসলামে আদর্শ সমাজ সম্পর্কিত যে আলোচনা হয় অর্থাৎ ইমাম মাহদী [আ.]-এর আবির্ভাবের পর সমাজের অবস্থা সেখানে বলা হচ্ছে, يَصْطَلِح سِبَاعُ بَهَائِم এমনকি হিংস্র প্রাণীরাও একে অপরের সঙ্গে শান্তিতে সহাবস্থান করবে এবং যুদ্ধ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ মানুষ পূর্ণতার এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যে, সমাজে কোন সীমালঙ্ঘনকারীই থাকবে না যাতে করে যুদ্ধের প্রয়োজন পড়বে)।

এ সম্পর্কে একটি বিষয় আলোচনা করতে চাই। সম্ভবত অনেকেই তা শুনে কষ্ট পাবেন যেহেতু আমাদের যুবকদের মধ্যে অনেকেই যা কিছু তাদের পছন্দমত নয় তা শুনলে দুঃখ পায়।

একটি কথা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর বলে প্রচার করা হয়। এ কথাটির না অর্থ সঠিক, না কোন গ্রন্থে এটা ইমাম হুসাইনের বাণী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছরের বেশি নয় এ কথাটি বলা হচ্ছে যে, ইমাম হুসাইন বলেছেন, إِنَّ الْحَيَاةَ عَقِيْدَةٌ وَ جِهَادٌ অর্থাৎ জীবন হলো এক বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করা। কথাটি পাশ্চাত্যের চিন্তার সাথে সংগতিশীল যেহেতু তারা বলে মানুষের একটি বিশ্বাস বা আকীদা থাকা দরকার এবং সে আকীদার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। কোরআন সত্যের কথা বলে। জিহাদ ও জীবন কোরআনের দৃষ্টিতে সত্যের উপাসনা ও সত্যের জন্য জিহাদ। বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম নয় বা জীবনের অর্থও বিশ্বাস বা আকীদা নয়। কারণ আকীদা সঠিক হতে পারে আবার বাতিলও হতে পারে।

আকীদা হলো চিন্তাসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সংযুক্তি। মানুষের চিন্তায় হাজারো ধরনের চিন্তার সম্মিলন ও সংযুক্তি ঘটে। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য মতাদর্শ বলে, মানুষের কোন এক বিশেষ বিশ্বাস, আদর্শ ও উদ্দেশ্য থাকা উচিত এবং সেই লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা চালানো উচিত। এখন প্রশ্ন হলো সেই বিশ্বাস কি? তারা বলে, সেটা যা-ই হোক না কেন। কোরআনের কথাগুলো অত্যন্ত হিসেবী ও মাপা। কোরআন সব সময়ই বলছে, হক ও সত্য এবং সেই হক ও সত্যের জন্য জিহাদ। কোরআন এটা বলে না যে, তোমার আকীদা ও বিশ্বাসের জন্য জিহাদ কর, বরং বলছে, প্রথমে তোমার আকীদাকে সংশোধিত কর। প্রথমে তোমার আকীদার সঙ্গে যুদ্ধ করে সঠিক ও সত্য আকীদাকে গ্রহণ কর। তৎপর যখন সত্যকে উদ্ঘাটন করেছ তখন এ সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম ও জিহাদ কর।

যা হোক পূর্ণ মানুষ অর্থ ক্ষমতাবান মানুষ বা শক্তিবান মানুষ এ কথাটির মূল ভিত্তি এসেছে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামের ডারউইনের যে তত্ত্ব (ঝঃৎঁমমষব ভড়ৎ ঃযব ভরঃঃবংঃ) সেখান থেকে।

ডারউইন তাঁর এ তত্ত্বে জীবনকে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম হিসেবে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সকল জীবই সর্বাবস্থায় বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। আমরা বলতে চাই, মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী এ ধরনের বলে কি আমরা মানুষকেও বলব যে, মানুষও বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে বেঁচে থাকার জন্য সহযোগিতা বলে কিছু

নেই। যদি তাই হয় তবে একতা, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, ভালোবাসা যা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান তাকে কি বলব? তখন তাঁরা বলেন, ভুল করেছেন, প্রতিযোগিতাকে আপনারা সহযোগিতা বলে মনে করেছেন। এই সহযোগিতা, ভালোবাসা আর বন্ধুত্বের অন্তরালেও প্রতিযোগিতা ও সংগ্রাম লুকিয়ে রয়েছে। কিরূপে? জবাব দেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনে যুদ্ধ ও প্রতিযোগিতাই মুখ্য, কিন্তু যখন মানুষ তার থেকে বড় কোন শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়ায় তখন বড় শত্রুটি বন্ধুত্বকে তার উপর চাপিয়ে দেয়। তাই এ বন্ধুত্ব প্রকৃতপক্ষে বন্ধুত্ব নয়, এ হৃদ্যতাও বাহ্যিকতা মাত্র। বড় শত্রুকে মোকাবিলার জন্য এ সহযোগিতার জন্ম ও হৃদ্যতার সৃষ্টি। যখনই এ বড় শত্রুকে দৃশ্য থেকে সড়ানো হবে তখন দেখা যাবে যারা এতক্ষণ বন্ধু ছিল তারাই বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে। যদি পুনরায় একদল নিশ্চিহ্ন হয়, অন্য যে অংশটি বেঁচে থাকবে তারা আবার বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে ও একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করার কাজে লিপ্ত হবে। এভাবে যখন শুধু দু'ব্যক্তি থাকবে, তৃতীয় কেউ তাদের মোকাবিলায় থাকবে না তখন এরা দু'জন একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এ মতবাদে বিশ্বাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো সকল বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, ভালোবাসা, ঐক্য ও সহযোগিতা শত্রুতা থেকেই সৃষ্টি। তাই তাদের মতে প্রতিযোগিতাই মুখ্য আর সহযোগিতা প্রতিযোগিতারই সৃষ্টি।

দুর্বলতার মতবাদ

যেমনিভাবে অনেকেই বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদের বিরোধিতা করেছেন এবং অনেকেই প্রেমের মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক বলে মনে করেছেন তেমনিভাবে ক্ষমতার মতবাদেরও অনেকে বিরোধিতা করেছেন। কেউ কেউ ক্ষমতাকে বাড়াবাড়ি রকমভাবে সমালোচনা করেছেন এবং মানুষের পূর্ণতাকে প্রকৃতপক্ষে দুর্বল থাকার মধ্যেই মনে করেছেন। তাঁদের মতে পূর্ণ মানব হলো সে-ই যার কোন ক্ষমতা নেই। যেহেতু যদি ক্ষমতা থাকে তবে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনের সম্ভাবনা রয়েছে। শেখ সা'দী তাঁর এক কবিতায় এ রকম একটি ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন,

"আমি সে পিপীলিকা, যে অন্যের পায়ে পদদলিত হয়
নই মৌমাছি যে তার আঘাতে অন্যকে কষ্ট দেয়।"

আবার বলেছেন,

"কিরূপে করিব আমি এ নেয়ামতের শোকর স্বর্গপতি?
সে শক্তি দাওনি আমায় করিব সৃষ্টির ক্ষতি।"

না, জনাব সা'দী, এমন নয় যে, মানুষকে হয় পিপীলিকা, না হয় মৌমাছি হতে হবে। ফলে আপনি এ দু'য়ের মধ্যে পিপীলিকা হওয়াকে নিজের জন্য বেছে নিবেন। আপনার সেই পিপীলিকা হওয়ারও প্রয়োজন নেই যে অন্যের পায়ের নীচে পিষ্ট হয়, আবার মৌমাছি বা বোলতা হওয়ারও প্রয়োজন নেই যে অন্যকে কষ্ট দেয়। বরং আপনার এটা বলা উচিত,

"আমি সে পিপীলিকাও নই, যে অন্যের পায়ে পিষ্ট হয়
নই মৌমাছিও, যে অন্যকে কষ্ট দেয়।

কিরূপে এ নেয়ামতের শোকর করব আমি?
রয়েছে শক্তি তবুও কষ্ট দেই না আমি।”

যদি মানুষের শক্তি ও ক্ষমতা থাকে তদুপরি কাউকে কষ্ট না দেয় তখনই শোকরের প্রশ্ন আসে। নতুবা শক্তি না থাকার কারণে কাউকে কষ্ট দেয় না এরূপ হলে শিংবিহীন প্রাণীর মতো যে শিং না থাকার কারণে কাউকে গুঁতা দেয় না। যোগ্যতার প্রমাণ এখানেই যে, শিং থাকার পরও কাউকে গুঁতা দেয় না।

সা’দী অন্য এক স্থানে বলেছেন,

“দেখেছি এক সন্ন্যাসীকে থাকেন পর্বত চূড়ায়,
সন্তুষ্টির অন্বেষায় দুনিয়া ত্যাগীয়া নিয়েছেন আশ্রয় গুহায়।
জিজ্ঞাসিনু তারে কেন আসেন না মানুষের মাঝে
মানুষের বোঝা লাঘবের মহান কাজে?”

এক সাধক যিনি পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন এবং সেখানে ইবাদতে মশগুল তাঁর প্রশংসায় লিপ্ত হয়েছেন সা’দী। (অবশ্য সা’দী এ কবিতায় ভাবার্থের বিপরীতধর্মী কথাও অন্যস্থানে বলেছেন। যেমন বলেছেন,

“খানকা থেকে এলেন এক বুজুর্গ মাদ্রাসায়,
ভেঙ্গে তার চুক্তি যা ছিল সে পথের পথিকের সাথে।
জিজ্ঞাসিনু তারে কি পার্থক্য রয়েছে আলেম ও আবেদের মাঝে
যে কারণে ছেড়েছেন সে পথ, ধরেছেন এ রথ?
বললেন, যে বাঁচাতে চায় নিজেরে শুধু, উত্তাল সমুদ্রের মাঝে,
সে আবেদ, আর যে অন্যকেও বাঁচাতে চায় তাকেই আলেম বলা সাজে।”

তিনি বলছেন, তাঁকে প্রশ্ন করলাম, “কেন আপনি শহরে আসেন না, মানুষের খেদমত করেন না?” সাধক তার জবাবে এক অজুহাত পেশ করেন। সা’দী এখানেই নীরব হয়ে যান। মনে হয় তিনি সাধকের এ অজুহাতকে গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। তিনি বলছেন,

“বললেন সাধক, সেথায় রয়েছে অপরূপ রূপসিগণ
ভয় পাই, যদি দেখিয়া তাদের রূপ হারাই নিয়ন্ত্রণ।”
(যেমনভাবে হাতী কাদাযুক্ত পথে চলতে ভয় পায়)

যেহেতু অপরূপ রূপসীরা সে শহরে বাস করে। তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতে আমার স্খলন ঘটতে পারে। যেহেতু নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় আছে তাই এ গুহায় নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছি।

বাহ্! কত সুন্দর এ পূর্ণতা! নিজেকে এক স্থানে বন্দি করে পূর্ণতায় পৌঁছার পথ খোঁজাকে কি পূর্ণতা বলা যায়? জনাব সা’দী কোরআন আপানার জন্য সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছে। এ কাহিনী হযরত ইউসুফ (আ.)-এর। এ কাহিনী কোরআনের ভাষায় তাদের জন্য যারা তাকওয়া (খোদাভীতি) ও ধৈর্য

অবলম্বন করে; যেহেতু কোরআন বলছে, "নিশ্চয়ই যে তাকওয়া ও ধৈর্য অবলম্বন করে (অবশেষে সে সফলকাম হবে), যেহেতু আল্লাহ্পাক সৎকর্মশীলদের কর্মকে বিফল করেন না।" (সূরা ইউসুফ : ৯০) অর্থাৎ কোরআন বলছে, তুমিও ইউসুফের মতো হও। প্রবৃত্তির ক্ষুধা মেটানোর সকল উপায়-উপকরণ প্রস্তুত ছিল, এমনকি পালানোর পথও রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তদুপরি তিনি নিজের পবিত্রতাকে রক্ষা করেছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর জন্য বন্ধ দুয়ারগুলোও খুলে দিয়েছেন। যেহেতু হযরত ইউসুফ (আ.) অবিবাহিত এবং সৌন্দর্যের দিক থেকে ছিলেন অপূর্ব, সেহেতু তিনি নারীদের পেছনে নন, বরং নারীরাই তাঁর পেছনে ছুটত। এমন দিন তাঁর জন্য অতিবাহিত হতো না যে, কোন নারী তাঁকে পত্র দেয়নি বা তাঁর খোঁজে আসেনি। তাও যেমন তেমন নারী নয়, বরং মিশরের শ্রেষ্ঠ ও কূলনারীরা তাঁর জন্য চরমভাবে আসক্ত ছিল। স্বয়ং মিশরের অধিপতির স্ত্রী জুলাইখা তাঁর প্রেমে বিভোর। তাঁকে পাওয়ার জন্য সব উপকরণ প্রস্তুত করেছে। তাঁর জন্য মরণ ফাঁদ পেতেছে– হয় তার ইচ্ছা বাস্তবায়িত করতে হবে, নতুবা তাঁকে হত্যা করা হবে। কিন্তু হযরত ইউসুফ কি করলেন? আল্লাহ্র প্রতি হাত উঠিয়ে বললেন, "হে পরওয়ারদিগার! যে বস্তুর প্রতি এরা আমাকে আহ্বান করছে তার থেকে জেলখানায় বন্দিত্ববরণকে আমি অধিক পছন্দ করি।" (সূরা ইউসুফ : ৩৩)

অর্থাৎ এ স্ত্রীলোকদের ইচ্ছা পূরণ করার চেয়ে আমাকে বন্দিত্ব বরণের সুযোগ দিন যাতে করে এদের হাত থেকে রক্ষা পাই। যদিও আমার এ অপরাধ করার সামর্থ্য ও সুযোগ রয়েছে তদুপরি তা আমি করব না।

সুতরাং মানুষের পূর্ণতা তাদের দুর্বলতার মধ্যে নয়। যদিও আমাদের সাহিত্যে কখনো কখনো কেউ দুর্বলতাকে মানুষের পূর্ণতা মনে করেছেন। অন্য এক কবি বাবা তাহেরও এ রকম বলেছেন,

"আমার এ চোখ ও অন্তর হতে আমি বাঁচতে চাই,
যা কিছু দেখে এ চোখ, অন্তর স্মরণ করে তা-ই।"
এ পর্যন্ত কথা ঠিকই আছে, কিন্তু এরপর বলছেন,
"বানাব এক তরবারী যা লৌহ কঠিন শক্ত
হানব আঘাত এ চক্ষুতে অন্তর হবে মুক্ত।"

অর্থাৎ যা কিছুই চক্ষু দেখে অন্তর তা পেতে চায়। তাই অন্তরকে মুক্ত ও স্বাধীন করার জন্য এক তরবারী চাই যা দিয়ে এ চক্ষুকে অন্ধ করে দিব যাতে অন্তর কিছু না চাইতে পারে। যদি এমনই হয় তবে এমন অনেক অনেক কিছু আছে যা কর্ণ শুনে ও অন্তর পেতে চায় তাই কর্ণের মধ্যেও এক তরবারী প্রবেশ করান। আর পুরোদমে মুক্তি পেতে চাইলে খোজাও হতে হবে যাতে জৈবিক চাহিদার কথাও মনে না হয়। শেষ পর্যন্ত মাওলানা রুমীর মাসনভীর মাথা, পেট ও লেজবিহীন সিংহের গল্পের মতো হবে। বাবা তাহের অদ্ভুত এক ইনসানে কামেল তৈরি করেছেন। এই ইনসানে কামেলের না হাত আছে, না পা আছে, না চোখ, কান বা অন্য কিছু।

এ ধরনের দুর্বল চারিত্রিক প্রশিক্ষণের নির্দেশনা আমাদের সাহিত্যে প্রায়ই দেখা যায়। তাই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে মানুষ সব সময়ই ভুল করে। কখনো অতিরিক্ত, কখনো পরিহার তার

জীবনে লক্ষণীয়। ইসলামে যেহেতু ত্রুটি নেই তাই বোঝা যায়, এটা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোথাও থেকে আসেনি। যদি মানুষ সক্রেটিস হয় তাহলে মূল্যবোধগুলোর হয়তো একটি দিক ধরে থাকেন ও ভুল করেন, প্লেটো হলে অন্য একটি দিক ধরে থাকেন ও ভুল করেন। তেমনিভাবে ইবনে সিনা একদিক, মহিউদ্দিন আরাবী ও মাওলানা রুমী অন্যদিক ধরে থাকেন। কার্ল মার্কস, জাপসে সারটার সকলেই এরূপ একদিক ধরে বসে রয়েছেন। তাই এঁদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব মানুষের পথ প্রদর্শক হওয়া? নবীয়ানী ও মতাদর্শ তো সর্বজনীন, সর্বব্যাপী ও পূর্ণ হতে হবে। তাই প্রকৃতপক্ষে এ সকল ব্যক্তি যেন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে একদল ছাত্র– নিজেদের চিন্তা-ভাবনা থেকে কিছু বলেছে। অবশেষে বিজ্ঞ শিক্ষকের কথা শুনলে বোঝা যাবে শিক্ষকের কথা তাদের থেকে কত উন্নত ও উত্তম!

প্রেম ও ভালবাসার মতাদর্শ (আত্মপরিচিতির মতবাদ)

পূর্ণ মানব সম্পর্কিত অন্য আরেকটি মতবাদ যাকে প্রেম ও ভালবাসার মতবাদও বলা যায়। কয়েক হাজার বছর পূর্বে পূর্ব-এশিয়ায় চিন্তা ও জ্ঞানের উচ্চ পর্যায়ের চর্চা ছিল। অনেক পুরাতন ভারতীয় গ্রন্থ (ফার্সী ভাষায়ও অনুবাদ হয়েছে) যেমন 'উপনিষদ' এ ধরনের উচ্চ মার্গের গ্রন্থ।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আল্লামা তাবাতাবায়ী কয়েক বছর পূর্বে যখন প্রথম 'উপনিষদ' পড়েছিলেন তখন মন্তব্য করতেন, প্রচুর মূল্যবান কথা এ গ্রন্থে আছে, কিন্তু কমই এ গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

এ মতাদর্শে মানুষের পূর্ণতার কেন্দ্রবিন্দু হলো আত্মপরিচয়। এ মতাদর্শ বলে, 'নিজেকে জান'। অবশ্যই নিজেকে জান– এটা সক্রেটিসও বলেছেন, সকল নবীও বলেছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রতিপালককে চিনতে পেরেছে।" কিন্তু এ মতাদর্শে যে বিষয়ের প্রতিই কেবল দৃষ্টি দেয়া হয়েছে তা হলো আত্মপরিচয়।

মহাত্মা গান্ধীর লেখা কিছু প্রবন্ধ ও পত্র 'এটাই আমার ধর্ম' শিরোনামে ফার্সীতে গ্রন্থাকারে ছাপানো হয়েছে। এ অনুবাদ গ্রন্থটি আমার মতে বেশ ভালো। গান্ধী এ গ্রন্থে বলেছেন, "আমি উপনিষদগুলো পড়ে তিনটি মৌলিক বিষয় পেয়েছি যা আমার সারা জীবনের দিক-নির্দেশনা হিসেবে রয়েছে।" প্রথম মৌল বিষয় যা গান্ধী উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে পৃথিবীতে শুধু একটি সত্য রয়েছে, তা হলো নিজেকে চেনা ও জানা। 'নিজেকে জান' এ বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই গান্ধী সুন্দরভাবে পাশ্চাত্যের উপর হামলা করেছেন। তিনি বলেছেন, "পাশ্চাত্য বিশ্বকে জেনেছে, কিন্তু নিজেকে চিনেনি। যেহেতু নিজেকে চিনেনি তাই নিজেও যেমন দুর্ভাগা হয়েছে বিশ্বকেও দুর্ভাগ্যে নিপতিত করেছে।" তাঁর এ কথা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও খুবই সুন্দর।

দ্বিতীয় মৌল বিষয় : যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সে স্রষ্টাকেও চিনতে পেরেছে। সে সুবাদে সব কিছুকেই চিনতে পেরেছে।

তৃতীয় মৌল বিষয় : শুধু একটি শক্তিরই অস্তিত্ব রয়েছে আর তা হলো নিজের উপর পূর্ণ আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ। যে কেউ নিজের অধিপতি হবে অন্য সকল কিছুর উপরও আধিপত্য লাভ করবে। বিশ্বে একটি পুণ্য কাজ রয়েছে। আর তা হলো ভালোবাসা, অন্যদেরকে ভালোবাসা যেমনভাবে মানুষ নিজেকে ভালোবাসে। অন্যভাবে বললে অন্যদেরকেও নিজের মত করে দেখতে হবে।

তাদের ভাষায় পরিচিতি অর্থ আত্মপরিচয়। নিশ্চয়ই জানেন, হিন্দু দর্শনে মোরাকাবা বা আত্মনিযন্ত্রণ, নিজের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে (যদিও এখন এই আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যে যোগীদের কঠিন অনুশীলন ও অন্যান্য বিষয় যোগ হয়েছে সেগুলো আমার উদ্দেশ্য নয়)। হিন্দু দর্শনের মূলে আত্মপরিচয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ, নিজেকে উদ্ঘাটনের মাধ্যমে ভালোবাসার সৃষ্টি হয়।

সুতরাং এ মতবাদের মতে পূর্ণ মানব হলো সেই ব্যক্তি যে নিজেকে চিনেছে। যখন সে নিজেকে চিনবে তখন নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে। আর যখন নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে তখন অন্যদেরকে ভালোবাসতে শুরু করবে। এখন এ মতবাদকে আমরা আত্মপরিচিতির মতবাদও বলতে পারি, আবার প্রেম ও ভালবাসার মতবাদও বলতে পারি।

পূর্ণ মানব সম্পর্কিত অন্য দু'টি মতবাদ

গত দু'তিন শতাব্দীতে বেশ কিছু মতাদর্শের জন্ম হয়েছে যাঁরা মূলত সামাজিকতার দিকটিকে প্রাধান্য দান করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের এ প্রবণতা ব্যক্তির থেকে সমাজের দিকে বেশি। তাঁদের এক দল মনে করেন পূর্ণ মানব হলো শ্রেণীহীন মানুষ। যদি কোন মানুষ এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়, বিশেষ করে ধনিক ও উচ্চশ্রেণীর, তবে সে মানুষ ত্রুটিযুক্ত মানুষ। শ্রেণীকেন্দ্রিক সমাজে সঠিক ও ত্রুটিহীন মানুষ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। এ মতাদর্শ আদর্শিক পূর্ণ মানবে বিশ্বাসী নয়, যেহেতু মানুষের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কোন মর্যাদা আছে বলে মনে করে না। এ মতবাদের দৃষ্টিতে পূর্ণ মানব সে যে শ্রেণীহীন সমাজে অন্যান্য মানুষের সমপর্যায়ে জীবন যাপন করে।

অন্য আরেকটি দল বিশেষত মানুষের সচেতনতা ও স্বাধীনতার বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দেন। সচেতনতা বলতে তাঁরা সামাজিক সচেতনতাকেই বুঝান। অস্তিত্ববাদীরা মূলত স্বীধীনতা, সচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধকে মানুষের মূল বলে মনে করেন। এঁদের মতে পূর্ণ মানব হলো যে মানুষ স্বাধীন, সচেতন, দায়িত্ববান ও প্রতিশ্রুতবদ্ধ। তাঁদের স্বাধীনতার অর্থও দ্বন্দ্ব-বিবাদ ও বিদ্রোহ বৈ কিছু নয়।

সুবিধা ও অধিকারের মতবাদ

অন্য একটি মতবাদ যা ক্ষমতার মতবাদের কাছাকাছি তা হলো অধিকারের মতবাদ। তাঁরা বলেন, 'ইনসানে কামেলকে প্রজ্ঞাবান হতে হবে', 'তাকে স্রষ্টায় পৌঁছতে হবে'– এ ধরনের কথাগুলো অর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে যদি পূর্ণ মানুষ হতে চাও তবে চেষ্টা কর কোন কিছুর অধিকারী হতে, সৃষ্টির যত বেশি বস্তুর অধিকারী হতে পার তত বেশি পূর্ণতা লাভ করেছ অর্থাৎ ইনসানে কামেল সব কিছুর অধিকারী। এ কারণে তাঁরা মানুষের পূর্ণতাকে প্রজ্ঞায় না দেখে জ্ঞান বা বিজ্ঞানে দেখেন। জ্ঞান বলতে তাঁরা বলেন, জ্ঞান হলো প্রকৃতিকে জানা এ উদ্দেশ্যে যে, এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা ও মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহারের লক্ষ্যে তা থেকে সকল সুবিধা ভোগ করা। তাঁদের এ কথার শেষ অর্থ দাঁড়ায় জ্ঞানের মূল্য মানুষের নিকট একটা মাধ্যমের মতো এবং প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের সত্তাগত কোন মূল্য নেই। জ্ঞান এজন্য

মূল্যবান যে, এর মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে ও প্রকৃতি মানুষের নিয়ন্ত্রণে আসে। আর যখন প্রকৃতি তার নিয়ন্ত্রণে আসে তখন সে প্রকৃতিকে ভালোভাবে ব্যবহার ও তার থেকে লাভবান হতে পারে। তাই যদি চাও মানুষকে পূর্ণতায় পৌঁছাতে তবে প্রকৃতি থেকে অধিকতর সুবিধা গ্রহণের জন্য চেষ্টা চালাও। জ্ঞানকেও এজন্য ব্যবহার কর। জ্ঞান তাদের নিকট একটি মাধ্যম ছাড়া কিছু নয়। যেমনভাবে শিং গরুর জন্য প্রতিরক্ষার, সিংহের জন্য দাঁত আক্রমণের তেমনিভাবে জ্ঞানও মানুষের জন্য প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের একটি উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়।

এতক্ষণ যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করলাম এ মতবাদগুলোর পর্যালোচনার পর আমরা এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করে ব্যাখ্যা করব। ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিকে কতটা মূল্য দেয়, প্রেম ও ভালোবাসাকে ইসলাম কতটা প্রাধান্য দেয়, সে সাথে ক্ষমতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ ও শ্রেণীহীন সমাজের মূল্য ইসলামের নিকট কিরূপ?

মৃত্যুকে কিভাবে গ্রহণ করব?

মৃত্যুকে গ্রহণ করা সন্দেহাতীতভাবে মানুষের পূর্ণতার প্রতিচ্ছবি। যেহেতু মৃত্যুভয় মানুষের জন্য একটি বড় দুর্বলতা সেহেতু মানুষের অধিকাংশ দুর্ভাগ্যের মূলে রয়েছে এটি। যেমন অপমানকে গ্রহণ, অসম্মানজনক অধীনতা গ্রহণ করা এরূপ হাজারো দুর্গতি। যদি কেউ মৃত্যুকে ভয় না পায় তাহলে তার পুরো জীবনই পাল্টে যাবে। মহৎ ব্যক্তিরা মৃত্যুর মুখোমুখি হলে সাহসিকতার ঊর্ধ্বে উঠে হাসিমুখে তা গ্রহণ করেন। (অবশ্য আত্মহত্যার ফল আমরা বলছি না। বরং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে দায়িত্ব মনে করে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার কথা বলছি। যারা আত্মহত্যা করে তারা তো দায়িত্ব এড়ানোর জন্য এ কাজ করে।)

যদি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মৃত্যু উপস্থিত হয় তবে মানুষের জন্য তা সাফল্য। ইমাম হুসাইন (আ.) বলেন,

إِنِّى لا أرَى الْمَوْتَ إِلا سَعَادَةَ, وَ لا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِيْنَ إِلا برمًا

"আমি মৃত্যুকে সাফল্য ছাড়া কিছু মনে করি না আর জালেমদের সঙ্গে বেঁচে থাকাকে অপমান ছাড়া অন্য কিছু দেখি না।" (লুহুফ, পৃ. ৬৯)

মৃত্যুকে এভাবে গ্রহণকে আল্লাহ্প্রেমিক ব্যতীত কেউ দাবি করতে পারে না। যাদের কাছে মৃত্যু এক ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থান পরিবর্তনের মতো। ইমাম হুসাইনের ভাষায় একটি সাঁকো অতিক্রম করার মতো, এ ছাড়া কিছু নয়। ইমাম হুসাইন আশুরার দিন সকালে তাঁর সাথীদের বলেন,

مَا الْمَوْتَ إِلا قَنْطَرة تَعْبَرُ بِكُمْ عَنِ الْبُؤْسِ وَ الضَّرَّاءِ إِلى الْجَنَانِ

"মৃত্যু একটি পুলের মত যার উপর দিয়ে তোমরা অতিক্রম করবে ও জান্নাতকে আলিঙ্গন করবে (কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে)।" (মায়ানী আল আখবার সাদুক, পৃ. ২৮৯)

হে আমার সাথীরা! আমাদের সম্মুখে শুধু একটি সাঁকো রয়েছে যার নাম মৃত্যু– এটা অতিক্রম করলেই আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব। প্রতি মুহূর্তে যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হচ্ছিল ইমাম হুসাইনের চেহারা তত সুন্দর ও হাস্যোজ্জ্বল হচ্ছিল।

যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে যখন ইমাম হুসাইন ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন উমর ইবনে সা'দের একজন সহযোগী যে এ দৃশ্য লক্ষ্য করছিল সে পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে উমর ইবনে সা'দকে বলল, "অনুমতি দাও, ওর জন্য কিছু পানি নিয়ে আসি। এখন তো ও মারাই যাচ্ছে, পানি খেলেও কিছু করতে পারবে না।" উমর ইবনে সা'দ অনুমতি দিলে সে যখন পানি নিয়ে ফিরছিল তখন দেখল পাষণ্ড ও অভিশপ্ত শিমার ইমামের মাথা নিয়ে যাচ্ছে। ঐ ব্যক্তি ইমাম হুসাইন (আ.)-কে দেখার অভিব্যক্তিকে এভাবে বর্ণনা করেছে–

وَ لَقَدْ شَغَلَتِى نُوْرُ وَجْهِهِ عَنِ الْفِكْرَةِ فِى قَتلِهِ

"তাঁর চেহারার নূরে এতটা মোহিত হয়েছিলাম যে, তাঁর নিহত হওয়ার চিন্তা আমার মাথায় আসেনি।"

পূর্ণ মানব সে-ই যার উপর কোন পরিস্থিতিই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না (ক্ষমতা, প্রভাব, দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ কোন অবস্থাতেই সে তার ভারসাম্য ও ব্যক্তিত্বকে হারায় না)। যেমন আলী (আ.) এরূপ এক নমুনা যিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পদ ও মর্যাদার সকল স্তরেই অবস্থান করেছেন; রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের পদ খেলাফত থেকে সর্বনিম্ন পদ শ্রমিকের কাজও তিনি করেছেন। আলী আল ওয়ারদী বলেছেন, "আলী (আ.) কার্ল মার্কসের তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করেছেন। আলীর কুঁড়ে ঘরের জীবনের সঙ্গে (শ্রমিক অবস্থায়) প্রাসাদের জীবনের (খেলাফতের সময়কাল, যদিও প্রকৃতপক্ষে আলী প্রাসাদে বাস করতেন না, তবে পদমর্যাদার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে) কোন পার্থক্য ছিল না। শ্রমিক আলীর চিন্তার সঙ্গে খলিফা আলীর চিন্তার কোন পার্থক্য ছিল না।" এজন্যই আলী (আ.) পূর্ণ মানব।

আলী (আ.)-এর গোপনে দাফন

আমরা কেন আজকে এখানে সমবেত হয়েছি? সমবেত হয়েছি এক পূর্ণ মানব-এর শোক পালন করতে। যেহেতু এ পূর্ণ মানবকে গোপনে দাফন করতে হয়েছে। কেন? কারণ তাঁর যেরূপ পরম বন্ধু রয়েছে সেরূপ পরম শত্রুও রয়েছে। 'আলী (আ.)-এর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ' গ্রন্থে (বাংলায় অনূদিত হয়েছে) আমরা উল্লেখ করেছি এ ধরনের ব্যক্তিরা যেমন প্রচণ্ড আকর্ষণ ক্ষমতার অধিকারী তেমনি বিকর্ষণ ক্ষমতারও। তাঁদের বন্ধুও যেমনি থাকে চরম অন্তরঙ্গ ও উচ্চ পর্যায়ের যারা যে কোন সময়ে তাঁর জন্য প্রাণ দিতে অকুণ্ঠিত তেমনি শত্রুও থাকে যারা তাঁর রক্তের জন্য পিপাসার্ত বিশেষত অভ্যন্ত রীণ ও নিকটতম শত্রু। যেমন খারেজীরা দীনের বাহ্যিক কাঠামোতে বিশ্বাসী ও ঈমানের অধিকারী, কিন্তু দীনের মূল শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ। আলী (আ.) নিজেই বলেছেন, এরা ঈমানদার, কিন্তু অজ্ঞ। তাঁর ভাষায়–

لَا تَقُوْلُوْا الْخَوَارِجَ بَعْدِيْ فَلَيْسَ مِنْ طَلَبِ الْحَقِّ فَأَخْطَاه كَمِنْ طَلَبَ الْبَاطِل فَأَدْرِكَهُ

"খারেজীদের আমার মৃত্যুর পর আর হত্যা করো না, যেহেতু যারা সত্যের সন্ধানী, কিন্তু ভুল করছে তারা যারা অসত্যকে জানার পরও তার অনুসরণ করছে এক সমান নয়।" খারেজীদের সঙ্গে মুয়াবিয়ার অনুসারীদের তুলনা করে বলেছেন, "আমার মৃত্যুর পর এদের হত্যা করো না। এদের সঙ্গে মুয়াবিয়ার অনুসারীদের পার্থক্য রয়েছে, এরা সত্যকে চায়, কিন্তু বোকা (তাই অন্যদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়) ও ভুল করে। কিন্তু মুয়াবিয়াপন্থীরা সত্যকে জেনেই তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত।"

তাই কেন আলীকে এত বন্ধু ও সুহৃদ থাকা সত্ত্বেও রাত্রিতে গোপনে দাফন করা হয়েছে? এই খারেজীদের ভয়ে। যেহেতু তারা বলত আলী মুসলমান নয়, তাই ভয় ছিল তারা জানতে পারলে কবর থেকে তাঁর লাশ বের করে অপমান করত।

ইমাম সাদিক (আ.)-এর সময়ের শেষ দিকে প্রায় শত বছর পর্যন্ত নবী পরিবারের ইমামরা ব্যতীত কেউই জানত না যে, ইমাম আলী (আ.)-কে কোথায় দাফন করা হয়েছে।

একুশে রমযানের ভোরে ইমাম হাসান (আ.) জানাযার আকৃতিতে সাজিয়ে একটি খাটিয়া কিছু ব্যক্তির হাতে দেন মদীনায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যাতে লোকজন মনে করে আলী (আ.)-কে মদীনায় দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শুধু ইমাম আলীর সন্তানগণ ও কিছু সংখ্যক অনুসারী যাঁরা তাঁর দাফনে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা জানতেন তাঁকে কোথায় দাফন করা হয়েছে। বর্তমানে কুফার নিকটে নাজাফে যে স্থানে আলীর সমাধি রয়েছে সেখানে তাঁরা গোপনে যিয়ারতে আসতেন। ইমাম সাদিক (আ.)-এর সময় যখন খারেজীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং আলীর প্রতি অসম্মানের সম্ভাবনা রহিত হয় তখন ইমাম সাদিক তাঁর এক সাহাবী সাফওয়ান (রহ.)-কে সে স্থান চিহ্নিত করে গাছ লাগিয়ে দিতে বলেন। এরপর থেকে সবাই জানতে পারে ইমাম আলীর কবর সেখানে এবং তাঁর ভক্ত ও অনুসারীরা তাঁর কবর যিয়ারত করতে শুরু করে।

যে রাতে আলীকে দাফন করা হয় খুব কম সংখ্যক লোক তাঁর দাফনের সময় উপস্থিত ছিলেন। ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন, সে সাথে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী। তাঁদের মধ্যে সামায়া ইবনে সাওহান যিনি আলী (আ.)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অনুসারী ছিলেন তিনি একজন তুখোর বক্তাও ছিলেন। আলীকে দাফনের সময় তাঁদের অন্তর যেরূপ বিরাগ বেদনায় স্তব্ধ ও কণ্ঠ বায়ুরুদ্ধ হচ্ছিল, সে সাথে মনে অনুভূত হচ্ছিল প্রচণ্ড ক্রোধ। এরূপ অবস্থায় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে যখন সবাই কাঁদছিলেন সামায়া যাঁর হৃদয় প্রচণ্ড কষ্টে মুষড়ে পড়ছিল তিনি কবর থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে মাথা ও সারা শরীরে মাখতে শুরু করলেন। কবরের মাটিকে বুকে চেপে ধরে বললেন,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ, لَقَدْ عِشْتَ سَعِيْدًا وَ مِتَّ سَعِيْدًا

"হে আমীরুল মুমিনীন! আমার পক্ষ থেকে সালাম। আপনি সৌভাগ্যের সাথে জীবন যাপন করেছেন, সৌভাগ্যের সাথেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আপনার সম্পূর্ণ জীবন ছিল সাফল্যমণ্ডিত, আল্লাহ্‌র ঘর কাবায় জন্মগ্রহণ করেছেন, আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদেই শাহাদাত বরণ করেছেন। জীবনের শুরুও

আল্লাহ্‌র ঘরে, জীবনের পরিসমাপ্তিও আল্লাহ্‌র ঘরে। হে আলী! আপনি কতটা মহৎ ছিলেন আর এ মানুষরা কতটা হীন!

যদি এ সপ্রদায় আপনার কথা মতো চলত لاكلوا فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِيْهِمْ তবে আসমান ও তাদের পায়ের নীচে থেকে নেয়ামত বর্ষিত হতো। তারা আখেরাতে ও দুনিয়ার সাফল্য লাভ করত। কিন্তু আফসোস! এ জনগণ আপনার মর্যাদা বোঝেনি। আপনার অনুসরণ না করে বরং আপনাকে কষ্ট দিয়েছে, আপনার হৃদয়কে রক্তাক্ত করেছে। আপনাকে এ অবস্থায় কবরে পাঠিয়েছে।

لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

৬

বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদের পর্যালোচনা

পূর্ণ মানব (বর্তমানের ভাষায় আদর্শ মানব) কে, তা জানা একটি অপরিহার্য বিষয়। ব্যক্তির প্রশিক্ষণ ও চরিত্র গঠনের জন্য প্রতিটি মতাদর্শেই আদর্শ মানবের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়। যেহেতু আমরা ইসলামের পূর্ণ ও আদর্শ মানবের প্রতিকৃতি ও স্বরূপ জানতে চাই সেহেতু প্রচলিত অন্য সব মতবাদের আদর্শ মানবের প্রকৃতির পর্যালোচনার পর এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরব। গত দিনের আলোচনায় বিভিন্ন মতবাদ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি। আজকে আমাদের আলোচনা বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ দিয়ে শুরু করব।

বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদের সার-সংক্ষেপ

প্রাচীন দার্শনিক ভাবনায় মানুষের অস্তিত্বের মূল বিষয় ছিল তার বুদ্ধিবৃত্তি। তাদের মতে মানুষের আমিত্ব হলো তার বুদ্ধিবৃত্তি বা আকল। যেমনভাবে মানবদেহ তার ব্যক্তিত্বের অংশ নয় তেমনিভাবে তার আত্মিক ও মানসিক শক্তি ও ক্ষমতা তার ব্যক্তিত্বের প্রকৃত সত্তা নয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল হলো তার চিন্তা করার শক্তি ও ক্ষমতা। মানুষের প্রকৃত সত্তা হলো যা দ্বারা সে চিন্তা করে।

মানুষ যা দ্বারা চোখে দেখে তা চিন্তার হাতের একটি উপকরণ মাত্র, তেমনি যা দ্বারা কল্পনা করে, যা দ্বারা চায়, যা দ্বারা ভালোবাসে বা মানুষ যে সত্তার কারণে জৈবিক চাহিদার অধিকারী এ সবই চিন্তার সত্তার হাতের একেকটি উপকরণ। মানব সত্তার মৌল উপাদান তার চিন্তাশক্তি। তাই পূর্ণ মানব তিনিই যিনি চিন্তার ক্ষেত্রে পূর্ণতায় পৌঁছেছেন। চিন্তার ক্ষেত্রে পূর্ণতায় পৌঁছার অর্থ বিশ্ব ও অস্তিত্বজগতকে ঠিক যে রূপে আছে সে রূপেই উদ্ঘাটন ও জানা।

এ মতবাদ বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলকে মানব সত্তার মৌল উপাদান বলে জানে। এ ছাড়াও বিশ্বাস করে যে, বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তা-শক্তির দ্বারা বিশ্বকে তার প্রকৃত রূপে উদ্ঘাটন করা সম্ভব। আকল বা বুদ্ধিবৃত্তি অস্তিত্বজগতকে তার আসল রূপে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করার ক্ষমতার অধিকারী। ঠিক আয়নার মত বিশ্বজগৎ তার প্রকৃত রূপ নিয়ে এতে প্রতিফলিত হয়।

ইসলামী দার্শনিক সমাজ যাঁরা এ ধারণাকে গ্রহণ করেছেন তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ও কোরআনের আলোকে ঈমান বলতে বিশ্বকে ঠিক যেমনভাবে আছে তেমনভাবে জানাই বোঝানো হয়েছে। ঈমান অর্থ বিশ্বজগতের স্রষ্টা, বিশ্বে বিরাজমান শৃঙ্খলা, প্রচলিত বিধান, বিশ্বের গতি ও লক্ষ্য এগুলোকে জানা। তাঁরা বলেন, কোরআনে যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস, বিশ্বজগৎ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এ বিষয়ে বিশ্বাস, আল্লাহ্ বিশ্বজগতকে লক্ষ্যহীন ছেড়ে দেননি, বরং

একে হেদায়েত ও পরিচালনা করছেন, যেমন নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষকে হেদায়েত করছেন তা জানা, সব কিছু আল্লাহ্ থেকে এসেছে এবং তাঁর প্রতিই প্রত্যাবর্তনকারী প্রভৃতি– এ বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হলো বিশ্বজগতকে তার প্রকৃতরূপে জানা। তাঁরা ঈমানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ঈমান পরিচিতি-জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ব্যতীত কিছু নয়। অবশ্য তাঁদের এ প্রজ্ঞা বা পরিচিতি জ্ঞানের অর্থ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা আংশিক জ্ঞান নয়, বরং এ জ্ঞান ও পরিচয় দার্শনিক ও প্রজ্ঞাগত। দার্শনিক পরিচিতি ও জ্ঞানের অর্থ বিশ্বের উৎপত্তি ও পরিসমাপ্তি, অস্তিত্বের ধারা ও পর্যায়কে সামগ্রিকভাবে জানা ও উদ্ঘাটন করা।

এ মতাদর্শের বিপরীত মতবাদ

এ মতাদর্শ যা বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ বলে আমরা উল্লেখ করেছি এর বিপরীতে বেশ কিছু মতবাদ রয়েছে যে মতবাদগুলো এ মতবাদের বিরোধী ও সমালোচক। মুসলিম বিশ্বে প্রথম যে মতবাদটি এ মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে সেটা হলো এশরাকী, সূফী ও খোদাপ্রেম মতবাদ। এরপর রয়েছে আহ্লে হাদীসের অনুসারীরা। শিয়াদের মধ্যে আখবারী এবং সুন্নীদের মধ্যে হাম্বলী ও আহ্লে হাদীস দার্শনিকদের বিপরীতে আকলকে অস্বীকার করেছে। তাঁরা বলছেন, দার্শনিকরা আকল বা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারে যত বেশি গুরুত্ব দেয় আকলের গুরুত্ব এত অধিক নয়।

এদের থেকেও ইন্দ্রিয়বাদীরা বর্তমান সময়ে বুদ্ধিবৃত্তির চরম সমালোচক। বিগত তিন-চার শতক ধরে ইন্দ্রিয়বাদীদের জয়-জয়কার। তাদের মতে বুদ্ধিবৃত্তিকে যতটা মূল্য দেয়া হয় তা ততটা মূল্যের অধিকারী নয়। আকলের তেমন কোন গুরুত্ব নেই, বরং আকল ইন্দ্রিয়ের অনুগত। মানবের মূল তার ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতিসমূহ। আকল খুব বেশি হলে যা করতে পারে তা হলো ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের উপর কাজ করা। যেমন কোন কারখানাকে যদি আমাদের বিবেচনায় আনি, সেখানে যেরূপ কাঁচামাল প্রবেশ করে তৎপর কারখানার মেশিনের মধ্যে তা মিশ্রিত বা বিভাজিত হয়, উদাহরণস্বরূপ কাপড় বুনন কারখানায় প্রথমে তুলা থেকে সুতা বের করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে বুননের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কাপড়ের আকৃতি দেয়া হয়। তেমনি আকল মেশিনের মতো শুধু ইনিদ্রয়লব্ধ কাঁচামালকে ব্যবহার করে নির্দিষ্ট আকৃতি দেয়। তবে বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ তার নিজের স্থানে এখনও অটল। এখানে আমরা অবশ্য সে বিষয়ে আলোচনা করব না, বরং এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

ইসলামে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচয়ের (মারেফাত) মৌলিকত্ব

বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদে কয়েকটি বিষয় আছে যার প্রতিটিকে যাচাই করে দেখব যে, সেগুলো ইসলামের সঙ্গে সংগতিশীল কিনা। প্রথম বিষয় বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচিতি ও জ্ঞানের মৌলিকত্ব। বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচিতি ও জ্ঞানের অর্থ হলো আকল বা বুদ্ধিবৃত্তি বিশ্বের বাস্তবতাকে আবিষ্কার করার ক্ষমতা রাখে এবং এ জ্ঞান ও পরিচিতি মৌলিক, নির্ভরযোগ্য ও যুক্তিপূর্ণ।

অনেক মতবাদই বুদ্ধিবৃত্তির এরূপ ক্ষমতা ও যোগ্যতায় বিশ্বাসী নয়। এখন আমরা দেখব ইসলামী উৎসগুলো থেকে আমাদের নিকট এ ধরনের দলিল-প্রমাণ রয়েছে কিনা যে, বুদ্ধিবৃত্তির এরূপ ক্ষমতায় আমরা বিশ্বাসী হতে পারি। ঘটনাক্রমে আমাদের হাতে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত দলিল রয়েছে যাতে আমরা

বলতে পারি ইসলামের মতো কোন মতাদর্শেই আকলকে এত অধিক পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়নি বা প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে আকলকে অন্য কোন ধর্মেই ইসলামের মতো গুরুত্ব দেয়া হয়নি। আপনি খ্রিষ্টধর্মকে ইসলামের সঙ্গে তুলনা করে দেখুন খ্রিষ্টধর্ম ঈমানের গণ্ডীতে আকলের প্রবেশের বিরোধী। তাদের মতে মানুষ যখন কোন কিছুর উপর ঈমান আনবে তখন এর উপর চিন্তা করার অধিকার তার নেই। চিন্তা যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তির কাজ তাই বিশ্বাসগত বিষয়ে চিন্তার অবকাশ নেই। যে বিষয়ে ঈমান রাখতে হবে সে বিষয়ে চিন্তা করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে আকলকে 'কি' ও 'কেন' এ ধরনের প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া যাবে না। একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি, বিশেষত ঈমানের রক্ষক চার্চের অধিপতির দায়িত্ব হলো ঈমানের গণ্ডিতে যুক্তি, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রবেশকে প্রতিহত করা। মূলত খ্রিষ্টবাদের শিক্ষা এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

ইসলামের ক্ষেত্রে আমরা ঠিক এর বিপরীত অবস্থা দেখি। ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়ে (উসূল) বুদ্ধিবৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছুর প্রবেশ নিষিদ্ধ। যেমন যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় আপনার ধর্মের একটি মৌলিক বিষয় বলুন। আপনি হয়তো বললেন, তাওহীদ (একত্ববাদ)। এখন যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয়, কেন আপনি এক আল্লাহ্য় ঈমান এনেছেন? আপনাকে অবশ্যই এজন্য যুক্তি পেশ করতে হবে যেহেতু ইসলাম আকল ব্যতীত আপনার নিকট থেকে তা গ্রহণ করবে না। যদি বলেন, "আমি এক আল্লাহ্য় বিশ্বাস করি, কিন্তু এর পেছনে কোন যুক্তি পেশ করতে পারব না। আমার দাদীমার থেকে শুনে আমি বিশ্বাস করেছি। অবশেষে এক সত্যে পৌঁছেছি যেভাবেই হোক দাদীমার কাছে শুনে অথবা স্বপ্ন দেখে।" ইসলাম বলে, "না, যদিও এক আল্লাহ্য় বিশ্বাসী হও, কিন্তু এ বিশ্বাসের ভিত্তি স্বপ্ন বা পিতা-মাতার অন্ধ অনুকরণ অথবা পরিবেশের প্রভাবে হয়ে থাকে, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।" কেবল চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণের পর যুক্তির ভিত্তিতে যদি আপনি ঈমান আনয়ন করেন তবেই তা গ্রহণ করা হবে নতুবা নয়।

খ্রিষ্টবাদে ঈমানের গণ্ডিতে আকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এটাই খ্রিষ্টবাদের ভিত্তি। একজন খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তির দায়িত্ব হলো এই গণ্ডিতে আকল ও চিন্তার প্রবেশকে রোধ করা। ইসলামে ঈমানের গণ্ডিতে আকলের স্থান সংরক্ষিত। আকল ব্যতীত অন্য কোন কিছুর এ গণ্ডিতে প্রবেশাধিকার নেই।

ইসলামের উৎসসমূহে অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহ্য় আকলকে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন দেখা যায়। প্রথমত কোরআন সব সময়ই বুদ্ধিবৃত্তির প্রশংসা করেছে। তদুপরি আমাদের হাদীস গ্রন্থসমূহেও বুদ্ধিবৃত্তির গুরুত্ব ও মৌলিকত্ব এতটা প্রকট যে, এ গ্রন্থসমূহ খুললেই দেখা যায়, তাতে প্রথম অধ্যায় হিসেবে কিতাবুল আকল এসেছে এবং এ অধ্যায়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তির পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে।

ইমাম মূসা ইবনে জাফর (আ.) আকল সম্পর্কিত একটা আশ্চর্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্পাকের দু'টি হুজ্জাত (দলিল) রয়েছে। এ দু'টি হুজ্জাত দু'টি নবী। একটি অভ্যন্তরীণ নবী বা আকল, দ্বিতীয়টি বাহ্যিক নবী অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষগণ যাঁরা নিজেরা মানুষ এবং অন্য মানুষদের দীনের দিকে দাওয়াত করেন। আল্লাহ্পাকের এ দু'টি হুজ্জাত একে অপরের পরিপূরক অর্থাৎ যদি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি থাকে, কিন্তু পৃথিবীতে কোন নবী প্রেরিত না হয়, তবে মানুষের পক্ষে সফলতার

পথ অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। তেমনি যদি নবী থাকেন, কিন্তু মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী না হয় তাহলেও সে সাফল্য লাভ করতে পারবে না। আকল ও নবী একসঙ্গে একই দায়িত্ব পালন করে।" এর চেয়ে উত্তমরূপে আকলকে সম্মানিত করা ও পৃষ্ঠপোষকতা দান আর কোনভাবে সম্ভব কি?

এ ধরনের বর্ণনা ও রেওয়ায়েত সম্ভবত আরো শুনে থাকবেন। যেমন 'জ্ঞানীর নিদ্রা অজ্ঞের ইবাদত হতে উত্তম', 'জ্ঞানীর খাদ্যগ্রহণ মূর্খের রোযা অপেক্ষা উত্তম', 'জ্ঞানীর নিরবতা অজ্ঞের কথা বলা হতে শ্রেয়', 'আল্লাহ্ কোন নবীকেই প্রেরণ করেননি এ অবস্থার পূর্বে যে, তাঁর আকল পূর্ণতায় পৌঁছায় ও সমগ্র উম্মত থেকে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি উচ্চতর হয়' ইত্যাদি। আমরা রাসূল (সা.)-কে বুদ্ধিবৃত্তির সমগ্র রূপ বলে জানি। আমাদের এ ধারণা খ্রিষ্টবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যশীল। যেহেতু তারা বুদ্ধিবৃত্তি থেকে দীনকে পৃথক বলে জানে। কিন্তু আমরা আমাদের নবীকে আকলের পরিপূর্ণ রূপ মনে করি।

সুতরাং পরিচিতিজ্ঞান ও প্রামাণ্যের ক্ষেত্রে আমরা আকলকে দলিল বলে জানি এ অর্থে যে, বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান ও পরিচয় লাভ সম্ভব। দার্শনিকদের এ দৃষ্টিভঙ্গিকে ইসলাম সমর্থন করে।

বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদের দু'টি ত্রুটি

দার্শনিক মতে মানুষের প্রকৃত সত্তা হলো তার বুদ্ধিবৃত্তি। এ ছাড়া বাকী যা আছে সেগুলো অপ্রধান এবং এগুলো মাধ্যম বৈ কিছু নয়। শরীর আকলের জন্য যেমনি একটি মাধ্যম, তেমনি চোখ, কান, ধারণক্ষমতা, কল্পনাশক্তি ও অন্য যে সকল যোগ্যতা আমাদের মধ্যে বর্তমান সেগুলোও আমাদের মূল সত্তা আকলের একেকটি মাধ্যম।

এখন প্রশ্ন হলো এ বক্তব্যের পক্ষে কোন দলিল ইসলামে রয়েছে কি? না, এ ধরনের বক্তব্য যে, আমাদের মূল সত্তা শুধু আকল– এর সপক্ষে কোন দলিল বা প্রমাণ ইসলামে নেই। ইসলাম এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে যে, আকল মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের একটি অংশ, তার সমগ্র অস্তিত্ব নয়।

দ্বিতীয় বিষয় হলো আমাদের অধিকাংশ দর্শনের গ্রন্থে ইসলামের ঈমানকে শুধু পরিচিতিজ্ঞান বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তাঁরা বলছেন, ইসলামে ঈমানের অর্থ বাস্তব পরিচিতি বা জ্ঞান। আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের অর্থ আল্লাহ্র পরিচয়, তদ্রূপ রাসূল (সা.)-কে জানা। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান অর্থ ফেরেশতাদের পরিচয় লাভ, আখেরাতের প্রতি ঈমানের অর্থ আখেরাতের পরিচয় জানা। কোরআনে যেখানেই ঈমান এসেছে এর অর্থ বাস্তব জ্ঞান ও পরিচিতি ছাড়া আর কিছু নয়। এ বিষয়টি কোনক্রমেই ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। ইসলামে ঈমানের অর্থ শুধু পরিচিতি নয়, বরং এর চেয়ে বেশি কিছু। পরিচিতি অর্থ হলো জানা। যিনি পানিবিজ্ঞানী তিনি পানিকে চেনেন। যিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী তিনি জ্যোতিষ্ক সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, তদ্রূপ যিনি সমাজবিজ্ঞানী তিনি জানেন সমাজকে, যিনি মনোবিজ্ঞানী তিনি মনকে বোঝেন, যিনি প্রাণীবিজ্ঞানী তিনি প্রাণীদের সম্পর্কে জানেন অর্থাৎ এঁরা সবাই নিজেদের সম্পৃক্ত বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন। ঈমানও কি কোরআনে এরূপ জানা অর্থেই এসেছে? আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের অর্থ কি শুধুই তাঁকে বোঝা ও অনুভব করা? না, এমন নয়। এটা ঠিক যে, পরিচয় লাভ ঈমানের শর্ত ও অংশ। পরিচিতি ব্যতীত ঈমান অর্থহীন, এটা সত্য, কিন্তু শুধু জানাও ঈমান নয়।

ঈমান এক প্রবণতা যার মধ্যে আনুগত্যের প্রবণতা রয়েছে, প্রেম ও ভালবাসার প্রবণতা রয়েছে, স্রষ্টার প্রতি আত্মনিবেদনের প্রবণতা রযেছে, কিন্তু পরিচিতির মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা অনুপস্থিত।

একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন– এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি জ্যোতিষ্কসমূহের প্রতি অনুরক্ত। তদ্রূপ একজন খনিজবিজ্ঞানী বা পানিবিজ্ঞানী– এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি খনিজ বা পানির আসক্ত। বরং এ ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে যে, মানুষ কোন বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, কিন্তু তা থেকে বিতৃষ্ণ। বিশেষত রাজনীতিতে শত্রুকে মানুষ নিজের থেকেও ভালোভাবে চেনে। উদাহরণস্বরূপ কোন ইসরাইলী হয়তো আরব ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ; হয়তো ইসলাম সম্পর্কেও তার জ্ঞান অত্যন্ত গভীর। ইসরাইলে মিশর, সিরিয়া, আলজেরিয়া বা ইরান বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মুসলমানদের মধ্যকার এরূপ বিশেষজ্ঞ অপেক্ষা অনেক বেশি এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এখন প্রশ্ন হলো এরূপ মিশর বিষয়ক ইসরাইলী বিশেষজ্ঞ কি মিশরের প্রতি আনুগত্যশীল? কখনই নয়। তদ্রূপ মিশরে কোন ইসরাইল বিষয়ক বিশেষজ্ঞ থাকতে পারেন। কিন্তু তাই বলে তো তিনি ইসরাইলের প্রতি অনুরক্ত নন, বরং তিনি হয়তো ইসরাইলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। (যেহেতু ইসরাইল আরবদের প্রতি শত্রুপরায়ণ সেহেতু আরবরাও তাদের প্রতি সন্দেহ পরায়ণ।)

ইসলামী আলেম সমাজ যে বলেন, ঈমান অর্থ শুধু পরিচয় জ্ঞান নয় (যা দর্শন দাবি করে)– এর সপক্ষে সর্বোত্তম প্রমাণ খোদ কোরআন। যেহেতু কোরআন ঐ সকল ব্যক্তিকে আমাদের নিকট পরিচিত করিয়েছে যারা আল্লাহ্পাককে সবচেয়ে উত্তমরূপে চেনে, সে সকল নবী ও আউলিয়াকেও উত্তমরূপে চেনে, কিয়ামতকেও ভালোভাবে জানে, কিন্তু ঈমানদার নয় বরং কাফের। যেমন শয়তান। শয়তান কি আল্লাহ্কে চেনে না? শয়তান তো বস্তুবাদীদের মতো নয় যে, আল্লাহ্কে চেনে না, বরং সে আল্লাহ্কে চেনে, কিন্তু আল্লাহ্পাকের বিরোধী। শয়তান আমার বা আপনার থেকে অনেক ভালোভাবে আল্লাহ্কে চেনে। কয়েক হাজার বছর সে আল্লাহ্র ইবাদত করেছে। কোরআন আমাদের বলছে, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আন এবং আমরাও ঈমান এনেছি। কিন্তু শয়তান কি ফেরেশতাদের চেনে না? না বরং সে ফেরেশতাদের চেনে, তাদের সঙ্গে সহস্র বছর এক সঙ্গে ছিল, আমাদের তুলনায় হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে সে উত্তমরূপে জানে। নবীদেরও তদ্রূপ খুব ভালোভাবে চেনে ও জানে। কিয়ামত সম্পর্কে আরো উত্তমরূপে জানে (এ কারণেই আল্লাহ্র নিকট কিয়ামত পর্যন্ত সময় চেয়েছে)। কিন্তু এত কিছু জানার পরেও কেন কোরআন তাকে কাফের বলে সম্বোধন করছে? কেন বলছে, "সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত"? (সূরা সোয়াদ : ৭৪)

যদি ঈমান (যেরূপ দর্শন বলছে) শুধু 'পরিচয়' হতো, তবে শয়তান প্রথম মুমিন বলে পরিচিত হতো। কিন্তু পরিচয়-জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে মুমিন নয়। কারণ সে অস্বীকারকারী জ্ঞানী অর্থাৎ যদিও সে সত্যকে জানে তদুপরি তার বিরোধীতা করে এবং সেটার প্রতি আনুগত্যশীল নয়। সে এ সত্যের প্রতি রুজু করে না বা তার প্রতি ভালোবাসাও অনুভব করে না। ফলশ্রুতিতে সে দিকে সে ধাবিতও হয় না।

সুতরাং ঈমান কেবল 'পরিচয়' নয়। এ জন্যই অনেক প্রজ্ঞাবান দার্শনিক সূরা ত্বীন-এর لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ, إِلا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ–এ আয়াতের

তাফসীর এভাবে করেছেন যে, إِلا الَّذِيْنَ آمَنُوْا অর্থাৎ তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা ও عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রজ্ঞা। এটা ঠিক নয়। إِلا الَّذِيْنَ آمَنُوْا -এর মধ্যে তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা অপেক্ষা উচ্চতর অর্থ নিহিত রয়েছে। তবে তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা তার অংশ ও ভিত্তি হলেও প্রজ্ঞা, অনুধাবন, জ্ঞান, পরিচয় ও জানাই পূর্ণ ঈমান নয়, বরং ঈমান পরিচয় ও জ্ঞান থেকে বড় অন্য কিছু।

এখানে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যে তিনটি বিষয় তুলে ধরেছি। প্রথমত আকল প্রামাণ্য দলিল, আকল দ্বারা গৃহীত বিষয় বিশ্বাসযোগ্য এবং আকল বা বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে সঠিক পরিচয় লাভ সম্ভব– এ বিষয়গুলো সত্য এবং ইসলাম তা গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত আকল মানুষের একক মূলসত্তা– ইসলাম এটাকে গ্রহণ করে না। তৃতীয়ত ঈমানের অর্থ বুদ্ধিবৃত্তিক অনুধাবন, জানা ও পরিচয় লাভ ব্যতীত অন্যকিছু নয়– ইসলামের দৃষ্টিতে এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

ঈমানের মৌলিকত্ব

ঈমান ও পরিচয়কে একই জানি অথবা পরিচয়কে ঈমানের একাংশ জানি, এখন যে বিষয়টি আমাদের নিকট লক্ষণীয় তা হলো ঈমান ও পরিচিতির মৌলিকত্ব রয়েছে কি? নাকি মৌলিকত্ব নেই বরং এ দু'টি আমলের (কার্যের) পূর্বশর্ত মাত্র। এ ক্ষেত্রেও দু'টি বড় মতাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ঈমানের মৌলিকত্বের অর্থ কি? এর অর্থ ইসলাম যেভাবে ঈমানকে আমাদের জন্য বর্ণনা করেছে তা এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, ঈমান মানুষের আমলের বিশ্বাসগত ভিত্তি। অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীতে অবশ্যই চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাবে এবং কাজ করবে এবং এ চেষ্টা ও কার্যক্রম এক বিশেষ পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি অনুযায়ী হতে হবে যার ভিত্তি বিশেষ চিন্তা ও বিশ্বাস থেকে উৎসারিত। অন্যভাবে বর্ণনা করলে যেহেতু মানুষ চায় বা না চায় তার সকল কর্মকাণ্ড চিন্তাগত এবং যদি সে তার ব্যবহারিক জীবনে নিজের উদ্দেশ্যে পৌঁছতে সঠিক একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে চায় তবে তা চিন্তা ও বিশ্বাসের বিশেষ ভিত্তি ব্যতীত সম্ভব নয়। এ কারণেই তাকে চিন্তা ও বিশ্বাসের একটি ভিত্তি দিতে হবে যাতে তার উপর ভিত্তি করে সে তার চিন্তার কাঠামো নির্মাণ করতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি একটি দালান নির্মাণ করতে চায় তাহলে তার লক্ষ্য চার দেয়াল, ছাদ, দরজা-জানালা বিশিষ্ট ঘর নির্মাণ করা, কিন্তু সে এগুলো নির্মাণের পূর্বে ভিত্তি বা স্তম্ভ তৈরি করে যার বেশ কিছু অংশ মাটির নীচে গ্রোথিত করে যদিও এটি তার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু সে এটা করে যাতে করে দালানের ভিত্তি মজবুত হয় এবং তা ভেঙ্গে না পড়ে। এজন্যই ভিত্তি নির্মাণ করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ কমিউনিজম কতগুলো চিন্তা ও বিশ্বাসের সমষ্টি যার ভিত্তি বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং নৈতিকতা সম্পর্কিত মৌলিক কাঠামোটি বস্তুবাদের মৌলিক চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তির উপর নির্মিত হয়েছে। কিন্তু একজন কমিউনিস্টের এটা লক্ষ্য নয় অর্থাৎ বস্তুবাদ তার লক্ষ্যও নয় এবং তার নিকট এর মৌলিকত্বেরও মূল্য নেই। (প্রকৃতপক্ষে যাঁরা বস্তুবাদের ফাঁদে পা দিয়েছেন তা গীর্জাসমূহের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাসমূহ, বিশেষত স্বাধীন চিন্তার বিরুদ্ধে যুক্তিহীন দ্বন্দ্বের কারণে। যার ফলে ইউরোপে এ চিন্তার উদ্ভব ঘটেছিল যে, হয় মানুষ

স্বাধীন হয়ে সমাজে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ঈশ্বরকে দূরে ছুঁড়ে ফেলুক নতুবা নিজেকে অধিকারহীন ও বন্দি বলে জানুক। এর জন্য সর্বোত্তম পথ হিসেবে ধর্মের মূলোৎপাটনকে গ্রহণ করেছিল।)

কিন্তু সে চিন্তা করে (ভুল চিন্তা করে) বস্তবাদ ব্যতীত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মৌল চিন্তাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আর তা ব্যাখ্যা করার জন্যই বস্তবাদের মৌলিক চিন্তাকে গ্রহণ করে। সম্প্রতি পৃথিবীতে কয়েকজন কমিউনিস্ট ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে যাঁরা বস্তুবাদকে কমিউনিজম থেকে পৃথক মনে করেন। তাঁরা বলেন, "আমাদের জন্য বস্তুবাদ কোন মৌলিকত্ব তো রাখেই না, বরং বস্তুবাদকে এক অখণ্ডনীয় মৌলনীতি হিসেবে গ্রহণ করার কোন প্রয়োজনই নেই। আমরা কমিউনিজম চাই যদিও তাতে বস্তুবাদের অস্তিত্ব না থাকে।" বর্তমানে পৃথিবীর আনাচে কানাচে অনেক কমিউনিস্ট নেতাই ধর্মের সঙ্গে দ্বন্দ্বের বিষয়টি পরিহার করার কথা বলছেন।

এটা এ কারণে যে, তাঁদের জন্য এ মৌল চিন্তার প্রতি বিশ্বাসের কোন মৌলিকত্ব নেই। এটা শুধু চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তি ব্যতীত কিছু নয়। যেহেতু জীবনাদর্শ (ওফবড়ষড়মু) বিশ্বদৃষ্টি ব্যতীত সম্ভব নয় সেহেতু এ বিশ্বদৃষ্টিকে (বস্তুবাদ) দালানের নীচে স্থাপন করা হয় যাতে করে জীবনাদর্শ স্থাপিত ও অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো জীবনাদর্শ।

কিন্তু ইসলামে কিরূপ? ইসলাম কি ইসলামী বিশ্বাস, যেমন আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস, নবী ও ওলীদের প্রতি বিশ্বাস, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস এগুলোকে শুধু এজন্য বর্ণনা করেছে যে, চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হবে? ইসলাম কি এজন্য এ মৌল চিন্তাসমূহকে উপস্থাপন করেছে যাতে করে জীবনাদর্শকে এ মৌল চিন্তার উপর ভিত্তি করে স্থাপন করতে পারে এবং এটাই (জীবনাদর্শই) তার উদ্দেশ্য? যদি তা-ই হয় তবে এ মৌল চিন্তার (ঈমান) কোন মৌলিকত্ব নেই। না, এমনটি নয়। এ মৌল চিন্তা ইসলামী জীবনাদর্শিক (ওফবড়ষড়মু) চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তি বটে, তবে তার মূল্য শুধু ভিত্তি হিসেবে নয়। ইসলামের ঈমান চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তি এবং ইসলামী জীবনাদর্শ এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু ঈমান ভিত্তি হিসেবে মূল্য ছাড়াও মৌলিকত্বের অধিকারী ও লক্ষ্য হিসেবেও পরিগণিত।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক যে, ঈমান শুধু আমলের পূর্বশর্ত হিসেবে নয় বরং এর মৌলিকত্বের কারণে মূল্যের অধিকারী। এ রকম নয় যে, শুধু কর্ম ও প্রচেষ্টাই সব কিছু। বরং যদি আমল থেকে ঈমানকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, একটি ভিত্তিকে নষ্ট করা হলো। তেমনিভাবে যদি আমলকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় অন্য স্তম্ভটি ধ্বংস করা হলো। এজন্যই কোরআন সব সময় বলেছে, إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ "যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে।" যদি আমলহীন ঈমান হয়, তবে সাফল্যের একটি স্তম্ভ আছে অন্যটি অনুপস্থিত। অপর দিকে ঈমানহীন আমলও তদ্রূপ। সাফল্যের তাঁবু একটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমানের সত্তাগত মূল্য ও মৌলিকত্ব রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের পূর্ণতা এ পৃথিবীতে এবং বিশেষত আখেরাতে এটাই যে, সে ঈমানের অধিকারী। কারণ ইসলামে আত্মা স্বাধীন এবং নিজে পূর্ণতার অধিকারী– তার মৃত্যু নেই। যদি আত্মা

(ঈমানের মাধ্যমে) পূর্ণতায় না পৌঁছায়, অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত হয় তাহলে কখনই সফলতায় পৌঁছতে পারে না।

কোরআন ও নাহজুল বালাগাহ্ থেকে এর সপক্ষে দলিল

কোরআন এ বিষয়ে বলছে,

وَ مَنْ كَانَ فِى هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِى الآخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيْلاً

"যে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে অন্ধ, আখেরাতেও সে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।" (সূরা ইসরা : ৭২)

ইমামগণ এবং অন্যান্য মুফাস্সিরও এর তাফসীরে বলেছেন, এর অর্থ এমন নয় যে, কারো বাহ্যিক এ চক্ষু পৃথিবীতে অন্ধ হলে আখেরাতেও সে অন্ধ থাকবে। যদি এরূপ হতো, তবে আবু বাসির যিনি ইমাম সাদিক (আ.)-এর একজন অন্ধ সাহাবী ছিলেন তিনি পরকালীন দুনিয়াতেও শোচনীয় অবস্থায় পড়বেন। না, বরং এর অর্থ হলো যে, কারো অন্তর্চক্ষু যদি সত্যকে, তার স্রষ্টাকে, মহান আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী এবং অন্যান্য যে সব বিষয়ে ঈমান বা বিশ্বাস থাকা উচিত তা থেকে অন্ধ হয়, তবে সে আখেরাতে অন্ধ হিসেবে পুনরুত্থিত হবে, এর অন্যথা সম্ভব নয়। যদি ধরে নিই, এ পৃথিবীতে একজন মানুষ যত প্রকার ভালো কাজ করা সম্ভব তা করে, সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধের দায়িত্ব পালন করে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দুনিয়াবিরাগী ব্যক্তির ন্যায় জীবন যাপন করে, সে সাথে নিজের জীবনকে আল্লাহ্র সৃষ্টির জন্য নিবেদিত করে, কিন্তু আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে না, পরকাল ও ইহকালকে চেনে না– এরূপ ব্যক্তি অন্ধ, তাই পরকালীন দুনিয়াতেও সে অন্ধ।

সুতরাং এটা ঠিক নয় যে, ঈমান শুধু চেষ্টা-প্রচেষ্টার পূর্ব প্রস্তুতি এবং ব্যক্তির আমল ঠিক হলেই চলবে, ঈমানের প্রয়োজন নেই। এ ধরনের কথা অর্থহীন। ফখরে রাজী বলেন,

"আশংকা আমার চলে যাব বিশ্বের প্রাণ না দেখে
চলে যাব বিশ্ব ছেড়ে বিশ্বকে না দেখে
দেহের বিশ্ব ছেড়ে যাব মনের বিশ্বে ও প্রাণে
দেহের বিশ্বে মনের বিশ্ব না দেখেই তাঁর পানে।"

অর্থাৎ আমার আশংকা এটি যে, এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব, অথচ তা এ বিশ্বকে না দেখেই। তাঁর এ কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, বিশ্ব বলতে পৃথিবীর মাটি, পাহাড়, সমুদ্র, তারকারাজি আর ঘরবাড়ি বোঝাচ্ছেন এবং এ সব না দেখেই চলে যাওয়ার জন্য চিন্তিত, বরং তাঁর আশংকা হলো এখানে যে, তাঁর অন্তর্চক্ষু উন্মোচিত যদি না হয় তবে বিশ্বের প্রাণ, এর উৎস ও সৃষ্টিকর্তাকে অনুধাবন– যাকে ইসলাম ঈমান বলেছে তা না করেই এ বিশ্ব ছেড়ে চলে যাবেন। তিনি বলছেন, যদি এ দেহের বিশ্বে মনের বিশ্বকে অনুভব না করি, তবে কিরূপে যখন দেহের বিশ্ব ছেড়ে প্রাণ ও মনের বিশ্বে গমন করব তা অনুভব করব? যেখানে সম্ভব ছিল সেখানেই পারিনি, তাই আফসোস। এ দু'টি পঙ্ক্তিতে কোরআনের وَ مَنْ كَانَ فِى هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِى الآخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيْلاً এ আয়াতেরই অর্থ করেছেন।

কোরআন অন্য একটি আয়াতে বলছে,

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِى أَعْمَى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى

(সূরা ত্বাহা : ১২৫-১২৬)

কিয়ামতের দিন যে বান্দাকে অন্ধ হিসেবে পুনরুত্থিত করা হবে সে প্রতিবাদ করে বলবে, "প্রভু! কেন আমাকে অন্ধ করে পুনরুত্থিত করেছেন? আমি ঐ পৃথিবীতে চক্ষুষ্মান ছিলাম, কিন্তু কেন আমি এখানে অন্ধ? তার প্রতি বলা হবে, ঐ পৃথিবীতে তুমি যে চক্ষুর অধিকারী ছিলে তা এখানের জন্য প্রযোজ্য নয়। এখানে অন্য রকম চক্ষুর প্রয়োজন। তোমার যে চক্ষু ছিল তা নিজেই অন্ধ করেছ তাই তুমি এখানে অন্ধ।" أَتتك آيَاتُنَا আমাদের নিদর্শনসমূহ এ পৃথিবীতে ছিল, তুমি এ নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে আমাদের দেখা, অনুধাবন এবং সত্যকে উদ্ঘাটনের পরিবর্তে সেখানে নিজেকে অন্ধ করে রেখেছিলে। সেজন্যই প্রকৃত বিশ্বে এসে অন্ধ হিসেবে পুনরুত্থিত হয়েছ।

সূরা মুতাফ্ফিফীন বলছে,

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوْبُوْنَ

"কখনই নয়, নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রতিপালক হতে সেদিন পর্দাবৃত থাকবে।" (সূরা মুতাফ্ফিফীন : ১৫) অর্থাৎ এদের পরিত্যাগ কর। এদের উচিত ছিল পৃথিবীতে তাদের চক্ষুর সম্মুখ হতে গাফিলতির পর্দা উন্মোচন করা ও দেখা। ঈমানের অর্থ এটাই– হে মানুষ! তুমি এ পৃথিবীতে আগমন করেছ যাতে এ পৃথিবীতেই চক্ষুর মাধ্যমে ঐ পৃথিবীকে দেখতে ও কর্ণের মাধ্যমে ঐ পৃথিবীকে শ্রবণ কর।

আমি সব সময়ই এজন্য আনন্দিত যে, আমাদের যুবকরা বিশেষ করে নাহজুল বালাগার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করছে। নাহজুল বালাগার বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। দেখবে নাহজুল বালাগাহ্ এরূপ চক্ষু ও কর্ণ সম্পর্কে কি বলে।

নাহজুল বালাগাহ্ ঈমানের ক্ষেত্রে মৌলিকত্বে বিশ্বাসী। ঈমানের মূল্য শুধু চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে নয়, বরং চিন্তা ও ভিত্তি ছাড়াও মৌলিক হিসেবে নাহজুল বালাগাহ্ ঈমানকে উল্লেখ করেছে।

আলী (আ.) নাহজুল বালাগায় আল্লাহ্র বিশেষ বান্দাদের (আহ্লুল্লাহ্) সম্পর্কে বলেন,

يَتَنَسَّمُوْنَ بِدُعَائِهِ روحَ التجَاوُز

"এরা এমন বান্দা যে, যখন তারা দোয়া করে ও তওবায় নিমজ্জিত হয় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির সমীরণ নিজেদের মধ্যে অনুভব করে।"

আলী (আ.) আরো বলেন,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الذِّكْرَ جِلاءً لِلْقُلُوْبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعدَ الوقرة وَ تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَةِ وَ تَنقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمَعَانَدَةِ وَ مَا بَرِحَ لِلَّه عَزَّتْ الاَؤُهُ فِى الْبُرْهَةِ بَعْدَ الْبُرْهَةِ وَ فِى أَزْمَان الفَتَرَتِ عِبَادٌ نَاجَاهُمْ فِى فِكْرِهِمْ و كَلَّمَهُمْ فِى ذَاتِ عُقُوْلِهِمْ

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ তাঁর স্মরণকে মানুষের আত্মার উজ্জ্বলতার কারণস্বরূপ করেছেন, যে কারণে (আত্মার স্বচ্ছতার কারণে) সে বধিরতার পর শ্রবণশক্তি, অন্ধত্বের পর দৃষ্টিশক্তি লাভ করে এবং নাফরমানীর পর আনুগত্যের পথ গ্রহণ করে, সকল অবস্থায় অফুরন্ত নেয়ামত দানকারী আল্লাহ্র জন্য নিজেকে নিবেদিত করে। সকল কালেই একদল ব্যক্তি রয়েছে যাদের চিন্তার মাধ্যমে আল্লাহ্ গোপন রহস্যের ভেদ উন্মোচন করেন। আর আকলের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে কথা বলেন।" (নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ২২২)

সুতরাং আমি এখানে যে বিষয়টি বলতে চাই তা হলো আল্লাহ্র পরিচয় জানা, তাঁর ফেরেশতাদের পরিচয় জানা (যাঁরা অস্তিত্বজগতের জন্য মাধ্যম), তাঁর প্রেরিত নবী ও আউলিয়াগণের পরিচয় জানা (যাঁরা অন্য একভাবে আল্লাহ্র নেয়ামত সৃষ্টির নিকট পৌঁছানোর মাধ্যম), আমাদের এ পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্যকে জানা, আখেরাত ও আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যাবর্তনকে জানা এ সবই মৌলিক। সত্যের প্রতি ঈমান যেমন মৌলিক তেমনি তা চিন্তা, বিশ্বাস ও ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিও বটে। কেবল একশ' ভাগ মৌলিক এরূপ কোন ঈমানই পারে একটি জীবনাদর্শের জন্য সর্বোত্তম চিন্তা ও বিশ্বাসগত ভিত্তি হতে। সুতরাং কখনই আমলের জন্য যেমন ঈমানকে বিসর্জন দেয়া যুক্তিযুক্ত নয় তেমনি ঈমানের জন্য আমলকে বিসর্জন দেয়াও অযৌক্তিক। এদের কোনটিকেই অন্যটির জন্য বিসর্জন দেয়া যাবে না।

সুতরাং দর্শনের পূর্ণ মানব, পূর্ণ মানব নয় বরং অপূর্ণ মানব। অপূর্ণ মানবের অর্থ কি? অপূর্ণ মানব সে, যে পূর্ণতার অংশবিশেষ ধারণ করে। দর্শন বুদ্ধিবৃত্তিক পূর্ণতার ক্ষেত্রে মৌলিকত্বে বিশ্বাসী তা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু দর্শনের পূর্ণ মানব মানবের পূর্ণতার অন্যান্য দিকগুলোকে উপেক্ষা করে শুধু আকলের পূর্ণতার মধ্যে তার পূর্ণতাকে খোঁজে। তাই এ মানব অপূর্ণ অথবা অর্ধপূর্ণ যা জ্ঞানের এক প্রতিমূর্তি বৈ কিছু নয়, জ্ঞান ব্যতীত সকল কিছু তার নিকট অনুপস্থিত। এরূপ মানব এমন এক অস্তিত্ব যে শুধু জানে, কিন্তু আবেগ, উত্তাপ ও গতিহীন এবং সৌন্দর্য বিমুখ। যে অস্তিত্বের সমগ্র শিল্প শুধু জ্ঞানের মধ্যে নিহিত সে অস্তিত্ব এক বিচ্ছিন্ন বিশ্বের মত পরিত্যক্ত। এটি ইসলামের পূর্ণ মানব নয় বরং ইসলামের অর্ধ মানব।

আকল ও বুদ্ধিবৃত্তির মূল্যের ক্ষেত্রে ইমাম মূসা ইবনে জাফর (আ.)-এর হাদীসটি আপনাদের জন্য ব্যাখ্যা করার সময় হলো না। এ প্রসঙ্গে প্রচুর কথা রয়েছে। যদি এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই তাহলে আরো দু'টি বৈঠক প্রয়োজন। সে সময় হাতে নেই বলে বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ সম্পর্কিত আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

وَ لاَ حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

৭

এরফানী মতবাদের ব্যাখ্যা

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, দার্শনিকের দৃষ্টিতে পূর্ণ মানবের প্রতিকৃতি এক রকম আর এরফানের দৃষ্টিতে অন্য রকম। নব্য দার্শনিকদের দৃষ্টিতে আবার ভিন্ন রকম। পূর্ণ মানব সম্পর্কিত আলোচনায় যে মতবাদগুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে আমরা তুলে ধরেছি সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পরবর্তীতে দান করব। যে মতবাদগুলো আমরা আলোচনা করেছি তা হলো বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ, আত্মিক মতবাদ বা আরেফদের মতাদর্শ, ভালোবাসা বা প্রেমের মতবাদ, ক্ষমতার মতবাদ এবং সেবার মতবাদ। আজকের আলোচনায় আমরা এগুলোর একটিকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং এ মতবাদের বিভিন্ন অংশ নিয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরব যেমনভাবে গত আলোচনায় বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো এরফানী ও তাসাউফী মতবাদের দৃষ্টিতে ইনসানে কামেল বা পূর্ণ মানব। এরফান ও তাসাউফের দৃষ্টিতে পূর্ণ মানবের আলোচনাটি আমাদের নিকট বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ্যারিস্টটল বা ইবনে সিনার মত দার্শনিকরা পূর্ণ মানবের প্রতিকৃতিকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে সেটা পরিচিত নয়, বরং তত্ত্ব হিসেবে দর্শনের গ্রন্থগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে– তার থেকে বের হয়ে আসেনি। কিন্তু এরফানী ও তাসাউফী মতাদর্শ পূর্ণ মানব সম্পর্কিত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে কবিতা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে। এরফানী গ্রন্থসমূহ যেহেতু এ ষিয়টিকে লেখনী ও কবিতাতে রূপক অর্থে ব্যবহার করেছে তাই তা সাধারণ মানুষের অন্তরে অধিক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এ মতাদর্শেও দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তির মতবাদের মতো কিছু বিষয় রয়েছে যা ইসলাম গ্রহণ করে। তদুপরি এ মতবাদও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। ইসলামের পূর্ণ মানব এরফানের পূর্ণ মানবের সঙ্গে একশ' ভাগ খাপ খায় না।

আরেফদের দৃষ্টি প্রেম

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা বলেছি দর্শন আকল বা বুদ্ধিবৃত্তিকে মানুষের সত্তা ও মূল বলে জানে। আকল ব্যতীত অন্য সকল কিছুকে মানুষের সত্তা বহির্ভূত বলে জানে এবং মাধ্যম বলে মনে করে। মানুষের অহমকে (আমিত্ব) তার চিন্তাশক্তি বলে বিশ্বাস করে। আরেফগণ মানুষের আকল বা চিন্তাকে অহম বলে মনে করেন না। বরং চিন্তাশক্তিকে মাধ্যম বলে মনে করেন। তবে মাধ্যম হিসেবেও একে খুব নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করেন না। এরফানের দৃষ্টিতে মানুষের প্রকৃত সত্তা বা আমিত্ব হলো তার কালব বা হৃদয়। দার্শনিকের বুদ্ধিবৃত্তিকেন্দ্রিক আমিত্বের বিপরীতে আরেফ আমিত্বকে কালব বলে ব্যাখ্যা করেন। অবশ্য সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, আরেফ কালব বলতে মানবদেহের বাম পার্শ্বস্থিত

ত্রিকোণাকার মাংসপিণ্ডকে বোঝান না যা সার্জন প্রফেসর বার্নার্ড অস্ত্রোপাচার করে পুনঃস্থাপন করেছেন। যেমনভাবে আকল চিন্তা ও বিশ্লেষণের কেন্দ্র তেমনি হৃদয় মানুষের আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র। আকল ও হৃদয় মানবদেহের ভিন্ন দু'টি কেন্দ্র।

আরেফ অনুভূতিকে, সার্বিকভাবে বললে প্রেমকে (যা অনুভূতির কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী) বিশেষভাবে গুরুত্ব ও মূল্য দান করেন। একজন বিজ্ঞ দার্শনিকের নিকট চিন্তা, যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপনের গুরুত্ব যেরূপ, একজন আরেফের নিকট প্রেম ও ভালবাসার গুরুত্বও তদ্রূপ। অবশ্য আরেফগণ ইশ্‌ক বা প্রেম বলতে যা বোঝান তার সঙ্গে আমাদের পত্র-পত্রিকার প্রেমের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের প্রেম দৈহিক। অপরপক্ষে প্রথমত আরেফগণের প্রেম মানুষের আত্মায় উদ্ভূত হয়ে খোদায় পৌঁছায় এবং আরেফের প্রকৃত প্রেমিক ও একমাত্র প্রেমাস্পদ শুধুই আল্লাহ্।

দ্বিতীয়ত আরেফগণের প্রেম মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আরেফ বিশ্বাস করেন সমগ্র সৃষ্টিজগতে প্রেম বিস্তৃত। কোন কোন এরফানী ও এরফানমুখী দর্শনের গ্রন্থে, যেমন 'আসফার'-এ একটি অধ্যায় রয়েছে যার নাম 'ফি সিরইয়ানিল ইশ্‌ক ফি জামিয়িল মাওজুদাত' অর্থাৎ সমগ্র অস্তিত্বজগতে প্রেমের বিচরণ। তাঁরা বিশ্বাস করেন প্রেম এক বাস্তবতা যা অস্তিত্বজগতের অণু-পরমাণুতে ছড়িয়ে রয়েছে। এই বায়ু, পাথর, এমনকি বস্তুর ক্ষুদ্রতম এককের মধ্যেও প্রেম বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে যা আসল ও মৌলিক তা প্রেম, প্রেম ব্যতীত অন্য সকল কিছুই এর উপমা ও অলংকার বিশেষ। মাওলানা রুমীর ভাষায়–

"প্রেম দরিয়া যেন, আসমান তার ফেনা
জুলাইখার চোখে যেন ইউসুফের নেশা।"

আসমান-জমিনসহ সমগ্র প্রকৃতি জগৎ আরেফদের চোখে প্রেমরূপ সমুদ্রের উপর ফেনা বৈ কিছু নয়।

হাফেজ শিরাজী বলেন,

"আসিনি এ জগতে সম্মান ও মর্যাদা পেতে,
আশ্রয় নিয়েছি হেথায় দুর্ঘটনার ফলশ্রুতিতে।*
প্রেমের পথেই করেছেন সৃষ্টি অনস্তিত্ব হতে আমায়,
প্রেমের এ পথ পেরিয়েই চাই পৌঁছতে সেথায়।"

(*হযরত আদম (আ.)-এর বেহেশত থেকে বিতাড়িত হওয়ার ঘটনা।)

অত্যন্ত সুন্দর বলেছেন হাফেজ। বলা হয়ে থাকে এ পঙ্‌ক্তি দু'টি সহীফায়ে সাজ্জাদিয়ায় বর্ণিত ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর প্রথম দোয়াটির অনুবাদ। মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসার পর তিনি বলছেন,

إِبْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ إِبْتِدَعًا, وَ اخْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيَّتِهِ اخْتِرَعًا, ثُمَّ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيْقَ عِبَادَتِهِ وَ بَعَثَهُمْ فِى سَبِيْلِ مَحبتِهِ

(সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা) "যিনি তাঁর ক্ষমতার মাধ্যমে অনস্তিত্ব থেকে (সৃষ্টি জগতকে) অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন যার পূর্বে কোন উদাহরণ ছিল না। তাঁর ইচ্ছার মাধ্যমেই অনস্তিত্বের অন্ধকার থেকে

তাকে অস্তিত্বের আলোয় আনয়ন করেছেন। অতঃপর তাকে পরিচালিত করেছেন তাঁর বন্দেগীর দিকে এবং তাঁর ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের জন্য তাকে নির্বাচিত করেছেন।"

হাফেজও তা-ই বলছেন।

পূর্ণতায় পৌঁছার পথ

যখন আরেফ বিশ্বজগতের জন্য কেবল একটি সত্যের অস্তিত্বে বিশ্বসী যার নাম প্রেম তখন তাঁর দৃষ্টিতে চিন্তা মানুষের জন্য কোন বাস্তব গুরুত্ব রাখে না। বরং মানুষের প্রকৃত সত্তা তার হৃদয় যা ঐশী ভালোবাসার কেন্দ্র। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রেমের মতবাদের মধ্যে মানুষের অহম বা আমিত্বের বিষয়ে বিভেদ রয়েছে। মানুষের অহম কি– সেটা যা চিন্তা করে, নাকি যা ভালবাসে। আরেফ বলেন, তোমার আমিত্ব তোমার যে সত্তা ভালোবাসে– সে সত্তা নয় যা চিন্তা করে।

যদি মানুষ দার্শনিকের দৃষ্টিতে পূর্ণ মানুষের মর্যাদায় পৌঁছতে চায় তা কোন্ মাধ্যমের সাহায্যে? দার্শনিকের উত্তর হলো চিন্তা, যুক্তি, দলিল ও তর্কশাস্ত্রের নিজস্ব ছাঁচের মাধ্যমে। কিন্তু আরেফ বলেন, "না। জ্ঞান, শিক্ষা, শ্রবণ, কথন, যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের কোন ভূমিকাই নেই।"

"সুফীর খাতায় নেই কোন বর্ণমালার উপস্থিতি
শুভ্র অন্তর সেথা, শ্বেত বরফের সেথা আত্মগীতি।"

এত সকল কাজ বাদ দিয়ে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ কর। দার্শনিক বলেন, "চিন্তা কর, শিক্ষকের নিকট গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ কর"। কিন্তু আরেফ বলেন, "পবিত্র হও, আত্মাকে পরিশুদ্ধ কর, অসৎ চরিত্রকে নিজের থেকে দূর কর, সত্য ব্যতীত যা কিছু আছে তা নিজের থেকে বিতাড়িত কর, আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ বৃদ্ধি কর, নিজের চিন্তার উপর প্রাধান্য লাভ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত যা কিছু তোমার অন্তরে আসবে তা শয়তান। যদি শয়তানকে অন্তর থেকে দূর না কর তাহলে আল্লাহ্‌র নূরের ফেরেশতা তোমার অন্তরে প্রবেশ করতে পারবে না।"

"সচেষ্ট আমি এ ধরায় সে মতি, পাই যেন এ শক্তি
দূর হয়ে যায় যত গ্লানি-ক্লিষ্ট, লভি যাতে মুক্তি
দূর কর অসুরে, দাও স্থান ফেরেশতায়।
জালেম শাসকের সহাবস্থান অমানিশার অন্ধকার এনেছে
যদি পেতে চাও আলো, চাও তা সূর্যের কাছে।
দুনিয়া প্রেমিক প্রভুর দরবারে আর কত ধরনা দেবে?
জালেমের দুয়ারে প্রতীক্ষা করে আর কত ভিক্ষা নেবে?
ভিক্ষার পথ কর না ত্যাগ যেথায় পাবে রতন
প্রতীক্ষা কর সেই পথে যে পথে মহাজন করে গমন।"

এ কবিতায় কবি ক্ষমতাবানদের দুয়ারে ধরনা দিতে নিষেধ করেছেন। আবার বলছেন, ভিক্ষার পথ ত্যাগ কর না, কিন্তু কার নিকট ভিক্ষুক হবে? বলছেন, একজন পূর্ণ মানবের নিকট।

যা হোক, এ মতবাদ মানুষের পূর্ণতায় পৌঁছার যে পথ উপস্থাপন করে তা আত্মিক পরিশুদ্ধির পথ, স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসার পথ। মানুষ যত বেশি খোদার প্রতি অনুরক্ত হবে, খোদা ভিন্ন অন্য সকল কিছুকে মন থেকে বিদূরিত করবে, নিজের অস্তিত্বের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে অন্য সকল বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তত বেশি পূর্ণ মানবের মর্যাদার নিকটবর্তী হবে।

স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, এরা যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন এবং তর্ক-বিতর্কের কোন মূল্য দেয় না। মাওলানা রুমী বলেন,

"যুক্তির পা কাষ্ঠ নির্মিত
কাষ্ঠ পদের নেই কোন স্থায়িত্ব।"
অন্যস্থানে বলছেন,
"যুক্তি যদি হয় মুক্তা ও পরশমনি
প্রেম তবে প্রাণের খনি
প্রাণের মর্যাদা রয়েছে ভিন্ন স্থানে
প্রাণের শরাব পানে পৌঁছে স্থায়ী আসনে।"

শেষ গন্তব্য কোথায়? দার্শনিকের দৃষ্টিতে মানুষের লক্ষ্য সে এক বিশ্বে পরিণত হবে– যে বিশ্ব চিন্তার বিশ্ব। দার্শনিকের ভাষায়–

صِيرورةِ الإِنْسَان عَالِمًا عَقْلِيًا مضَاهِيًا لِلْعَالِمِ الْعَيْنِيِّ

"মানুষ চিন্তাগতভাবে বাস্তব বিশ্বের অনুরূপ বিশ্বে রূপান্তরিত হওয়া অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব সার্বিকভাবে তার বুদ্ধিবৃত্তির আয়নায় প্রতিফলিত হওয়া এমনভাবে যে, সমগ্র বিশ্বকে তার অভ্যন্তরে অনুভব ও পর্যবেক্ষণ করবে। দার্শনিকের পথের সমাপ্তি বিশ্বকে দেখা ও জানার মাধ্যমে কিন্তু আরেফের পথের সমাপ্তি কোথায়? আরেফের শেষ লক্ষ্য জানা বা দেখা নয়, বরং পৌঁছতে চান সত্যের মূলে অর্থাৎ আল্লাহ্য়। তিনি বিশ্বাস করেন যদি মানুষ তার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং প্রেমের পথে যাত্রা করে (তবে এ যাত্রা অবশ্যই একজন ইনসানে কামেলের তত্ত্বাবধানে হতে হবে) তাহলে এ পথের শেষে স্রষ্টা ও তার মধ্যে কোন পর্দা থাকবে না এবং সে আল্লাহ্য় পৌঁছে যাবে।

কোরআনে আল্লাহ্পাক তাঁর দীদার বা সাক্ষাতের কথা বলেছেন। আরেফগণ আল্লাহ্র নৈকট্য ও দীদারের বিষয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন। বিষয়টি ব্যাপক বিধায় এ বিষয়ে প্রবেশ করতে চাচ্ছি না যে, এর অর্থ কি। যা হোক, আরেফ এটা বলেন না যে, আমি এমন স্থানে পৌঁছব যেখানে নিজেই চিন্তার এক বিশ্ব হব বা আয়না হব যাতে বিশ্ব প্রতিফলিত হবে, বরং বলেন আমি বিশ্বের কেন্দ্রে পৌঁছতে চাই।

يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكِ كَدْحًا فَمَلاقِيْهِ

"হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যে কঠোর সাধনা করছ অবশ্যই তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে।" (সূরা ইনশিকাক : ৬)

যখন সেখানে পৌঁছেছ অর্থাৎ তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছ তখন তুমি সব কিছুর অধিকারী اَلْعبودية جَوْهَرَةٌ كُنْهُهَا الرُّبُوْبِيَّة অর্থাৎ বন্দেগীই মূল যার মাধ্যমে সব কিছুর অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু তখন এ সব কিছুই তোমার নিকট মূল্যহীন, এটাই আশ্চর্যের বিষয়। এমন স্থানে পৌঁছেও তুমি কিছুই চাইবে না স্বয়ং তাঁকে ব্যতীত। আবু সাঈদ আবিল খাইর কত সুন্দর বলেছেন!

"যে চিনেছে তোমায় কি হবে তার জীবন দিয়ে
কি হবে তার সন্তান, পরিবার আর ঘর নিয়ে মশগুল হয়ে?
স্বপ্রেমে আসক্ত করে যদি তারে কর দু'জাহানের অধিপতি
এ জাহানকে উপেক্ষা করে সে ফিরে যাবেই তোমার প্রতি।"

প্রথমে নিজের প্রতি আসক্ত করে তাকে দু'জাহানই উপহার দাও। কিন্তু এমতাবস্থায় তাকে দু'জাহান দান কর যখন সে তা চায় না। যতদিন সে তোমাকে চিনতে পারেনি ততদিন সব কিছুই চায় কিন্তু তখন তাকে তা দাও না। যখন তোমাকে চেনে তখন তাকে সব কিছু দান কর কিন্তু সে সেগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। কারণ তোমাকে পেয়েছে, ফলে দুনিয়া ও আখেরাত কোনটিই চায় না, বরং ও দু'টির চেয়েও মূল্যবান তোমাকে চায়।

এখন আমরা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করে দেখব আরেফের দৃষ্টিতে যে ইনসানে কামেল তা ইসলামের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ পর্যায়ে আমরা বুঝতে পেরেছি আরেফের দৃষ্টিতে ইনসানে কামেল তিনিই যিনি আল্লাহ্য় পৌঁছেছেন। যখন তিনি আল্লাহ্তে পৌঁছেন তখন আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর প্রকাশস্থলে পরিণত হন। আল্লাহ্র সত্তা তাঁর মধ্যে প্রকাশিত ও বিচ্ছুরিত হওয়ার জন্য নিজে আয়নাস্বরূপ হন।

দার্শনিক মতবাদের আলোচনায় আমরা বলেছি যাকে দর্শন পূর্ণ মানব মনে করে ইসলামের দৃষ্টিতে তা পূর্ণ নয় বরং অপূর্ণ মানব। সে সাথে দর্শনের বিভিন্ন অংশ আলোচনা করে কোন্ অংশকে ইসলাম সমর্থন করে এবং কোন্ অংশকে ইসলাম সমর্থন করে না তা তুলে ধরেছি। এখানেও আমরা সেভাবেই আলোচনা পেশ করব।

ইসলামে কি আত্মিক প্রশিক্ষণ ও পবিত্রতার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে? নিঃসন্দেহে বলা যায় অবশ্যই। যেহেতু কোরআনে এসেছে– قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّيهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيهَا (সূরা শামছ : ৯ ও ১০)

উপর্যুপরি সাত বার কসম করার পর কোরআন বলছে, "তারাই সফলতা লাভ করেছে যারা নাফ্সকে পবিত্র করেছে এবং দুর্ভাগ্যগ্রস্ত তারাই যারা নাফ্সকে (আত্মা ও অন্তঃকরণ) ধ্বংস করেছে।

আরোপিত জ্ঞান

ইসলামে কি আত্মিক পবিত্রতা অর্জনকে পরিচিতি ও জ্ঞান লাভের অন্যতম পথ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে? কোরআন যে বলছে, "যে ব্যক্তি আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করল সে সফলকাম হলো" তাতে আত্মিক পবিত্রতা অর্জনকে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের একটি মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়েছে কি? নাকি পরিচিতি ও জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পদ্ধতি হলো যুক্তি ও দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন যা দর্শন বলছে।

এটা যে (আত্মিক পবিত্রতা অর্জন) ইসলাম কর্তৃক সমর্থিত তা নিঃসন্দেহে সত্য। রাসূল (সা.) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা শিয়া-সুন্নী সবাই নকল করেছে এবং একটি প্রতিষ্ঠিত হাদীস তা হলো :

مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا جَرَتْ يَنَابِيْعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ

(সাফিনাতুল বিহার, খালাসা ধাতু)

"যে কেউ চল্লিশ দিবা-রাত্রি আল্লাহ্‌র জন্য খালেস করবে অর্থাৎ চল্লিশ দিন তার মধ্যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুই না থাকে (আল্লাহ্‌র জন্য কথা বলে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই নীরবতা পালন করে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তাকায়, চোখ বন্ধ করে, খাদ্য গ্রহণ করে, ঘুমায়, জেগে থাকে এবং এমন সুশৃঙ্খলভাবে পরিকল্পনা করে ও আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য চেষ্টা চালায় যে, প্রকৃতই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য কাজ না হয়) তবে আল্লাহ্‌পাক সে ব্যক্তির অন্তঃকরণ হতে হেকমত ও জ্ঞানের এক ফল্গুধারা তার জিহ্বায় প্রবাহিত করেন।" অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম খলীল (আ.)-এর ভাষায়–

إِنَّ الصَّلَوتِى وَ نُسكى وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ العالمين

"আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ্‌র জন্য"। (সূরা আনআম : ১৬২)

এরূপ যদি কেউ হতে পারে (চল্লিশ দিন তার প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ দমন করে এবং আল্লাহ্‌র ব্যতীত আর কারো জন্য কাজ না করে ও আল্লাহ্‌র জন্যই বেঁচে আছে এমনভাবে কাজ করে) রাসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তার অন্তঃকরণ হতে জ্ঞানের ধারা সৃষ্টি করবেন।

সুতরাং বোঝা যায়, এরফান যে জ্ঞানকে অরোপিত জ্ঞান বলছে যা মানুষের অন্তঃকরণ হতে উৎসারিত হয়– ইসলাম তা গ্রহণ করে। যেমনভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানকেও সে মেনে নেয়। যেমন হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, عَلَّمْنَا مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (সূরা কাহাফ ৬৫) "আমরা সেই বান্দাকে আমাদের নিকট হতে ইল্‌ম দান করেছি" অর্থাৎ এই ইল্‌ম বা জ্ঞানকে সে মানুষের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি বরং তার অন্তঃকরণ হতে এ জ্ঞানের ধারা আমরা প্রবাহিত করেছি। (কালামশাস্ত্রে 'ইল্‌মে লাদুন্নি' শব্দের ব্যবহার কোরআনের এ আয়াত থেকেই এসেছে।)

কবি হাফেজ শিরাজী তাঁর কবিতায় ইঙ্গিতের মাধ্যমে এ হাদীসের বাণীর দিকেই ইশারা করেছেন,

"ভোরের যাত্রী এ পথে যেতে
বলেছে এক ধাঁধাঁয় ইশারা ও ইঙ্গিতে
হে সুফী! শরাব তখনই হয় পানের উপযুক্ত
যখন থাকে চল্লিশ দিবা-রাত্রি শিশিতে আবদ্ধ।"

রাসূল (সা.) বলেছেন,

لَوْ لا أَنَّ الشَّيَاطِيْنَ يَحُوْمُوْنَ حَوْلَ قُلُوْبِ بَنِى آدَمَ لَنَظَرُوْا إِلَى مَلَكُوْتِ السَّمَوَاتِ

"যদি শয়তান আদমের সন্তানদের হৃদয়ের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ না করত (যে কারণে অন্তরে কালিমা ও আবরণের সৃষ্টি হয়) তবে হৃদয়ের চক্ষু দিয়ে সে অকাশমণ্ডলীর পরিচালন ব্যবস্থা (অর্থাৎ ফেরেশতামণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে যে বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে) দেখতে পেত।" (মোহাজ্জাবাতুল বাইদা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫)

এ হাদীসটি আমাদের কোন কোন গ্রন্থে, যেমন জামেয়াস্ সায়াদাতে এসেছে। অন্য স্থানে নবী (সা.) বলেছেন,

لَوْ لا تَكْثِيْرٌ فِى كَلاَمِكُمْ وَ تَمْرِيْجٌ فِيْ قُلُوْبِكُمْ لَرَأَيْتُمْ مَا أَرَى وَ لَسَمِعْتُمْ مَا اسْمَعُ

"যদি তোমাদের কথায় বাচালতা ও অন্তর তৃণ ও আগাছা দ্বারা আবৃত না থাকত (যার ফলে যে কোন প্রাণীই সেখানে চরে বেড়ায়) তাহলে যা আমি দেখতে ও শুনতে পাই তোমরাও তা দেখতে ও শুনতে পেতে।" (জামেয়াস্ সায়াদাত)

রাসূল (সা.) বলতে চাচ্ছেন এ বস্তু দেখার জন্য নবী বা রাসূল হওয়ার প্রয়োজন নেই। কখনো কখনো অন্যরাও তা দেখতে পায়। যেমন হযরত মরিয়ম (আ.)।

রাসূল (সা.) যখন হেরা পর্বতের গুহায় ছিলেন তখন আলী (আ.)ও তাঁর সাথে ছিলেন। কিন্তু তাঁর বয়স তখন ১০ বছরের বেশি ছিল না। প্রথম বার যখন রাসূলের উপর ওহী অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলের নিকট বিশ্ব পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। সে মুহূর্তে রাসূল অদৃশ্য (গায়েব) ও মালাকুত থেকে যা শুনতে পাচ্ছিলেন আলীও তা শুনতে পেয়েছিলেন। স্বয়ং আলী (আ.) নাহজুল বালাগাতে বলেছেন,

وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانُ حِيْنَ نُزُوْلِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ

"প্রথম বার যখন তাঁর (রাসূলের) উপর ওহী অবতীর্ণ হয় তখন শয়তানের আর্তনাদ শুনতে পাই। রাসূলকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন :

إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا اسْمَعُ وَ تَرَى مَا اَرَى أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ

হ্যাঁ, আমি যা শুনছি তুমিও তা শুনতে পাচ্ছ, আমি যা দেখছি তুমিও তা দেখতে পাচ্ছ, তবে তুমি নবী নও।" (খুতবা নং ১৯০)

অতএব, আত্মিক পরিশুদ্ধি, নিষ্ঠা এবং প্রবৃত্তিকে দমন শুধু মানুষের হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতাই দান করে না বরং এর প্রভাবে মানুষের হৃদয় হতে জ্ঞান ও হেকমতের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়।

আত্মার ঊর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি

আল্লামা মাজলিসী বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রাসূল (সা.)-এর সাহাবীরা মুমিন ছিলেন বলে যখনই তাঁদের মধ্যে অন্যরকম অবস্থার সৃষ্টি হতো তখন ভয় পেতেন যে, নিফাক তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে কিনা? কখনো রাসূলকে বলতেন, "আমরা ভয় পাই মুনাফিক হয়ে পড়ি কিনা?" রাসূল বলতেন, "কেন?" তাঁরা বলতেন, "যখন আমরা আপনার সম্মুখে উপস্থিত থাকি এবং আপনি

উপদেশ দেন ও নসিহত করেন, আল্লাহ্, কিয়ামত, গুনাহ, তওবা ও ইস্তিগফারের কথা বলেন, নিজেদের মধ্যে উন্নত এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে অনুভব করি। কিন্তু যখন আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, নিজের পরিবার, সন্তান ও স্বজনদের মাঝে ফিরে যাই, وَ شَمَمْنَا الأَوْلاد وَ راينَا العيَالَ وَ الاهلَ নিজেদের সন্তানদের গন্ধ অনুভব করি তখন লক্ষ্য করি আমাদের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরে গিয়েছি। হে রাসূলাল্লাহ্! এটা মুনাফেকী নয়? এমন যেন না হয় আমাদের মধ্যে নেফাকের সৃষ্টি হয় এবং আমরা মুনাফিক হয়ে পড়ি।" রাসূল বলেন, "না, এটা নিফাক নয়। নিফাক অর্থ দু'চেহারা কিন্তু এটা দু'অবস্থা (দু'চেহারা নয়)। কখনো মানুষের রূহ বা আত্মার আরোহণ হয় এবং ঊর্ধ্বে যাত্রা করে, কখনো তার রূহের অধঃপতন ঘটে ও নিম্নে যাত্রা করে। অবশ্য যখন আমার নিকট থাক ও আমার কথা শোন, তোমাদের মধ্যে ঊর্ধ্বগতির অবস্থা সৃষ্টি হয়।" তারপর বলেন,

لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِى وَصَفْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِهَا لصَافَحَتْكُم الْمَلاَئِكَةُ وَ مَشَيْتُمْ عَلَى الْمَاءِ

"আমার সঙ্গে থাকাকালীন অবস্থাটি (যা তোমরা বর্ণনা করলে) যদি তোমরা ধরে রাখতে পারতে তাহলে ফেরেশতারা এসে তোমাদের সঙ্গে হাত মিলাত এবং তোমরা পানির উপর দিয়ে হেঁটে চলতে সক্ষম হতে। কিন্তু এ অবস্থা এমন নয় যে, তা সকল সময় তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যদি তেমন অবস্থায় থাকা তোমাদের অভ্যাসে পরিণত হতো তাহলে আমি যা বললাম সে পর্যায়ে পৌঁছতে পারতে।" (উসূলে কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৪)

আমার দৃষ্টিতে সা'দীর কবিতার নিম্নবর্ণিত অংশটি রাসূলের এ হাদীসেরই অনুবাদ। কিন্তু অন্য একভাবে হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর ভাষায় বলছেন,

"প্রশ্ন করলেন নিখোঁজ সন্তানের পিতাকে তিনি
এই উজ্জ্বল রত্ন বৃদ্ধ জ্ঞানী
অনুভব করেছ মিশর থেকে তার জামার গন্ধখানি
কেন ঘরের কোণে কেনানের গর্তে তাকে দেখনি?"

হযরত ইউসুফ (আ.) মিশরে তাঁর ভ্রাতাদের নিকট নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর জামাটি তাদের হাতে দিয়ে বললেন, "এটা নিয়ে যাও।" তারা তখনও পিতার নিকট পৌঁছেনি কিন্তু হযরত ইয়াকুব বলছেন, إِنِّى لا أَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلا أن تُفَنِّدُوْن "যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর, আমি অবশ্যই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি।" কবিতার ভাষায় তাই তিনি ইয়াকুবকে বলছেন, আপনি কিরূপে মিশর থেকে ইউসুফের গন্ধ অনুভব করেন, অথচ পূর্বে তিনি আপনার গ্রাম কেনানের একটি গর্তে পড়ে ছিলেন, আপনি তা বোঝেননি বা তাঁকে দেখতে পাননি। পরে হযরত ইয়াকুবের ভাষায় জবাব দিচ্ছেন–

"বললেন, আমাদের অবস্থা বিদ্যুতের ন্যায়
কখনো থাকে গোপন, কখনো তারে দেখা যায়
কখনো আমরা থাকি আসমানের উপর
কখনো দেখি না তা, যা রয়েছে পায়ের উপর।"

আমাদের অবস্থা বিদ্যুত চমকানোর মতো, কখনো সম্পূর্ণ আলোকিত, কখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন। হাফেজ শিরাজীর ভাষায়–

"ভোরে চমকায় বিদ্যুত ঘর হতে লাইলীর
করে তা ভস্মিভূত খড়ের ঘর মজনুর।"

(সা'দীর ভাষায়) পৃষ্ঠের কবিতার শেষে ইয়াকুব বলছেন,

"দরবেশ যদি সর্বদা সে অবস্থায় থাকে
দু'বিশ্ব ভেদ করে শির উঁচু করে রাখে।"

যে অবস্থা আরেফের জন্য কখনো কখনো আসে তা যদি বর্তমান থাকে, তবে দু'বিশ্ব থেকেও সে ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে পারে।

পূর্ণ মানবের ঊর্ধ্বগমন

এতক্ষণ আমরা যা বলেছি তার সমর্থনে নাহজুল বালাগার কিছু অংশ আপনাদের জন্য পড়ব। আমাদের পূর্ববর্তী বৈঠকগুলোতে আমরা পুনঃপুন বলেছি, নাহজুল বালাগা আলী (আ.)-এর মতোই। মানুষের বাণী সে মানুষের মতোই। যেহেতু বাণী আত্মার প্রতিফলন। নিকৃষ্ট আত্মার বাণীও নিকৃষ্ট এবং উত্তম আত্মার বাণীও উত্তম। এককেন্দ্রিক আত্মার বাণীও এককেন্দ্রিক। সর্বব্যাপী আত্মার বাণীও সর্বব্যাপী। আলী যেহেতু বহুমুখী ও বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যসমূহের সমন্বয় সেহেতু তাঁর বাণীও বহুমুখী ও বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়। তাঁর বাণীতে এরফান সর্বোচ্চ পর্যায়ে, দর্শন, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, বিপ্লব এবং নৈতিকতাও তার চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান করছে। আলীর বাণীও আলীর মতো সর্বব্যাপী ও সর্বজনীন। তিনি একটি বাণীতে قَدْ أَحْيَى عَقْلَهُ وَ أَمَاتَ نَفْسَهُ একজন আরেফের ঊর্ধ্ব গমনকে বর্ণনা করে বলছেন, সে তার আকলকে জীবিত করেছে এবং প্রবৃত্তির মৃত্যু ঘটিয়েছে। শরীয়তসম্মত আধ্যাত্মিক চর্চা তার শরীরকে এতটা শীর্ণ করেছে যে, তার মাংস হাড়ের সঙ্গে মিশে গেছে। আত্মার স্থূলতা পরিবর্তিত হয়ে সূক্ষ্মতায় পর্যবসিত হয়েছে حَتَّى دَقَّ جَلِيْلُهُ وَ لَطُفَ غَلِيْظُهُ وَ بَرَقَ لَهُ لامِعٌ كَثِيْرُ الْبَرُقِ فَابَانَ لَهُ الطَرِيْق এবং সে অবস্থায় বিদ্যুতের এক ঝলকানি তার অন্তরকে আলোকিত করে তাকে পথ দেখিয়ে দেয় وَ سَلَكَ بِهِ السَّبِيْلَ وَ تَدَافَعَتْهُ الأَبْوَابُ إِلَى بَابِ السَّلاَمَةِ এর মাধ্যমে সে পথ চলতে থাকে এবং একটির পর একটি দরজা উন্মোচিত করে প্রকৃত লক্ষ্য ও সফলতায় পৌঁছায় যা তার শেষ লক্ষ্য। (নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ২১৮)

সুতরাং ইনসানে কামেল বা পূর্ণ মানবের জন্য ঊর্ধ্বগামী হিসেবে আত্মিক পরিশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণের পথ অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে এবং ইসলাম তা-ই বলে।

ইসলামের পূর্ণ মানব কি ঊর্ধ্বগামী যে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় এবং একের পর এক লক্ষ্য অতিক্রম করে? অবশ্যই এজন্য আলী (আ.) বলছেন, وَ تَدَافَعَتْهُ الأَبْوَابُ إِلَى بَابِ السَّلاَمَةِ একের পর এক দ্বার তার

নিকট উন্মোচিত হয় এবং একটির পর একটি লক্ষ্য পেছনে ফেলে এ পথের শেষ লক্ষ্য 'বাবুস্ সালামাত' বা নিরাপত্তার দ্বারে পৌঁছায়।

আল্লাহ্পাকের নৈকট্য কি সত্য? সন্দেহাতীতভাবে সত্য। বাস্তবিকই যদি কেউ সেখানে পৌঁছায় তবে তার ও আল্লাহ্র মধ্যে কোন পর্দা নেই। তখন সে অন্তর চক্ষু দিয়ে তাঁকে দেখে। তখন সে আর আমাদের মতো নয় যে, আসমান, জমীন, বৃক্ষরাজী দেখে খোদাকে উদ্ঘাটন করবে। বরং আকাশ, পৃথিবী, বৃক্ষ হতে আল্লাহ্ তার নিকট অধিক স্পষ্ট।

ইমাম হুসাইন (আ.) দোয়ায়ে আরাফায় কি এটাই বলছেন না যে,

أَ يَكُوْنَ لِغَيْرَكَ مِن الظُّهُوْرِ مَا لَيْسَ لَكَ

"আপনি ব্যতীত কোন প্রকাশই নেই, যেখানে আপনি নেই।"

এক ব্যক্তি ইমাম আলীকে প্রশ্ন করল, "আপনি কি আল্লাহ্কে দেখেছেন?" আলী (আ.) বলেন, "যে আল্লাহ্কে দেখা যায় না এমন কোন আল্লাহ্র আমি ইবাদত করিনি।"

অতঃপর সে হয়তো মনে করবে চোখ দিয়ে খোদাকে দেখা যায় এবং তিনি কোন বিশেষ স্থানে আছেন, তাই তার ভুল ভাঙ্গানোর জন্য তিনি বললেন,

لا تَرَاهُ الْعُيُوْنُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِيَان وَ لَكِنَّ تُدْرُكُهُ الْقُلُوْبُ بِحَقَائِقِ إِلابِمَان

"এ চোখ দিয়ে তাঁকে দেখিনি, কিন্তু তাঁকে অন্তর দিয়ে দেখেছি। ঈমানের বাস্তবতা দিয়ে।" (নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ১৭৭)

এরফানী মতবাদের ত্রুটিসমূহ

১. বুদ্ধিবৃত্তির অবমূল্যায়ন : এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তাতে এরফানের পূর্ণ মানবকে ইসলাম এতটুকু সমর্থন করে। কিন্তু এ মতবাদে কিছু কিছু বিষয়কে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে এবং ইসলাম এ অবমূল্যায়নকে সমর্থন করে না। এ কারণেই এরফানের পূর্ণ মানব ইসলামের দৃষ্টিতে অপূর্ণ। এরফানে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির চরম অবমূল্যায়ন করা হয়েছে, অথচ ইসলাম অন্তরকে গ্রহণ করলেও বুদ্ধিবৃত্তির অবমূল্যায়ন করে না। ইসলাম প্রেম ও ভালবাসার মাধ্যমে ঊর্ধ্ব গমনকে গ্রহণ করে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি, দলিল উপস্থাপনের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে। এ কারণে ইসলামের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষত বিগত কয়েক শতাব্দীর আলেমদের মধ্যে অনেকেই অন্তর ও আকল দু'টিকেই যথেষ্ট গুরুত্ব দান করেন। শেইখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর (শেইখ এশরাক) চিন্তাও এর নিকটবর্তী। সা'দীর মুতাআল্লেহীন শিরাজী (মোল্লা সাদরা) আকল ও অন্তরকে তাঁর থেকে আরো অধিক (কোরআনের অনুসরণে) সম্মান দান করেছেন। তাঁরা ইবনে সিনার মতো এরফানী পথকে (অন্তরকে) যেমন অবমূল্যায়ন করেননি [১*] তেমনি অনেক সুফী ও আরেফদের মত চাননি বুদ্ধিবৃত্তিকে অবমূল্যায়ন করতে। বরং চেয়েছেন দু'টি পথকেই সম্মান দেখাতে।

সুতরাং জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির যে বিষয়গুলোকে এরফান বা কোন কোন আরেফ তাঁদের বক্তব্যে অবমূল্যায়ন করেছেন তা ইসলাম সমর্থন করে না। কোরআনের ইনসানে কামেল সেই মানুষ যার বুদ্ধিবৃত্তিও পূর্ণতা লাভ করেছে অর্থাৎ তার আকল তার পূর্ণতার অংশ।

২. সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী : অন্য যে বিষয়টি এরফানের ইনসানে কামেলের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এবং ইসলাম যা সমর্থন করে না তা হলো এরফানে শুধু অন্তর্মুখীতা রয়েছে, কিন্তু বহির্মুখীতার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়ে গেছে। ব্যক্তিগত দিক প্রচুর আসলেও সামাজিক দিক সেখানে উপেক্ষিত হয়েছে বা কম এসেছে। এরফানের পূর্ণ মানব সামাজিক মানব নয়, সে শুধু নিজেকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। কিন্তু ইসলাম অন্তর, প্রেম, আধ্যাত্মিকতার পথে স্রষ্টার দিকে যাত্রা, আরোপিত জ্ঞান, আত্মিক পরিশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণ এ সব কিছুকে গ্রহণ করার পরেও এর পূর্ণ মানব সর্বজনীন। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর পাশাপাশি সে বহির্মুখী এবং সমাজমুখী অর্থাৎ সে নিজের মধ্যে নিমজ্জিত নয়। যদিও রাত্রিতে সে দুনিয়া ও এর মধ্যকার সব কিছু ভুলে গিয়ে নিজের অস্তিত্বের মধ্যে নিমজ্জিত হয়, কিন্তু দিবসে সমাজের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান করে। হযরত মাহ্দী (আ.)-এর (আল্লাহ্ তাঁর আগমন ত্বরান্বিত করুন) সহযোগীদের (যাঁরা পূর্ণ মুসলমানের নমুনা) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যেমন বলেছি, অসংখ্য রেওয়ায়েতে পুনঃপুন বলা হয়েছে, رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ, لُيُوْثٌ بِالنَّهَارِ যদি রাত্রিতে তাদের অনুসন্ধানে যাও দেখবে যেন একদল দুনিয়াত্যাগী সন্ন্যাসী যারা পর্বতের গুহায় বাস করে এবং ইবাদত ব্যতীত অন্য কিছুর কথা তারা চিন্তাই করে না। কিন্তু দিবসে তারা পুরুষ সিংহ। তারা রাত্রিতে সন্ন্যাসী, দিবসে সাহসী যোদ্ধা। কোরআন নিজেও এ দু'বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটিয়েছে। যেমন اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ তওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহ্র প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী ইত্যাদি অন্তর্মুখী বৈশিষ্ট্যের স্মরণের পরই বলছে, الامِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (সূরা তাওবাহ্ : ১১২) সৎ কাজের আদেশকারী ও অসৎ কাজের নিষেধকারী অর্থাৎ তারা সমাজ সংস্কারী– এ বৈশিষ্ট্যটি মানুষের বহির্মুখী বৈশিষ্ট্য। অন্য এক আয়াতে مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَكُمْ কোন কোন তাফসীর মতে রাসূল (সা.) ও তাঁর বিশেষ সাহাবীদের, আবার কারো মতে শুধু সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে প্রথমে সামাজিক দিক এসেছে أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَكُمْ অর্থাৎ তারা কাফের ও সত্য আচ্ছাদনকারীদের বিরুদ্ধে কঠিন ও অটল (প্রাচীরের ন্যায়) এবং ঈমানদারদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল; অতঃপর বলা হয়েছে, এ সমাজমুখী ব্যক্তিদের আবার تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا রুকু ও সিজদারত অবস্থায় দেখবে যখন তারা يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে অর্থাৎ তারা এমন নয় যে, দুনিয়া ও আখেরাত চায়, বরং এর চেয়েও উত্তম বস্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি তাদের কামনা। এই সিজদার চিহ্ন سِيمَاهُمْ فِى وُجُوْهِهِمْ مِن اَثَرِ السُّجُوْدِ তাদের মুখমণ্ডলে দর্শনীয়– এগুলো তাদের অন্তর্মুখী বৈশিষ্ট্য।

যা হোক তাসাউফ বা এরফানের পূর্ণ মানবের এ দুর্বলতাটি লক্ষণীয়। অবশ্য অনেক আরেফই যেহেতু ইসলামের শিক্ষার দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত ছিলেন সেহেতু এ বিষয়টির প্রতি তাঁরা নির্দেশ

করেছেন। তদুপরি কখনো কখনো কমবেশি বাড়াবাড়ি করেছেন এবং অন্তর্মুখীতা এত অধিক প্রাধান্য পেয়েছে যাতে বহির্মুখীতা সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে।

৩. অহমকে নির্মূল করা : অন্য যে বিষয়টি এ মতবাদে এসেছে তা হলো অহমকে নির্মূল করা। ইসলামী পরিভাষায় অহম নির্মূলকরণ বলে কিছু নেই। দু'এক জায়গায় যেমন اَمَاتَ نَفْسَهُ সে তার অহমকে নির্মূল করেছে বা অহমের মৃত্যু ঘটিয়েছে যা নাহজুল বালাগায় এসেছে এবং অন্য স্থানে مُوْتُوْا قَبْلَ أَنْ تَمُوْتُوْا মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুকে বরণ কর বলা হয়েছে। সাধারণতঃ ইসলামী পরিভাষায় আত্মগঠন, আত্মশুদ্ধি এ বিষয়গুলো রয়েছে।

কবিদের ভাষায় প্রবৃত্তিকে হত্যা বা অহম নির্মূলকরণ প্রচুর এসেছে (এ ধরনের পরিভাষা ব্যবহারের প্রতি আমাদের আপত্তি নেই) কিন্তু প্রবৃত্তি হত্যা অন্যভাবে বললে আত্মদমন অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা ও আত্মতুষ্টির বিরুদ্ধে এরফান এমনভাবে বক্তব্য রেখেছে যে, আত্মসম্মানবোধ যা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তা উপেক্ষিত হয়েছে। এ আলোচনাটি একটু বিস্তারিত।

আমাদের আলোচনার প্রথমে আমরা বলেছি যেহেতু এরফান অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং আরেফ ও সুফিগণ কবিতা, ছন্দ ও বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছেন সেহেতু আমাদের সমাজে এরফানের ইনসানে কামেলের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। এ কারণেই আমরা মহামানব ও পূর্ণ মানব বলতে তাকেই বুঝি এরফান যাকে আমাদের নিকট পরিচিত করিয়েছে। তাই এরফানের উপস্থাপিত মানুষ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। তৃতীয় যে দুর্বলতাটি উল্লেখ করেছি তা আজকে শুধু ইশারা করা হলো। পরবর্তী সভায় এর পাশাপাশি অন্য কিছু দিক নিয়েও আলোচনা করব ইনশাল্লাহ্।

৮

এরফানী মতবাদের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلالٍ مُبِيْنٍ.

আমাদের এ আলোচনা সভার উদ্দেশ্য মূলত ইসলামের দৃষ্টিতে পূর্ণ মানবকে জানার জন্য চেষ্টা করা। আমরা বলেছি মানুষ একমাত্র অস্তিত্ব যার নিজ থেকে নিজকে পৃথক করা যায়। অর্থাৎ আমরা কোথাও এমন কোন পাথর খুঁজে পাব না যার মধ্যে পাথরের বৈশিষ্ট্য নেই বা বিড়াল খুঁজে পাব না যার মধ্যে বিড়ালের স্বভাব নেই। এরূপ কোন কুকুরের বৈশিষ্ট্যহীন কুকুর, নেকড়ের স্বভাবহীন নেকড়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ পৃথিবীর সব নেকড়েই যে স্বভাবগুলোর কারণে তাকে আমরা নেকড়ে বলি প্রকৃতিগতভাবেই সেগুলোর অধিকারী। শুধু মানুষ এরূপ যে, মনুষ্যত্ব তার মধ্যে নেই এবং তা অর্জন করতে হয়। এ ছাড়াও আমরা আলোচনা করেছি মনুষ্যত্ব তার জৈব বা বায়োলজিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত নয়। যে বস্তুটি মনুষ্যত্ব বা মানুষ হওয়ার সঙ্গে জড়িত তা তার জৈবিক বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথক।

"মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্যেই হয় মানুষ সম্মানিত
মানুষ সে নয় যে বাহ্যিক সাজে সজ্জিত।"

মোটামুটি সবাই এটা জানেন যে, শুধু অস্তিত্বগত বা জৈবিক কারণে অর্থাৎ জীব বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় কাউকে মানুষ বলাটা কোন ব্যক্তির মানুষ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। মানুষ হওয়াটা এ থেকে স্বতন্ত্র কোন বিষয়। যে কেউ মানবী থেকে জন্মগ্রহণ করার অর্থ তার মানুষ হওয়া নয়। এজন্যই বলা হয়েছে,

"জ্ঞানী হওয়া কত সহজ
মানুষ হওয়া কত কঠিন!"

অর্থাৎ মানুষ যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তখন আলেম বা জ্ঞানী হওয়ার যোগ্যতা তার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে; কার্যকর অবস্থায় নয়। তেমনি মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে সুপ্তাবস্থায় নিহিত রয়েছে; কার্যকরভাবে নয়। তাই এ অবস্থায় প্রশ্ন আসে মানুষ হওয়া বা মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষে পরিণত হওয়ার অর্থ কি? একজন জীববিজ্ঞানী যেমনি এ মানুষ হওয়াকে আমাদের প্রদর্শন করতে পারেন না তেমনি এক চিকিৎসা বিজ্ঞানীও সেটাকে আমাদের পরিচিত করাতে সক্ষম নন। মনুষ্যত্ব এমন একটি বিষয় যা চরম বস্তুবাদী মতাদর্শও অস্বীকার করতে পারে না। তদুপরি বস্তুগত মানদণ্ড দিয়েও এর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এজন্যই বলেছি মানুষ নিজেই নিজের জন্য নৈতিকতা

ও আধ্যাত্মিকতায় প্রবেশের পথ। মানুষ তার অস্তিত্বের অভ্যন্তর থেকে অন্য যে পথে অধ্যাত্মিকতায় প্রবেশ করতে পারে এবং বুঝতে পারে যে, বস্তুজগতের বাইরেও এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভবযোগ্য নয় বা ল্যাবরেটরীতেও তার পরীক্ষা সম্ভব নয় (কিন্তু সকল মানুষই তা বিশ্বাস করে) তা হলো তার মনুষ্যত্ব– যা জীববিজ্ঞানের বহির্ভূত বিষয়। চরম বস্তুবাদী ব্যক্তিবর্গও একটি বিষয় মানেন, যাকে 'মানবিক মূল্যবোধ' বলা হয়। যখন বলা হয় মানবিক মূল্যবোধ তখন এর অর্থ মানুষের বস্তুসত্তার বাইরের একটি বিষয়।

আমরা চাই মানুষের মৌলিক মূল্যবোধগুলোকে ইসলামের ভিত্তিতে চিনতে অর্থাৎ আমরা বুঝতে চাই কোন্ বিষয়গুলোকে ইসলাম মৌলিক মানবিক মূল্যবোধ বলে জানে। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য মতবাদকে উপস্থাপনের মাধ্যমে পর্যালোচনা না করব ততক্ষণ ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে জানতে পারব না। পর্যালোচনা এখানে প্রকৃত অর্থেই পর্যালোচনা, শুধু ত্রুটিসমূহ সনাক্ত করা নয়। পর্যালোচনার কাজ ঠিক একজন মুদ্রা বিশেষজ্ঞের কাজের ন্যায় অর্থাৎ একজন মুদ্রা বিশেষজ্ঞ যা করেন তা হলো কষ্টি পাথরের মাধ্যমে একটি মুদ্রার বিশুদ্ধতা যাচাই; তিনি বিশ্লেষণ করে দেখেন মুদ্রাটিতে কত ভাগ নিখাঁদ স্বর্ণ বা রৌপ্য এবং কত ভাগ মিশ্রণ রয়েছে। সুতরাং পর্যালোচনার অর্থ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা নয়, বরং এটা দেখা যে, ইসলামের মানদণ্ড বা কষ্টি পাথরে যাচাই করলে বিষয়টির কত ভাগ গ্রহণযোগ্য। দর্শন, এরফান বা অন্যান্য মতবাদ যে মুদ্রাগুলো ছেড়েছে যদি সেগুলোকে যথার্থভাবে যাচাই না করি তবে ইসলামের মুদ্রাকে আমরা চিনতে পারব না। তাই এ মতবাদগুলো উপস্থাপন না করে আমি নিজে নিজেই যদি বলি, ইসলামের মৌলিক মানবিক মূল্যবোধ অমুক অমুক বিষয় তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস কেউই তার প্রতিবাদ করে বলবে না যে, এ ব্যতীত অন্য একটি বিষয়ও রয়েছে বা বলবে না যে, কেন এটি মূল্যবোধ অন্যটি নয়? কিন্তু যখন অন্যান্য মতবাদকে উপস্থাপন করে প্রকৃত অর্থেই পর্যালোচনা করব অর্থাৎ ইসলামের মাপকাঠিতে যাচাই করব তখন যুক্তিসম্মত ভাবেই বলতে পারব মানবিক বিষয়ে ইসলামের মূল্যবোধ কি বা কোন্ বিষয়গুলোকে প্রকৃতপক্ষে ইসলাম মানবিক মূল্যবোধ বলে বিশ্বাস করে। এমনকি প্রত্যেকটি মূল্যবোধের শতকরা পরিমাণও নির্ধারণ করতে পারি অর্থাৎ সমগ্র মূল্যবোধকে একশ' ধরলে বিষয়গুলোর প্রতি ইসলামের বিশেষ দৃষ্টি ও সংবেদনশীলতা অনুযায়ী বলতে পারব এ মূল্যবোধকে ইসলাম উদাহরণস্বরূপ পঞ্চাশ ভাগ এবং অন্যটিকে ত্রিশ ভাগ বা অন্য একটি মূল্যবোধকে দশ ভাগ গুরুত্ব দিয়েছে।

কোন কোন আরেফ কর্তৃক বুদ্ধিবৃত্তির অবমূল্যায়ন

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় পূর্ণ মানবকে এরফানের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছি। এরফানের পূর্ণ মানব, এমনকি ইসলামী এরফান যা অন্যান্য এরফান থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র ও ইসলামের প্রভাব যাতে অনেক বেশি এবং অনেক এরফানী ব্যক্তির উপস্থাপিত পূর্ণ মানব ইসলামের পূর্ণ মানবের খুবই নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দৃষ্টিতে তা পর্যালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। আমি এটা স্বীকার করি যে, এরফানী মতবাদ প্রাচীন এবং নব্য মতবাদগুলোর মধ্যে পূর্ণ মানবের বিষয়ে সর্বাধিক সমৃদ্ধ। প্রাচীন ও নতুন মতবাদগুলোর কোনটিই এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। তদুপরি এমন নয় যে, সমালোচনার ঊর্ধ্বে। বিগত আলোচনায় (ইসলামের মানদণ্ডের ভিত্তিতে) এরফানী মতবাদের ইনসানে কামেলকে আমরা

পর্যালোচনা করেছি। তার মধ্যে একটি বিষয় আমরা উল্লেখ করেছি যে, আরেফগণ অতিরঞ্জিতভাবে বুদ্ধিবৃত্তির অবমূল্যায়ন করেছেন। কখনো কখনো বুদ্ধিবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে অনির্ভরযোগ্য বলে অস্বীকার করেছেন।

ইশ্‌ক বা প্রেমকে যে তাঁরা আকলের উপর প্রাধান্য দান করেছেন সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। হাফেজ শিরাজীর ভাষায় 'প্রেমের মর্যাদা আকল হতে অনেক ঊর্ধ্বে'। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁরা কখনো অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছেন এবং চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিকেই অনির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। এমনকি কখনো একে 'হিজাবে আকবার' বা বড় প্রতিবন্ধক বলেছেন। আবার কখনো কোন দার্শনিককে সৌভাগ্যের সোপানে আরোহণ করতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন।

এ বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ কাহিনী বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আবু আলী সিনা যিনি বুদ্ধিবৃত্তিক মাশশায়ী মতবাদের একজন প্রখ্যাত দার্শনিক তিনি প্রসিদ্ধ আরেফ আবু সাঈদ আবুল খাইরের সমসাময়িক ছিলেন। আবু আলীর জন্মস্থান বাল্‌খ ও বোখারার নিকটবর্তী স্থানে কিন্তু পরবর্তীতে সুলতান মাহমুদের ভয়ে বাধ্য হয়ে (যেহেতু সুলতান মাহমুদ তাঁকে দরবারের সদস্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বু আলী রাজী ছিলেন না।) নিশাবুরে আসেন এবং সেখানে আবু সাঈদ আবুল খাইরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কথিত আছে তাঁরা তিন দিবা-রাত্রি একসঙ্গে ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন এবং নামাযের সময় ব্যতীত বের হতেন না। এরপর যখন তাঁরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলেন আবু আলীকে প্রশ্ন করা হলো, "আবু সাঈদকে কেমন দেখলেন?" উত্তর দিলেন, "যা আমরা জানি ও বুঝি উনি তা দেখেন।" আবু সাঈদকে প্রশ্ন করা হলো, "আবু আলীকে কেমন দেখলেন?" তিনি বললেন, "যেখানেই আমরা পৌঁছেছি, এ অন্ধ লাঠি নিয়ে আমাদের পেছনে পেছনে আসছে।"

আরেফগণ বাড়াবাড়ি রকম আকলকে অবমূল্যায়ন করেছেন। যদি আমরা কোরআনের যুক্তিকে একদিকে এবং এরফানী বা সুফীদের যুক্তিকে অন্যদিকে রাখি তাহলে দেখব আকলের ক্ষেত্রে এরা পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়। কোরআন এরফানী মতবাদ অপেক্ষা অনেক অনেক বেশি আকলকে মর্যাদা, সম্মান ও মূল্য দিয়েছে এবং বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আকলের উপর নির্ভর করেছে।

নির্বিশেষে শিয়া ও সুন্নী সকল আরেফই তাঁদের সিলসিলাকে আলী (আ.)-এ সমাপ্ত করেছেন। এমনকি সুন্নীদের যে অংশটির আহ্‌লে বাইতের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নেই তাদেরও সিলসিলা আলীতে সমাপ্ত হয়েছে। কথিত আছে, সাতষট্টি সিলসিলার মধ্যে মাত্র একটি সিলসিলা হযরত আবু বকরে পৌঁছে, বাকী সব সিলসিলার শুরু আলী থেকে। আলীকে সুফী ও আরেফগণ আরেফকুলের শিরোমণি (কুতবুল আরেফীন) মনে করেন। নাহজুল বালাগাহ্ যা এরফানের প্রাণকেন্দ্র– ইবনে আবিল হাদীদের ভাষায়– এ গ্রন্থে আলী চারটি বাক্যের মাধ্যমে আরেফদের সমগ্র চিন্তা ও চেতনাকে বর্ণনা করেছেন। এই একই আলী অন্য স্থানে এতটা দার্শনিক হয়ে যান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করেন যে,

কোন দার্শনিকও সেখানে পৌঁছতে সক্ষম নন। সুতরাং আলী (আ.) কখনই আকলকে তিরস্কার করেননি।

তাই এখানে দেখা যায়, ইসলামের ইনসানে কামেল এবং এরফানের ইনসানে কামেলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইসলামের পূর্ণ মানবের মধ্যে আকল বিকশিত হয়েছে, পূর্ণতা লাভ করেছে এবং একে বিশেষ সম্মান দান করা হয়েছে। অপরদিকে এরফানের ইনসানে কামেলের মধ্যে আকলের অবমূল্যায়ন হয়েছে। অন্য যে বিষয়টি এরফানের ইনসানে কামেলে উপেক্ষিত হয়েছে তা হলো সমাজমুখিতা যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

প্রকৃতি বিমুখতা

আজকের আলোচনায় অন্য একটি বিষয় উপস্থাপন করব। সেটা হলো এরফানের যুক্তি হচ্ছে "যা কিছু চাও তা নিজের থেকেই চাও" অর্থাৎ এরফান অন্তর্মুখী মতবাদ। এ মতবাদে অন্তর হলো বৃহত্তর বিশ্ব। যদি সমগ্র বিশ্বকে একদিকে এবং মানুষের অন্তঃকরণকে (অন্তঃকরণ বলতে আল্লাহ্পাক তাঁর থেকে যে রূহ মানুষের দেহে ফুৎকার করেছেন وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِى) অপরদিকে রাখা হয়, তবে অন্তঃকরণ তার থেকে বড় হবে। তারা বিশ্বকে 'ক্ষুদ্র মানুষ' এবং অন্তঃকরণকে 'বৃহৎ মানুষ' বলেন। যেহেতু তাঁরা বিশ্ব এবং অন্তঃকরণকে একই ধরনের মনে করেন এ অর্থে যে, একটি অপরটির সদৃশ সেজন্য বিশ্বকে 'ক্ষুদ্র বিশ্ব' এবং অন্তঃকরণকে 'বৃহৎ বিশ্ব' বলে অভিহিত করে থাকেন। মানুষকে ক্ষুদ্র বিশ্ব এবং বহির্বিশ্বকে বৃহৎ বিশ্ব বলাকে তাঁরা সমীচিন মনে করেন না। বরং যে বিশ্বকে আমরা বৃহৎ বিশ্ব বলি তাঁদের ভাষায় তা ক্ষুদ্র বিশ্ব এবং যে বিশ্বকে আমরা ক্ষুদ্র বিশ্ব বলি অর্থাৎ মানুষের অভ্যন্তরীণ বিশ্ব তা তাঁদের ভাষায় বৃহৎ বিশ্ব।

মাওলানা রুমী বলেন,

"এমন কিছু নেই পানির পাত্রে, যা থাকবে না নদীতে
এমন কিছু কি থাকবে ঘরেতে, যা থাকবে না শহরেতে?"

এটা সম্ভব কি কোন বস্তু ঘরে রয়েছে, কিন্তু শহরে তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটা সম্ভব নয়। কারণ ঘর শহরেরই অংশ। তাই যা ঘরে রয়েছে তা যা শহরে রয়েছে তারই নমুনা বৈ কিছু নয়। তেমনি এটাও সম্ভব নয় যে, একটি পাত্রে যে পানি রয়েছে তা নদীতে থাকবে না। যা পানির পাত্রে রয়েছে তা নদীর পানিরই একটি ক্ষুদ্র অংশ।

"এ পৃথিবী পানির পাত্র, হৃদয় যেথায় ঝরনা ধারা
এ বিশ্ব ঘরের রূপ অন্তর শহরই যেন বিস্ময়ে ভরা।"

তিনি এভাবে বলেননি যে, হৃদয় পানির পাত্র এবং পৃথিবী ঝরনা ধারা, বরং বলেছেন এ বিশ্ব পানির পাত্রস্বরূপ এবং হৃদয় ঝরনা ধারা। এ চিন্তাধারা মানুষকে কতটা বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে! মানুষ ঘরের উদ্দেশ্যে ছুটবে নাকি শহরের উদ্দেশ্যে? এখান থেকে বোঝা যায়, যা ঘরে রয়েছে তা যখন

শহরেও রয়েছে তখন মানুষ শহরের দিকেই ছুটবে। মানুষ কি ক্ষুদ্র পাত্রের পানির দিকে ছুটবে নাকি পানির ঝরনার দিকে? স্বভাবতঃই ঝরনা ধারার দিকেই তার প্রবণতা থাকবে।

এরফানের ভিত্তি অন্তর ও অন্তর্মুখিতা এবং বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্তরের দিকে দৃষ্টিদান। এমনকি সত্য ও হাকীকতকে যে বহির্বিশ্ব থেকে আহরণ সম্ভব তাও তাঁরা অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, অভ্যন্তর থেকেই তা আহরণ কর। হাফেজ শিরাজী বলেন,

"যুগ যুগ ধরে হৃদয় আমার সন্ধানে এক রত্ন আয়নার*
খুঁজছিল তা পরের কাছে যা রয়েছে অভ্যন্তরে আপনার
যে রত্নেরে পারে না করিতে ধারণ স্থান ও কাল
পথহারা সাগর যাত্রী হতে তা চাওয়া বৃথা আহ্বান
গিয়েছিলেম পীরের খানকায় এ সমস্যা নিয়ে গত রাতে
বললেন মাথা ঝুঁকে, এ সমস্যা রয়েছে পৃথিবীতে
দেখলাম তাঁরে বসে হাসিমুখে হাতে নিয়ে শরাবের পেয়ালা**
রত্ন আয়নায় শতরূপে বিশ্বকে দেখছেন, করছেন খেলা
বললাম তাঁরে, হে প্রজ্ঞাবান! কবে পেয়েছেন বিশ্বদৃষ্টির এ ভাণ্ডার
বললেন, যেদিন স্রষ্টা করেছেন বিশ্ব সৃষ্টি, দিয়েছেন তা আমায় উপহার
বুঝলাম আমি যদিও এ হৃদয়হারার নিকট রয়েছেন খোদা সর্বাবস্থায়
নিকটকে তিনি দেখেননি বলে ডেকে চলেছেন তারে দূরের আহ্বানে হায়।
আকলের সকল প্রচেষ্টা হয়েছে হেথায় ব্যর্থ
সামেরীর মত মূসার লাঠিও আলোকিত হাতের নিকট হয়েছে পরাস্ত।
বললেন পীর, বন্ধুকে*** আমার ঝুলানো হয়েছে ফাঁসির কাষ্ঠে
অপরাধ তার ছিল এটাই বলেছিল সে গোপন কথা প্রকাশ্যে।"

(*পূর্ণ মানব যার মধ্যে খোদার গুণাবলী প্রতিফলিত হয়েছে, **সুফী বা আরেফের হৃদয়, ***মানসুর হাল্লাজ)

মৌলভীর তুলনা

মৌলভী বা মাওলানা রুমী তাঁর মাসনভীর ষষ্ঠ অধ্যায়ে একটি গল্প রূপক অর্থে এনেছেন। এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে সর্বদা আল্লাহ্‌র নিকট গুপ্তধন চাইত। এ অলস ব্যক্তিটি যার মনোবাঞ্ছা হলো হঠাৎ করে গুপ্তধন অর্জনের মাধ্যমে সারা জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দেয়া। সে বলত, "হে খোদা! পৃথিবীতে এত লোক এসেছে তাদের অনেকেই মাটির নীচে গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছে। কত শত গুপ্তধনের মালিক তা পৃথিবীতে রেখে চলে গেছে। তাদের মধ্যে একটিকে আমাকে দেখিয়ে দাও।" দীর্ঘদিন দিবা-রাত্রি তার কাজ ছিল এ দোয়া করা। এক রাত্রিতে এ ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল এক আগন্তুক তাকে ডেকে বলছে, "আল্লাহ্ থেকে তুমি কি চাচ্ছ?" সে বলল, "গুপ্তধন।" আগন্তুক বলল, "আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তোমাকে গুপ্তধনের সন্ধান দান করব। আমি তোমাকে যেভাবে

নির্দেশনা দান করব ঠিক সেভাবে অমুক পাহাড়ের চূড়ায় তীর ও ধনুক নিয়ে উপস্থিত হও। পাহাড়ের অমুক স্থানে দাঁড়িয়ে তীর ধনুকে সংযোগ করলে যে স্থানে পড়বে সেখানেই গুপ্তধন রয়েছে।" সে ঘুম থেকে জেগে ভাবল, বাহ্! স্বপ্নে কত স্পষ্টভাবে তাকে সব জানানো হয়েছে! সে স্বপ্নের নির্দেশনা অনুযায়ী তীর-ধনুক নিয়ে নির্দিষ্ট পাহাড়ে গিয়ে দেখল যে, সব চিহ্ন ঠিক আছে। এখন শুধু নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে তীর নিক্ষেপ করার পালা। তখন হঠাৎ করে তার মনে পড়ল আগন্তুক তাকে কোন্ দিকে তীর নিক্ষেপ করতে হবে তা বলেনি। তাই সিদ্ধান্ত নিল প্রথমে যে কোন একদিকে (ধরি পশ্চিম দিকে) তীর নিক্ষেপ করব। ইনশাল্লাহ্ সেখানেই গুপ্তধন পাওয়া যাবে। এ ভেবে ধনুকে তীর সংযোগ করে সর্বশক্তি দিয়ে নিক্ষেপ করল। তীর যেখানে পড়ল শাবল ও বেলচা দিয়ে সেখানে খুঁড়তে লাগল। কিন্তু যতই খুঁড়ল কোন গুপ্তধন পেল না। মনে মনে ভাবল দিক নির্দিষ্ট করতে ভুল হয়েছে। তাই নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে গিয়ে অন্য দিকগুলোতে একে একে অনুরূপভাবে তীর নিক্ষেপ করল। কিন্তু প্রতিবারই বিফল হলো। খুঁড়ে খুঁড়ে সমগ্র স্থানটিকে গর্তে পরিণত করেও কোন গুপ্তধন পেতে ব্যর্থ হয়ে অসন্তুষ্ট চিত্তে মসজিদে ফিরে এসে আল্লাহ্কে উদ্দেশ্য করে বলল, "হে খোদা! কিরূপ নির্দেশনা দিলে যে, এত কষ্ট করেও কোন ফল পেলাম না।" এভাবে কাকুতি-মিনতি করা শুরু করল। কিছুদিন পর পুনরায় সে স্বপ্নে ঐ আগন্তুককে দেখে বলল, "আপনি আমাকে ভুল নির্দেশনা দিয়েছেন। আপনার কথা অনুযায়ী কাজ করে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।" আগন্তুক বলল, "তুমি কি করেছ?" সে বলল, "আপনার দেখিয়ে দেয়া স্থানে গিয়ে তীর-ধনুক সংযোগ করে প্রথমে পশ্চিম দিকে সর্বশক্তি দিয়ে নিক্ষেপ করেছি।" আগন্তুক বলল, "আমি তো তোমাকে তা বলিনি। তুমি আমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করনি। আমি বলেছিলাম তীর ধনুক সংযোগ করলে যেখানে পড়বে সেখানেই গুপ্তধন রয়েছে। বলিনি যে, সর্বশক্তি দিয়ে নিক্ষেপ কর।" সে বলল, "হ্যাঁ, তাই তো।" পরের দিন তীর-ধনুক, শাবল ও বেলচা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। তীর ধনুকে সংযোগ করে ছেড়ে দিলে তা নিজের পায়ের নিকটেই পড়ল। খুঁড়ে দেখল ঠিক সে স্থানেই গুপ্তধন রয়েছে। এখানে মাওলানা রুমী বলছেন,

"শাহ রগেরও নিকট রয়েছেন মহাসত্য দ্রষ্টা
দূরে ছুঁড়ে চিন্তার তীর তারে পাওয়ার তোমার প্রচেষ্টা
মহাসত্যের অনুসন্ধানী এ তীর ধনুকধারী
গুপ্তধন তোমার কাছেই খুঁজে দেখ তারি।"

এরফান 'নিজের থেকেই চাও', 'হৃদয় বিস্ময়ভরা শহর', 'বিশ্ব পানির পাত্র' এবং 'অন্তর ঝরনা ধারা', 'বিশ্ব ঘরস্বরূপ এবং হৃদয় শহর' প্রভৃতি পরিভাষার প্রতি অতিরিক্ত রকম নির্ভরশীল। অর্থাৎ বহির্বিশ্ব এবং প্রকৃতিজগৎ এখানে অত্যন্ত বেশি অবমূল্যায়িত হয়েছে। এরফানী মতবাদে প্রকৃতি কখনো কখনো ক্ষুদ্র একটি গ্রন্থ অপেক্ষাও গুরুত্বহীন বলে পরিচিত হয়েছে। একটি কবিতা যেখানে বিশ্বকে ক্ষুদ্র বিশ্ব এবং হৃদয়কে বৃহৎ বিশ্ব বলা হয়েছে তা আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবি তালিব (আ.)-এর বলে প্রসিদ্ধ। কবিতাটি এরূপ–

"উপশম তোমাতেই তা তুমি দেখ না।
আরোগ্যও তোমা হতে তা তুমি বোঝ না।

তুমি সেই স্পষ্ট কিতাব যার অক্ষর করে গোপনকে প্রকাশ।
তোমার দেহকে তাই ক্ষুদ্র ভাবার নেই অবকাশ।
তোমার এ দেহেই রক্ষিত হয়েছে তা
বৃহৎ এ বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে যা।"

এখন যদি আমরা এ চিন্তাধারাকে কোরআনের চিন্তাধারার সঙ্গে তুলনা করি তাহলে দেখব যদিও এ চিন্তাধারার অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে তদুপরি এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে একে অপূর্ণ মনে হয়, কারণ কোরআন প্রকৃতির বিষয়ে এতটা উদাসীন নয়, বরং কোরআনের দৃষ্টিতে অন্তর ও বহির্বিশ্ব (প্রকৃতি) পাশাপাশি থাকা উচিত যেমনটি সূরা হা মীম সিজদায় এসেছে–

سنريهم آيَاتُنَا فِى الافَاقِ وَ فِى أَنْفُسِهِم حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقّ

"অতি নিকট ভবিষ্যতে আমরা আমাদের নিদর্শনসমূহ প্রকৃতিতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে ব্যক্ত করব যাতে করে তাদের নিকট স্পষ্ট হয় যে তা (খোদা অথবা কোরআন) সত্য।"

অবশ্য আমি বিশ্বাস করি যে, মানুষের সর্বোচ্চ মানের পরিচিতি তার অভ্যন্তরে বর্তমান এবং অভ্যন্তর থেকেই তা অর্জন করতে হয়। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, বহির্বিশ্ব বা প্রকৃতিতে কিছুই নেই কিংবা বহির্বিশ্বে মহাসত্যের প্রতিফলন ঘটেনি এবং শুধু অন্তঃকরণই আল্লাহ্‌পাকের প্রতিফলন ক্ষেত্র। বরং অন্তর যেমন স্রষ্টার এক প্রতিফলন ক্ষেত্র তেমনি প্রকৃতিও।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক

এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির কিরূপ সম্পর্ক রয়েছে? মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক কি দু'টি অপরিচিত সত্তার সম্পর্কের মতো? অথবা এ সম্পর্ক বন্দি ও জেলখানা বা পাখি ও খাঁচার মতো? বা ইউসুফের সঙ্গে কেনানের গর্তের সম্পর্ক? এটা উদ্ঘাটিত হওয়া আবশ্যক।

হয়তো কেউ বলবেন, বাস্তবে পৃথিবীতে মানুষের আগমন পাখির খাঁচায় বন্দি হওয়া বা কোন মুক্ত ব্যক্তিকে বন্দিশালায় বন্দি করা বা ইউসুফের কূপে বা গর্তে পতিত হওয়ার মতো বিষয়। বাস্তবিকই যদি প্রকৃতি আমাদের জন্য বন্দিশালা, খাঁচা বা কূপ হয় তবে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক নির্দ্বিধায় বিপরীতমুখী।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা প্রকৃতিতে কিরূপ হওয়া উচিত? খাঁচায় বন্দি এক পাখির নিজেকে খাঁচা থেকে মুক্ত করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই। তেমনি এক বন্দিরও জেলখানার সঙ্গে সুসম্পর্ক নেই বরং সে চায় জেলখানার দেয়াল ভেঙ্গে নিজেকে মুক্ত করতে। হযরত ইউসুফও কূপে পড়ে এ প্রতীক্ষায়ই ছিলেন যে, কোন কাফেলা এসে পানি উঠানোর নিমিত্তে বালতি ফেলুক আর তিনি বালতিতে আরোহণ করে সেখান থেকে মুক্তি পান (সে ক্ষেত্রে কাফেলা পানির পরিবর্তে ইউসুফকে পাবে)।

এখন প্রশ্ন হলো কোরআন ও ইসলাম মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ককে বন্দি ও জেলখানা, ইউসুফ ও কূপ বা পাখি ও খাঁচার মতো মনে করে কিনা? অবশ্য এরফানে এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সানায়ী বলেছেন, "খাঁচা ভেঙ্গে এ ময়ূর উড়ে যাও আকাশে।" অন্য একজন আরেফ বলেছেন, "ইউসুফ! মিশরের সম্রাট হওয়ার জন্য কূপ থেকে বেরিয়ে আস।" বন্দি ও বন্দিশালার তুলনাও এ ক্ষেত্রে প্রচুর এসেছে।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কৃষকের সঙ্গে ক্ষেতের বা ব্যাবসায়ীর সঙ্গে ব্যবসা ক্ষেত্র অথবা উপাসক ও উপাসনালয়ের মতো। কৃষকের জন্য কৃষিক্ষেত্র লক্ষ্য নয় বরং মাধ্যম। তার জীবনযাত্রার স্থান তার ঘর কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে কাজ করার মাধ্যমেই সে তার এ ঘরের সাফল্য ও আনন্দ হস্তগত করে। একজন কৃষককে অবশ্যই কৃষিক্ষেত্রে গিয়ে লাঙ্গল চালাতে হবে, বীজ বপন করতে হবে, পানি সেচের মাধ্যমে জমিকে ফসলের উপযোগী করতে হবে, যদি আগাছা জন্মে তা পরিষ্কার করতে হবে। তারপরেই সে শস্য ঘরে তুলতে পারবে। اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الآخِرَة দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। (কুনুযুল হাকায়িক, মানায়ী, দাল অধ্যায়)

তবে কোন কৃষকের কৃষিক্ষেত্র ও ঘর চিনতে ভুল করা উচিত নয়। যদি কেউ তা করে তবে বড় ভুল করবে। তেমনি বাজার ব্যাবসায়ীর জন্য কর্মক্ষেত্র অর্থাৎ যেখানে সে তার পুঁজি ও কর্মপ্রচষ্টাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করবে। যে হাদীসটি আমি পড়েছি তা রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত। আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর নিকট থেকে অপর একটি হাদীস আছে যা হচ্ছে, اَلدُّنْيَا مَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّه "দুনিয়া আল্লাহ্‌র ওলীদের ব্যাবসাক্ষেত্র।"

একদিন এক ব্যক্তি আলী (আ.)-এর সম্মুখে দুনিয়াকে তিরস্কার করছিল। লোকটি জানত আলী দুনিয়াকে তিরস্কার করেন, কিন্তু কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে তা সে জানত না। হয়তো সে ভেবেছে আলীর দুনিয়াকে তিরস্কার করা প্রকৃতি জগতকে তিরস্কার করার মতো, কিন্তু জানত না যে, আলী দুনিয়া প্রেমে নিমজ্জিত হওয়া যা সত্য ও আল্লাহ্‌পাকের উপাসনা থেকে মানুষকে বিরত রাখে এবং মানবিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে সেটাকে তিরস্কার করেন (খোদ দুনিয়াকে নয়)। আলী (আ.) ঐ ব্যক্তির দুনিয়াকে তিরস্কার করাকে লক্ষ্য করে বললেন,

أَيُّهَا الذَّامُّ لِلدُّنْيَا, اَلْمُغْتَرُّ بِغُرُوْرِهَا, اَلْمَخْدُوْعُ بِأَبَاطِيْلِهَا أَتَغْتَرُّ بِالدُّنْيَا ثُمَّ تَذُمُّهَا؟ اَنْتَ الْمُتَجَرِّمُ عَلَيْهَا أَمْ هِيَ الْمُتَجَرِّمَةُ عَلَيْكَ؟

"হে দুনিয়াকে তিরস্কারকারী ব্যক্তি! যে দুনিয়ার প্রতারণায় পড়েছ, দুনিয়া তোমাকে প্রতারিত করেনি; বরং তুমি নিজেই প্রতারিত হয়েছ। সে তোমার উপর জুলুম করেছে নাকি তুমি তার উপর জুলুম করেছ?" সুতরাং দুনিয়া মানুষকে প্রতারিত করে না, বরং মানুষ নিজেই প্রতারিত হয়।"

এ ক্ষেত্রে আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি। কখনো হয়তো এক বৃদ্ধা মহিলা কৃত্রিম সাজ ও প্রসাধনীর মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে প্রতারিত করে। দাঁতহীন মুখে কৃত্রিম দাঁত, চুলবিহীন মাথায় কৃত্রিম লাগিয়ে আসে। আরব কবির ভাষায়–

"কোমর বাঁকা বৃদ্ধা হারিয়েছে লাবণ্য
তবুও হতে চায় যুবতী বলে গণ্য।"

এখন যদি কোন অভাগা ব্যক্তি এ বৃদ্ধাকে যুবতী মনে করে তার পানি গ্রহণ করে ও বুঝতে পারে যে, সে ভুল করেছে তবে এ ক্ষেত্রে এ বৃদ্ধা তাকে প্রতারিত করেছে। কিন্তু কোন বৃদ্ধা যদি নিজেই বলে, "জনাব, আমার বয়স ঊনষাট বছর ছয় মাস ছয় দিন।" নিজের দাঁত ও চুল দেখিয়ে বলে, "আমার দাঁত ও চুল নেই। আমার এ দাঁত ও চুল কৃত্রিম।" এভাবে সত্যকে বর্ণনা করে বলে, "আমাকে গ্রহণ করতে আপনি রাজী আছেন?" এমতাবস্থায় যদি সে ব্যক্তি তাকে বলে, "তোমার দাঁতহীন ঐ মুখের জন্য আমি উৎসর্গীকৃত। তোমার চুল নেই তাতে কি হয়েছে, তোমার চুলহীন মাথার জন্যই আমি নিবেদিত।" সে সত্য বলার পরও এ ব্যক্তি তাকে বলে, "বুঝতে পারছি তুমি নিজেকে গোপন করছ।" তখন কি বলা যাবে এ বৃদ্ধা তাকে প্রতারিত করেছে? না, বরং সে নিজেই প্রতারিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে নিজেকে প্রতারিত করেছে।

আলী (আ.) বলছেন, "দুনিয়া কারো নিকট কোন কিছুই গোপন করেনি। দুনিয়া যখন কোন কিছুই গোপন করেনি কিভাবে তাকে বল : আমাকে প্রতারিত করেছে। যে দিন নিজ হাতে নিজের পিতাকে দাফন করেছ সে দিন কি দুনিয়া বলেনি : আমাকে যেরূপ দেখছ অমি এরূপই পরিবর্তনীয়, আমার স্থায়িত্ব নেই। আমাকে যেরূপ দেখছ সেরূপ অনুধাবন কর। আমি যেরূপ নই সেরূপ আমাকে ভেব না। আমার রূপ সব সময় একই এবং সব সময় আমি তা প্রকাশ করছি, কিন্তু আমি যেরূপ নই তুমি সেরূপ ভাব। তাই দুনিয়া কাউকে প্রতারিত করে না, বরং মানুষ প্রতারিত হয়। اَنْتَ الْمُتَجَرَّمُ عَلَيْهَا أَمْ هِىَ الْمُتَجَرِّمَةُ عَلَيْكَ؟ (চিন্তা করে দেখ) দুনিয়া তোমার উপর জুলুম করেছে নাকি তুমি দুনিয়ার উপর জুলুম করেছ? দুনিয়া তোমার প্রতি খেয়ানত করেছে নাকি তুমি দুনিয়ার প্রতি খেয়ানত করেছ? مَتَى غَرَّتْكَ দুনিয়া কখন তোমাকে প্রতারিত করল? مَتَى اسْتَهْوَتْكَ কখন দুনিয়া তোমাকে প্রবৃত্তির চাহিদায় মশগুল করল?

أَ بِمصَارِعِ ابَائكَ مِن الْبِلَى؟ أَم بِمَضَاجِعِ أمّهَاتِكَ تَحْتَ الثَّرَى যে সময় তোমাদের পিতারা (পিতৃপুরুষ) ভূলুণ্ঠিত এবং মাতারা মাটির নীচের বিছানায় শায়িত (এবং তাদের দেহ পঁচে গেছে) সে সময়ও কি দুনিয়া তোমাকে প্রতারিত করেছে?" অতঃপর বললেন, اَلدُّنْيَا مَسْجِدُ احباء للّه "দুনিয়া আল্লাহ্‌র বন্ধুদের জন্য মসজিদ। যদি মসজিদ না থাকে তাহলে বান্দা কোথায় আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে? وَ مُصَلَّى مَلائِكَة اللّه وَ مَهْبِطُ وَحْيِ اللّه وَ مَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللّه দুনিয়া ফেরেশতাদের নামায স্থল, আল্লাহ্‌র ওহী নাযিলের স্থান এবং আল্লাহ্‌র ওলীদের জন্য ব্যাবসাস্থল। যদি বাজার না থাকে ব্যাবসায়ীরা ব্যাবসা করতে ও মুনাফ অর্জন করতে পারে কি?"

যে চিন্তা দুনিয়াকে মানুষের জন্য বন্দিশালা, খাঁচা বা কূপ বলে জানে ও ভাবে যে, মানুষের দায়িত্ব হলো এই বন্দিশালা বা খাঁচা ভেঙ্গে মুক্ত হওয়া বা কূপ থেকে বেরিয়ে আসা সে চিন্তা আত্মপরিচিতি ও আত্মাপরিচিতির ক্ষেত্রে অন্য একটি মৌল বিষয়ে বিশ্বাস রাখে যা ইসলামে গ্রহণীয় নয়।

পৃথিবীতে আত্মার পূর্ণতা

ইসলাম-পূর্ব যুগে কোন কোন দেশে বিশেষত গ্রীস ও ভারতে একটি বিশেষ বিশ্বাস ছিল। তা হলো মানুষের আত্মা পূর্বে অন্য এক জগতে পূর্ণরূপে সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীতে একে পাখিকে যেরূপ খাঁচায় বন্দি করা হয় তদ্রূপ এ পৃথিবীতে এনে বন্দি করা হয়েছে। যদি প্রকৃতই এরূপ হয় তবে অবশ্যই মানুষের উচিত এ খাঁচা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা। কিন্তু কোরআনে সূরা মুমিনুনে এ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এ আয়াতটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। মোল্লা সাদরা বলেন, "আমি আমার 'দেহের উৎপত্তি ও আত্মার মাধ্যমে বেঁচে থাকা (স্থায়ী হওয়া)' তত্ত্বটি এ আয়াত থেকে উদ্ঘাটন করেছি।" এ আয়াতটি যখন মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করছে তখন প্রথমে মানুষের মাটি হতে সৃষ্টি হওয়া থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে বীর্য, আলাকা (সংযুক্ত পিণ্ড), চর্বিত মাংসখণ্ড, অস্থিপাঁজর, অস্থিপাঁজর মাংস দ্বার আবৃত হওয়ার ধাপগুলো বর্ণনার পর বলছে, ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر "আমরা তাকে অন্য এক সৃষ্টিতে পরিবর্তন করে দিলাম।" (সূরা মুমিনুন : ১৪) অর্থাৎ মৌল ও যৌগ সমন্বয়ে গঠিত প্রাকৃতিক ও বস্তুগত এ জিনিসগুলোকে অন্য এক সৃষ্টিতে (অর্থাৎ রূহতে যা বস্তুগত নয়) পরিবর্তিত করে দিলাম অর্থাৎ রূহের উৎপত্তি এর প্রকৃতি থেকেই। রূহ বা আত্মা অবস্তুগত কিন্তু এ অবস্তুর উৎপত্তি বস্তু থেকেই। সুতরাং মানুষ অন্য জগতে পূর্ণরূপে কখনই ছিল না যার কারণে বলা যাবে যে, এ প্রথিবীতে তাকে খাঁচাবদ্ধ করা হয়েছে। বরং মানুষ এ পৃথিবীতে তার মায়ের কোলেই অবস্থান করছে। প্রকৃতি মানুষের আত্মার মাতা এবং মানুষ যখন এ প্রকৃতিতে জীবন যাপন করে তখন তার মায়ের কোলেই জীবন অতিবাহিত করছে। তাই তাকে এখানেই পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। সুতরাং মানুষ পূর্বেই পূর্ণতা লাভ করেনি ও পূর্ণতা লাভের পর এ পৃথিবীতে বন্দি বা কূপে পতিত নয় যে, তা থেকে মুক্তি পেতে হবে। এ চিন্তা ইসলামী নয়।

অবশ্য ইসলাম বলে তুমি সব সময় তোমার মাতৃক্রোড়ে থাকবে না। যদি সব সময় মাতৃক্রোড়ে থাকতে চাও তবে দুধের বাচ্চার মতই রয়ে যাবে, যুদ্ধের ময়দানের পুরুষ হতে পারবে না। যদি প্রকৃতি থেকে আরোহণ বা মাতৃক্রোড় থেকে উঠে উপরে না আস ও প্রকৃতিতেই থেকে যাও তবে ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ (সূরা ত্বীন : ৫ ও ৬) 'অতঃপর আমরা তাকে নিকৃষ্টতমদের মধ্যে নিকৃষ্টে পরিণত করি'– এ আয়াতের নমুনায় পরিণত হবে।

আর إِلا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ 'যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে'– এ আয়াতের নমুনায় পরিণত হতে পারবে না। যদি মানুষ হীনগ্রস্তদের মধ্যে হীনে পরিণত হয় অর্থাৎ প্রকৃতিতে বন্দি এ অর্থে যে, এর ঊর্ধ্বে আরোহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করে, এ অবস্থা অন্য দুনিয়ায় (আখেরাতে) তার জন্য জাহান্নাম তৈরি করবে। যেমন সূরা আল কারিয়াতে বলা হয়েছে,

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ "জাহান্নাম তার জন্য মাতায় পরিণত হবে।" আল্লাহ্পাক কোন শিশুকে প্রকৃতিরূপ এ মাতার গর্ভে জন্মদান করেছেন যাতে সে উপরে উঠে আসে, শিক্ষা গ্রহণ করে পূর্ণতা লাভ করে উর্ধ্বে আরোহণ করে। এখন যদি এ শিশু চিরকাল এখানে থাকতে চায় তবে তার অবস্থা এক বয়স্ক শিশুর মত (যদিও তুলনা সম্পূর্ণ ঠিক নয়) যার বয়স পঁচিশ বছর হওয়ার পরেও চায় মা তাকে পাশে শুইয়ে মুখে ফিডার দিয়ে ঘুম পাড়াক। এ ধরনের ব্যক্তির বাস্তবে কোন মূল্য নেই।

সুতরাং ইসলামের মানব ও বিশ্ব পরিচিতিতে এমন কোন কল্পিত মোরগের অস্তিত্ব নেই যে পবিত্র জগতে উন্মুক্ত পরিবেশে ঘুরে বেড়াত যাকে এ পৃথিবীতে এনে খাঁচাবদ্ধ করা হয়েছে। আরেফর ভাষায়– পবিত্র জগতের পাখি আমি শোনাব তোমায় বিচ্ছিন্নতার কাহিনী– আর তার দায়িত্ব হয়ে পড়েছে এ বন্দিত্বের খাঁচা ভেঙ্গে ফেলার। ইসলাম এটা গ্রহণ করে না।

যদি আপনারা কখনো শুনে থাকেন আত্মার জগৎ বস্তু জগতের উপর প্রাধান্য রাখে সেটা এ অর্থে যে, আত্মার প্রকৃতিগত প্রাধান্য রয়েছে যা এ অস্তিত্ব জগতে বিচ্ছুরিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তার এ প্রকাশ ভিন্ন জগৎ থেকে উৎসারিত হয়েছে। কিন্তু এমন নয় যে, তার পূর্ণ রূপ সেখানে ছিল পরবর্তীতে তাকে এখানে এনে খাঁচাবদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের চিন্তা হিন্দু ধর্মের পুনর্জন্ম বা প্লেটোর চিন্তাধারার অনুরূপ। গ্রীকদের মধ্যে প্লেটো বিশ্বাস করতেন, মানবাত্মা এ বিশ্বজগতের পূর্বে অন্য এক সদৃশ জগতে ছিল, কোন এক কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে তাকে এখানে এনে বন্দি করা হয়েছে। তাই তাকে এ বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেতে হবে। কিন্তু ইসলাম প্রকৃতি জগতকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না।

এরফান ও সুফীতত্ত্বের ইতিহাস সম্পর্কে অবগতদের জন্য বলছি আমার এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সকল আরেফই এ ভুলের মধ্যে ছিলেন বরং প্রসিদ্ধ আরেফগণের মধ্যে অনেকেই অন্ত তঃপক্ষে নিজেদের লেখনীতে এ বিষয়ে লক্ষ্য রেখেছেন। তাঁরা সমাজ বা প্রকৃতি কোনটিকেই ত্যাগ করেননি। কোরআন যে অন্তঃবিশ্ব ও বহিঃবিশ্ব দু'টিকেই পাশাপাশি এনেছে এবং দু'টিকেই স্রষ্টার নিদর্শন ও সৌন্দর্যের প্রতিফলন বলে মনে করে– এ বিষয়ে তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁদের অন্যতম মরহুম শাবেস্তারী যিনি মহান আরেফ তিনি তাঁর সুন্দর কবিতার মাধ্যমে মানব জগতের এ দিকটি তুলে ধরেছেন। যেমন বলেছেন,

"কর সেই মহান স্রষ্টার গুণকীর্তণ
যিনি দিয়েছেন দীক্ষা তোমায় চিন্তার
আর আপন নূরে করেছেন তোমার হৃদয়ে প্রদীপ সঞ্চার
তব অনুগ্রহে তাঁর দু'জাহান হয়েছে সমুজ্জ্বল
মাটির মানুষ হয়েছে সেথায় পুষ্পভূবন।"
অন্য এক স্থানে প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রেখে বলছেন,
"যার হৃদয় হয়েছে উজ্জ্বল নূরে খোদার
বিশ্ব জগতেরে দেখে যেন গ্রন্থ তার
বর্ণমালা মূল তার, শাখা কারক চিহ্ন*

নির্দেশনা এ গ্রন্থের পর্যায় বিরাম চিহ্ন।”

(*আরবীতে জবর, যের, পেশ ইত্যাদিকে اعراب বা কারক চিহ্ন বলা হয়)

আমার এ বিষয়গুলো উপস্থাপনের কারণ হলো আরেফগণ যে কখনো কখনো প্রকৃতির বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছেন তার নমুনা তুলে ধরা। এরূপ জামীর কবিতায় এসেছে–

“তরীকতের পীরের দাওয়াত শরাবের আসরে
সাকী এসো দ্রুত, লোকসান যে তা’খিরে (দেরীতে)
বিশ্ব আয়নাস্বরূপ যেথা সৌন্দর্যের প্রকাশ খোদার
দেখ এ প্রতিটি আয়নাতে রূপ যে তাঁর।”

যদি আমরা কোরআনকে একদিকে এবং এরফানকে অন্যদিকে রাখি তাহলে দেখব কোরআন প্রকৃতির বিষয়ে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে! আমরা বুঝতে পারব কোরআন প্রকৃতিকে এরফান অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, অথচ মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্যদান থেকেও দূরে সরে আসেনি। সুতরাং কোরআনের পূর্ণ মানব বুদ্ধিবৃত্তি ও আন্তরিক প্রবণতার সাথে সমাজ ও প্রকৃতি প্রবণতার দিকেও দৃষ্টি দিয়েছে। তবে এদের প্রতিটির গুরুত্ব কতটুকু তা সম্ভব হলে যখন ইসলামের পূর্ণ মানবের রূপ বর্ণনা করব সে আলোচনায় উপস্থাপন করব ইনশাল্লাহ্। এখানে শুধু এটুকুই বলছি যে, কোরআনের পূর্ণ মানব আকল, হৃদয়, প্রকৃতি ও সমাজকেন্দ্রিক।

আত্মবিসর্জন

গত বৈঠকের শেষে যে বিষয়টি উপস্থাপন করেছিলাম এ বৈঠকের শেষেও তা নিয়ে কিছু আলোচনা করব। কারণ এ আলোচনার কিছু ভূমিকা রয়েছে যা উপস্থাপন না করলে আমাদের আলোচনা অর্থহীন হয়ে পড়বে। শুধু যে বিষয়ে ইশারা করছি তা হলো ‘আত্মবিসর্জন’।

এরফান হৃদয়কে সম্মান দান করে। হৃদয়ের পাশাপাশি ‘নাফ্স’ বলে একটি বিষয় কোরআনে উপস্থাপিত হয়েছে যাকে এরফান হীন মনে করে। এরফানের দাওয়াতের একটি অংশ ‘আত্মবিসর্জন’, ‘আত্মদূরী’, ‘নিজেকে বড় না দেখা’, ‘স্বার্থপরতা ত্যাগ’ ইত্যাদি নিয়ে। এ বিষয়গুলো সত্তাগতভাবে ঠিক এবং ইসলাম একে সমর্থন করে। আমরা আমাদের পরবর্তী বৈঠকে আল্লাহ্র ইচ্ছা ও ক্ষমতায় এ বিষয়ে ইসলাম ও এরফানের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করব।

আমরা ইসলামে দু’টি সত্তা ও দু’টি নাফসের উল্লেখ দেখি। ইসলাম ব্যক্তির একটি সত্তাকে ক্ষুদ্রভাবে দেখে ও একে প্রত্যাখ্যান করে, আবার অন্য একটি সত্তাকে জীবিত ও প্রাণবন্ত করার জন্য চেষ্টা চালায়। বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এ বিষয়টি এরূপ যে, এক বন্ধু ও এক শত্রু পাশাপাশি এক সীমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং বন্ধুটি বিপদগ্রস্ত। যদি বন্ধুকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ি তবে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অথবা এর উদাহরণ এক শিশুর মতো যে গাছে উঠেছে ফল পাড়ার জন্য। ঘটনাক্রমে এক বিষাক্ত সাপ তার মাথার নিকট আবির্ভূত হয়েছে। এখানে একজন অতি দক্ষ শিকারীর প্রয়োজন যে সাপকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়বে, কিন্তু তাতে শিশুটির যাতে কোন ক্ষতি না হয়। যদি

শিকারী বিন্দুমাত্র ভুল করে তাহলে তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে– সাপের গায়ে না লেগে হয়তো বাচ্চার গায়ে লাগবে। তাতে সাপের মৃত্যু না ঘটে শিশুটির মৃত্যু ঘটবে। সুতরাং শিকারীকে এতটা নির্ভুল হতে হবে যাতে শিশুর বিন্দুমাত্র ক্ষতি না হয়, অথচ সাপটির মৃত্যু ঘটে। এখানেও তা-ই যেন বন্ধু ও শত্রু পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত, তোমাকে এমনভাবে তরবারী চালনা বা তীর নিক্ষেপ করতে হবে যেন শত্রুর মৃত্যু হয়, কিন্তু বন্ধুর ক্ষতি না হয়।

ইসলামের মোজেযা এখানেই যে, এ দ্বৈত সত্তাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছে, এ ক্ষেত্রে কোন ভুলই করেনি। আরেফগণের মধ্যে কখনো কখনো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ভুলক্রমে অভ্যন্তরীণ শত্রুসত্তার স্থলে বন্ধুসত্তাকে আক্রমণ করে বসেছেন। অর্থাৎ কখনো তাঁরা নাফ্স বা প্রবৃত্তিকে হত্যা না করে যাকে তাঁরা হৃদয় বা মনুষ্যত্ব বলেন তাকে হত্যা করে বসেছেন। এ সূক্ষ্ম বিষয়টি ইনশাল্লাহ্ পরবর্তী বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করব।

৯

এরফানী মতবাদের পর্যালোচনা

فَأَمَّا مَنْ طَغَى و ءاثر الْحَيوةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَأْوَى وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأْوَى. (সূরা নাযিয়াত : ৩৭-৪১)

পূর্ণ মানুষের বিষয়ে এরফানে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে, আর তা হলো মানুষের তার আপন সত্তার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে। অবশ্য এ বিষয়টি ইসলামীও বটে। তাসাউফ ও এরফানের ভাষায় যেমন স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, প্রবৃত্তির অনুসরণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিষয় রয়েছে তেমনি ইসলামেও; অবশ্য ইসলামী এরফান এ বিষয়গুলো ইসলাম থেকেই নিয়েছে এবং পরিভাষাগুলোও ইসলামী। কিন্তু এ পরিভাষাগুলোর কোন কোনটি সঠিক নয়। আজকের আলোচনায় আমরা এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করব।

আত্মশুদ্ধির বিষয়ে নাফ্সের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিষয় রয়েছে– আরবী 'নাফ্স' শব্দের বাংলা অর্থ হবে আত্ম বা নিজ। তাই যখন বলা হবে নাফ্সের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তখন নাফ্স মানুষের অভ্যন্তরীণ শত্রু বলে পরিগণ্য। যেমন সা'দী বলছেন,

"করছ শত্রু প্রবৃত্তির সঙ্গে একত্রে বাস
বৃথা কেন বহিঃশত্রুতে শক্তি নাশ।"

'নাফ্সের বিরুদ্ধে সংগ্রাম' পরিভাষাটি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বাণী থেকে নেয়া। তিনি বলছেন, أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِى بَيْنَ جَنْبَيْكَ (মেহজাতুল বাইদা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬)

"তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু তোমার নাফ্স বা প্রবৃত্তি যা তোমার দু'বক্ষ ও পৃষ্ঠের মধ্যে রয়েছে।" সা'দী গুলিস্তান গ্রন্থে বলেছেন, "একজন আরেফকে أَعْدَى عَدُوُّكَ نَفْسَكَ الَّتِى بَيْنَ جَنْبَيْكَ এ হাদীসটির অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : তোমার সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক শত্রু হলো তোমার নাফ্স। কারণ তুমি তোমার যে কোন শত্রুর প্রতি সদাচরণ কর এবং সে যা চায় তুমি তাকে তা দান কর, সে তোমার মিত্রতে পরিণত হবে। কিন্তু নাফ্স বা প্রবৃত্তি এমন যে, সে যা চায় তা তাকে যত দিবে সে তত বেশি তোমার শত্রুতে পরিণত হবে। সেজন্য নাফ্সকে একজন শত্রু হিসেবে দেখা হয়েছে। এখানে নাফ্স বলতে আত্ম ও প্রবৃত্তি পূজার কথা বলা হয়েছে।

এখন বিষয়টিকে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব, যে আত্মপূজা, স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তির তাড়নাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয় তা প্রকৃতপক্ষে কি?

স্বার্থপরতার প্রথম পর্যায়

স্বার্থপরতার একটি পর্যায় হচ্ছে মানুষ তখন আত্মকেন্দ্রিক হয় এ অর্থে যে, শুধু নিজের জন্যই কাজ করে, তার সকল কর্মকাণ্ড নিজেকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার প্রচেষ্টা নিজের জীবনকে নিয়ে। যেমন কিভাবে উদর পূর্তি হবে, কিভাবে দেহের জন্য পোশাকের, মাথা গোঁজার জন্য ঘর-বাড়ির ব্যবস্থা হবে এরূপ। এ পর্যায় পর্যন্ত চেষ্টা চালানো কি মন্দ? এটা কি নৈতিকতার দৃষ্টিতে মন্দ বা নৈতিকতার পরিপন্থী যে, মানুষ এ পর্যায়ের জন্য চেষ্টা চালাবে? জবাবে আমরা বলব, অবশ্যই এরূপ চেষ্টা নৈতিক নয় বা এ চেষ্টা মানবিক মূল্যবোধ বলে গণ্য হতে পারে না। কিন্তু আবার এটাও বলা যায় না যে, এ ধরনের প্রচেষ্টা নৈতিকতার পরিপন্থী বা এক নৈতিক অসুস্থতা।

এখানে নৈতিকতা ও নৈতিকতার বিরোধিতা নিয়ে কিছু কথা বলব। কোরআন মানুষের জন্য পশুর থেকে উত্তম এক মর্যাদায় বিশ্বাসী, সে সাথে মানুষের পশুর সম পর্যায়ের এবং পশুর থেকে নিম্ন পর্যায়ের অবস্থাও রয়েছে বলে মনে করে। অর্থাৎ মানুষ কখনো কখনো পশুত্বের পর্যায়ে, কখনো মূল্যবোধের মাধ্যমে পশুর থেকে উত্তম, কখনো বা ফেরেশতাদের থেকেও উত্তম অবস্থায় পৌঁছে। আবার কখনো মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মাধ্যমে শূন্যের নীচে নেমে আসে অর্থাৎ পশু থেকেও নিকৃষ্টে পরিণত হয়।

মানুষের কর্ম তিন ধরনের :

১. নৈতিক কর্ম অর্থাৎ পশু হতে উন্নত পর্যায়ের কর্ম।
২. নৈতিকতা বিরোধী কর্ম অর্থাৎ পশু হতে নিকৃষ্ট পর্যায়ের কর্ম।
৩. অনৈতিক কর্ম অর্থাৎ নৈতিক নয় কিন্তু আবার নৈতিকতা বিরোধীও নয় যা এক সাধারণ প্রাণীর কর্ম।

পৃথিবীতে আপনি এ ধরনের ব্যক্তিবর্গকে প্রচুর পরিমাণে পাবেন যাদের স্বভাব কবুতর বা ছাগলের মতো অর্থাৎ শুধু নিজের চিন্তায় আছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে এ চেষ্টায় মগ্ন হয় কিভাবে নিজের উদর পূর্ণ হবে– রাত অবধি কাজ করে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। এ ধরনের ব্যক্তির কর্ম নৈতিক নয়, কিন্তু তাকে নৈতিকতা বিরোধীও বলা যায় না।

স্বার্থপরতার দ্বিতীয় পর্যায়

আবার কখনো মানুষ নিজের বিষয়ে শুধু এ পর্যায়ে নেই যে, নিজের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান পেলেই ক্ষান্ত হয়, বরং তার মনুষ্য সত্তা এ ক্ষেত্রে তার পশু সত্তার খেদমতে নিয়োজিত হয় এবং এক ধরনের মানসিক রোগে পরিণত হয়। তখন সে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী শুধু নয়, বরং আরো অধিক সঞ্চয় অর্থাৎ আধিক্যের নেশায় মত্ত হয়ে সর্বাকাঙ্ক্ষীতে পরিণত হয়।

কবুতর পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য শস্যদানা জমা করে, এটি তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। একটি অশ্ব তৃণভূমিতে বিচরণ করে এ উদ্দেশ্যে যে, তার উদর পূর্তি হবে, এটাও প্রকৃতিগত। এখন কোন মানুষ যদি এ পর্যায়ে থাকে সে এ রকম একটি প্রাণীর পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু মানুষ কখনো কখনো লোভ ও লালসার হাতে বন্দি হয়ে পড়ে, তখন শুধু নিজের জীবনের জন্য সে কাজ করে না, বরং শুধু সঞ্চয়ের

উদ্দেশ্যেই কাজ করে। যত সঞ্চয় করতে থাকে তত অধিক পেতে চায়, এমনকি তা চাওয়ার আর সীমা থাকে না। এ অবস্থাকে আধিক্যের লালসা বলা হয়। এরূপ ব্যক্তি যেখানে দান করা উচিত সেখানে কৃপণতা করে। এটা একটি রোগ। রাসূল (সা.)-এর ভাষায়থ– شُحَّ مطاع সম্পদের কৃপণ। (সূরা হাশরের ৯ম আয়াতে এসেছে, شُحَّ نَفْسه এ ধরনের ব্যক্তির নিয়ন্ত্রক তার ইচ্ছা, চিন্তাশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি নয়, বরং এ মানসিক অবস্থাই (আধিক্যের লালসা) তার নিয়ন্ত্রক। অর্থ-সম্পদ তার হৃদয়ের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। তখন যুক্তি, চিন্তা সব কিছুই অর্থহীন। যদি যুক্তি, চিন্তা তার উপর ক্রিয়াশীল হতো, তবে সে বুঝত যে, কল্যাণ, মঙ্গল ও সাফল্যের জন্য কোন্ কোন্ স্থানে খরচ করা উচিত। কিন্তু আধিক্যের আকাঙ্ক্ষা তাকে এরূপ কর্মে উৎসাহ যোগায় না। লোভ ও আধিক্যের লালসা নৈতিকতা ও চরিত্র বিরোধী যা নৈতিকতার অবক্ষয় ও অসুস্থতার শামিল।

স্বার্থপরতার তৃতীয় পর্যায়

মানুষের মধ্যে তৃতীয় একটি পর্যায়ও রয়েছে। মানুষের আত্মিক রোগ শুধু লোভ ও আধিক্যের লালসার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যা মানুষকে কৃপণ করে তোলে। বরং কখনো কখনো মানুষ এর থেকে জটিল আত্মিক রোগে আক্রান্ত হয় যা শারীরিক রোগ হতে জটিলতর। এ রোগ বুদ্ধি ও যুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন এবং শুধু রোগীর আত্মিক অবস্থার সঙ্গেই সংগতিপূর্ণ। বর্তমান সময়ে এরূপ অসুস্থতাকে মানসিক জটিলতা বলা হয়। যেমন হিংসা এরূপ একটি রোগ। হিংসা মানুষের মধ্যে যুক্তির বিরোধিতার প্রবণতা সৃষ্টি করে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, মানুষ নিজের সাফল্যের চিন্তাকেও ভুলে যায় এবং কেবল অন্যের অকল্যাণের চিন্তায় মগ্ন থাকে। তার আকাঙ্ক্ষা নিজের সৌভাগ্য নয়। যদিও নিজের সৌভাগ্যের চিন্তা করে, তবে তার দ্বিগুণ অন্যের অকল্যাণের চিন্তা করে। এটা কোন যুক্তিতেই বোধগম্য নয়। কোন প্রাণীর মধ্যেই এ বৈশিষ্ট্য নেই যে, অন্য প্রাণীর দুর্ভাগ্যের আকাঙ্ক্ষা করে। অন্য প্রাণী নিজের পেটের চিন্তায়ই ক্ষান্ত হয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে এ অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

কখনো কখনো মানুষের মধ্যে অহংকারের জন্ম হয় বা তার আত্মার গভীরে এমন অনেক মানসিক জটিলতার সৃষ্টি হয় যা সে নিজেই জানে না। মানুষের প্রবৃত্তি তার মধ্যে এ সমস্যাগুলো সৃষ্টি করে।

আত্মপ্রবঞ্চনা

কখনো কখনো মানুষ নিজেই নিজেকে প্রতারণা করে। এটা কোন হিসেবেই বোঝা সম্ভব নয় কিরূপ মানুষ নিজের অভ্যন্তর হতে প্রতারিত হয়। কোরআন বলছে, بَلْ سولت لكم أَنْفُسكُم "বরং তোমরা নিজেরাই নিজেকে প্রবঞ্চিত কর।" আত্মপ্রবঞ্চনা মনোবিজ্ঞান সম্মত একটি যথার্থ পরিভাষা যা কোরআনে এসেছে।

আত্মপ্রবঞ্চনা অর্থ মানুষ কখনো কখনো নিজের অভ্যন্তর হতে প্রতারিত হয়। এ ধরনের ব্যক্তির মন যদি কোন কিছু চায় তাহলে ঐ বস্তুকে তার অন্তর এমন আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তার নিকট প্রদর্শন করে যে, ঐ বস্তুর বিষয়ে অলীক চিন্তা ও কল্পনা শুরু করে যাকে অতিরঞ্জন বলা যেতে পারে। এ কাজটি মানুষের মনোজগত নিজের থেকেই করে তাকে প্রতারিত করার জন্য। আত্মপ্রবঞ্চনা বাস্তবিকই আশ্চর্যের বিষয়। বর্তমানে মনোবিজ্ঞান উন্নয়নের শিখরে আরোহণ করে যথার্থ ও গভীরভাবে এ

বিষয়টি উদ্ঘাটনে সক্ষম হয়েছে। মনোবিজ্ঞানিগণ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কখনো কখনো দৈহিক বা স্নায়বিক বৈকল্য ব্যতীতই মানুষ পাগলামী করে যার কারণ তার অভ্যন্তরীণ মানসিক অবস্থা। উদাহরণস্বরূপ যখন দুঃখ সহ্য করা তার জন্য খুব কঠিন ও অসাধ্য হয়ে পড়ে তখন সে এ কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে।

কবির ভাষায়–

"হে সতর্কজন! জগতে যারেই দেখি কষ্ট সঙ্গী তার
হে মন! হও পাগল, কষ্ট তোমার সঙ্গী হবে না আর।"
এটা একটা মনোবিজ্ঞানগত মৌলতত্ত্ব।

আত্মপ্রবঞ্চনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরফানে এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। স্বার্থপরতার তৃতীয় পর্যায় এবং আত্মপ্রবঞ্চনা– বিষয় দু'টি মানুষকে নৈতিকতাবিরোধী করে তোলে, এটা একটা রোগ যা মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকেও নীচে নামিয়ে দেয়– এরফানে এ বিষয়গুলো সর্বোত্তমরূপে বর্ণিত হয়েছে এবং এমন অনেক বিষয় সেখানে উল্লিখিত হয়েছে যা মানুষকে আশ্চর্যান্বিত করে। আমাদের আশ্চর্য হতে হয় যে, ছয়-সাতশ বা হাজার বছর পূর্বে কিরূপে মনোবিজ্ঞানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁরা কথা বলেছেন যা বিংশ শতাব্দীর মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন।

যা হোক আত্মপ্রবঞ্চনার এ বিষয়টি আরেফগণ কোরআন থেকেই গ্রহণ করেছেন। যেহেতু আরেফগণ যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন তাই খুব ভালোভাবেই কোরাআন থেকে এ বিষয়টি হস্তগত করতে পেরেছেন। আমরা নীচের শিরোনামে মাওলানা রুমী থেকে আত্মপ্রবঞ্চনার বিষয়ে কিছু আলোচনা করব।

গোপন মানসিক জটিলতা

বর্তমানে এ বিষয়টি সর্বসম্মত যে, কখনো কখনো মানুষের মনের গহীনে মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহ তলানীর মত জমে থাকে (ঠিক চৌবাচ্চার নীচে জমে থাকা কাদার মত) যা বাইরে থেকে দৃশ্যমান নয়, এমনকি ঐ ব্যক্তি নিজেও এ সম্পর্কে সচেতন নয়। কোন বিশেষ এক অবস্থায় যখন তাতে নাড়া পড়ে, সে লক্ষ্য করে হঠাৎ করে তার অভ্যন্তর থেকে এ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশিত হতে শুরু করেছে, তখন সে নিজেই আশ্চর্যান্বিত হয়। মাঝে মাঝে সে বিশ্বাস করতে পারে না যে, তার মধ্যে এরূপ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। কখনো কখনো মানুষ নিজের প্রতি আস্থাবান হয় এ ভেবে যে, নিজের অন্তরে কোন কলুষতা নেই, কোন হিংসা-দ্বেষ নেই। কিন্তু কোন এক পরিস্থিতিতে (কোরআনের ভাষায় পরীক্ষার মুহূর্তে) পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে দেখে তার আত্ম অহংকার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, হিংসা-দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পাচ্ছে, অথচ এর কারণ অনুদ্ঘাটিত। মাওলানা রুমী বলেন,

"প্রবৃত্তি তোমার সুপ্ত অজগর কখন ঘুমিয়েছে
উপায়হীন বলেই সে নিষ্ক্রিয় রয়েছে।"

মানুষের প্রবৃত্তি বিষাক্ত সাপের মতো। বিষাক্ত সাপসমূহ শীতের সময় সুপ্তাবস্থায় নিশ্চল জীবন কাটায়। যদি কোন মানুষ তাকে স্পর্শ করে তবুও সে নড়াচড়া করে না। এমনকি কোন শিশু তাকে নিয়ে খেললেও তাকে কামড়ায় না। হয়তো কেউ ভাবতে পারে, এই সাপ খুব শান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু যখন গ্রীষ্মকালের সূর্যালোক এর উপর পতিত হয় যেন হঠাৎ করেই এ সাপের মধ্যে এক পরিবর্তন লক্ষ্য করা য়ায়। এক শিকারী যে পাহাড় থেকে শীতকালে একটি সাপ ধরে এনেছিল তার গল্প বলতে গিয়ে মোল্লা রুমী উপরিউক্ত এ কবিতার চরণটি এনেছেন যে,

"প্রবৃত্তি তোমার সুপ্ত অজগর কখন ঘুমিয়েছে
উপায়হীন বলেই সে নিষ্ক্রিয় রয়েছে।"

অর্থাৎ তুমি এটা ভেবো না, তোমার প্রবৃত্তি মৃত্যুবরণ করেছে বরং সে শত জরাগ্রস্ত অজগরের মতো, যদি গ্রীষ্মের উত্তাপ পায় তখন সে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।

মাওলানা অন্য একটি স্থানে মানুষের নাফ্সকে (প্রবৃত্তির সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে) এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যা মনোবিজ্ঞানীদেরও আশ্চর্যান্বিত করে। তিনি বলেছেন,

"প্রবৃত্তির বাসনা যেন জীবন্ত কুকুর
লুক্কায়িত আছে স্বাভ্যন্তরে তার সুরাসুর
নেই শক্তি তাই ক্রিয়াহীন শান্ততম
অগ্নি হতে দূরে পড়ে আছে যেন জ্বালানী কাষ্ঠসম।"

কখনো দেখেছেন, একদল কুকুর কোন স্থানে ঘুমিয়ে রয়েছে দু'পায়ে মাথা রেখে, চোখ দু'টি বন্ধ করে বিশ্রাম করছে, দেখে কেউ ভাববে একদল শান্ত ছাগলছানা বা মেষ যেন।

"যদি কভু মিলে শবদেহের সন্ধান
সহসা ঘটবে প্রকাশ লালসা অনির্বাণ।
পথে এক গাধার মৃতদেহ পতিত হলো যখন
শত ঘুমন্ত কুকুর জাগ্রত হলো তখন।"

কিন্তু যদি এদের সামনে (যে কুকুরগুলো ঘুমিয়ে রয়েছে একদল মেষের মতো পায়ের উপর হাত রেখে) একটি মৃতদেহ রাখা হয় তাহলে দেখা যাবে হঠাৎ করে এদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে, চোখগুলো সজাগ হয়ে গেছে, গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করছে, ক্রমে হিংস্র হয়ে উঠছে যেন তাদের প্রতিটি লোম একেকটি ধারালো দাঁতে পরিণত হয়েছে।

"সুপ্ত লালসা জেগে উঠেছে সহসা
পেয়েছে তাদের শবদেহের নেশা
প্রতিটি লোম যেন দাঁতে পরিণত হয়েছে
প্রতারণার ফন্দীত তাই লেজ নাড়ছে।"

এ পর্যন্ত উপমাস্বরূপ বলেছেন তারপর প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলছেন,

"শত কুকুর ঘুমিয়ে রয়েছে এ দেহে যে
শিকারই নেই তাই রয়েছে শান্তরূপে সে।"
অত্যন্ত সূক্ষ্ম, বাস্তব ও যথার্থ এ উপমা।

কোরআন ও হাদীসে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম

এ পর্যন্ত এরফান যা বলেছে তা যথার্থ এবং পুরোপুরি ঠিক। কোরআন-হাদীসও এ বিষয়টিকে সমর্থন করে, যা আলোচনা করতে গেলে দীর্ঘ হয়ে যাবে। সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষ তার পশুত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু নিজেকে নিয়েই ভাবে এবং এ পর্যায়ে অন্যের মঙ্গল-অমঙ্গলের চিন্তা না করাটা তার জন্য স্বাভাবিক, যেহেতু তার মধ্যে লোভ নামক এক ব্যাধি রয়েছে যা আত্মিক ও মানসিক বিভিন্ন জটিল রোগের সৃষ্টি করে। এ সবই সত্য, তবে এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কি? করণীয় এটাই যে, যখন প্রবৃত্তির মধ্যে লোভ জাগরিত হবে এবং প্রবৃত্তির বাসনা ঘুমন্ত কুকুরের মতো আত্মগোপন করে বা সুপ্তাবস্থায় থাকবে তখন তাকে বিনাশ করতে হবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে। অর্থাৎ যে প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট কর্মের দিকে আহ্বান জানায়– কোরআনের ভাষায় 'নাফ্‌সে আম্মারা বিস্ সু'– তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত হতে হবে। যে পর্যায়ে প্রবৃত্তি ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য এক টুকরা রুটি চায় তার এ চাওয়া নিকৃষ্ট কর্ম নয়, বরং তা প্রবৃত্তির সহজাত চাহিদা যা মঙ্গল করে। কিন্তু তার এ চাওয়া যখন লোভ, কৃপণতা, হিংসা, ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আকার লাভ করে তখন এ প্রবৃত্তিকে নিকৃষ্ট কর্মের প্রতি আহ্বানকারী বলা হবে। কোরআন এরূপ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বলেছে–

فَأَمَّا مَنْ طَغَى اثر الْحَيوةَ الدُّنْيَا وَ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.

"সুতরাং যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করে এবং এ দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয় পরিণামে নিশ্চয় জাহান্নামই হবে তার আবাসস্থল। কিন্তু যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের মর্যাদাকে ভয় করে এবং স্বীয় আত্মাকে নীচ কামনা-বাসনা হতে বিরত রাখে নিশ্চয় জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।" (সূরা নাযিয়াত : ৩৭-৪১)

সুতরাং কোরআন কুপ্রবৃত্তিকে মোকাবিলা করার এবং আত্মাকে নীচ কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখার আহ্বান জানায়। অন্য একস্থানে কোরআন বলছে, أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الهُهُ هَوَاهُ "ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ কি যে নিজের হীন প্রবৃত্তিকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে? অথবা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাষায় কোরআন বলছে, وَ مَا ابرى نَفْسِى إِنَّ النَّفْسَ لامَّارَةٌ بِالسُّوْءِ "আমি আমার নাফ্‌সকে ত্রুটিমুক্ত মনে করি না।" হযরত ইউসুফ যিনি নিজের উপর আস্থাবান হওয়া সত্ত্বেও বলছেন, إِنَّ النَّفْسَ لامَّارَةٌ بِالسُّوْءِ "নিশ্চয় প্রবৃত্তি মন্দ কাজের নির্দেশ প্রদানে অত্যন্ত তৎপর।" এটা বলার অর্থ মানবপ্রবৃত্তি বা সত্তা এত জটিল যে, সম্ভাবনা রয়েছে এর কোন এক স্থানে হয়তো কোন হীন বাসনা লুক্কায়িত রয়েছে যা সে নিজেই জানে না। তাই নিজের নাফ্‌সের উপর তিনি নির্ভর করেন না। প্রতিটি মুমিনই নাফ্‌সের মন্দ কাজের প্রতি ঝোঁকের কারণে তার প্রতি বিশ্বাস করেন না।

সুতরাং ইসলাম প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শুধু সমর্থনই করে না, বরং বাস্তবে নাফ্সের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিভাষাটিই ইসলামের। একদা একদল সাহাবী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করে সমবেতভাবে রাসূল (সা.)-এর সাথে দেখা করতে আসলে তিনি এ বিষয়টি উপস্থাপন করেন। দেখুন রাসূল কতটা সুযোগসন্ধানী (হেদায়েতের জন্য)! তিনি জানেন কোন্ মুহূর্তে কোন্ কথাটি বলতে হবে। একদল লোক যুদ্ধ হতে বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছে। রাসূল তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন সে সাথে সর্বোত্তম নৈতিক শিক্ষাটিও তাদের দিচ্ছেন–

مَرْحَبًا بِقَوْمٍ قَضَوا الْجِهَادَ الأَصْغَر وَ بَقِىَ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ الأَكْبَرُ "সাবাস হে ক্ষুদ্র দল যারা যুদ্ধ হয়ে ফিরে এসেছ, তোমাদের সামনে বড় যুদ্ধ রয়ে গেছে।" তাঁরা প্রশ্ন করলেন, "হে রাসূলাল্লাহ্! বড় যুদ্ধ কি?" রাসূল বললেন, "নাফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ।" নাফ্সে আম্মারা বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ অন্য মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে কঠিন। সুতরাং নাফ্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইসলামই বলেছে। তাই এ ক্ষেত্রে এরফানের বক্তব্য সঠিক।

তবে এরফানী বা সুফী মতবাদ নাফ্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে ব্যক্তিসত্তার উপর এতটা আঘাত হেনেছে যে, ইসলাম তাকে সমর্থন করে না। তবে আমি বলছি না যে, বড় আরেফগণও এ ভুলটি করেছেন, বরং আমার উদ্দেশ্য এটা বলা যে, এ মতবাদের প্রচুর ব্যক্তির মধ্যে এ ভুলটি লক্ষ্য করা যায়।

কঠিন সাধনার বিষয়টি যখন এতটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছায়– ইসলাম বলে তোমার দেহ তোমার উপর অধিকার রাখে– রাসূলের কোন কোন সাহাবী এরূপ কঠিন সাধনায় লিপ্ত হতে চেয়েছিলেন, রাসূল তাদেরকে এ থেকে বিরত রাখতে কঠিন ভূমিকা নেন। তদুপরি, কখনো কখনো দেখা যায় কেউ কেউ এরূপ সাধনায় লিপ্ত হন যা ইসলাম সমর্থন করে না। এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয়।

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম দু'ধরনের। কখনো যোগ সাধনার মাধ্যমে অর্থাৎ দেহকে প্রচণ্ড কষ্ট দানের মাধ্যমে। খুব কম খাদ্য গ্রহণ করে ও অত্যন্ত কম ঘুমিয়ে দেহকে এমনভাবে প্রস্তুত করা যাতে তাকে দিয়ে সব কিছু সহ্য করানো যায়। এরূপ যোগ সাধনার মাধ্যমে এমন অবস্থা করা সম্ভব যে, মানুষ দিনে মাত্র কয়েকটি বাদাম খেয়ে, ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৫ মিনিট ঘুমিয়ে অভ্যস্ত হতে পারে। দেহের উপর এরূপ যোগ সাধনা ভারতবর্ষের যোগীদের মধ্যে প্রচলিত। মুসলমানদের মধ্যে এটা কম দেখা যায়। কারণ ইসলাম এরূপ সাধনার প্রচলনকে অনুমতি দেয় না।

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্য পথটি দেহের উপর কষ্ট প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং কুপ্রবৃত্তি ও বক্র মানসিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রবৃত্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা। তবে এটাও একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। এ পদ্ধতিতেও কখনো কখনো এমন অনেক বিষয় লক্ষ্য করা যায় যা ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামের পূর্ণ মানব এরূপ নয়। এখানে এরূপ কিছু বিষয় আপনাদের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করব।

নিজেকে মন্দরূপে প্রচারের পদ্ধতি

সুফীপন্থীদের অনেকের মধ্যে একটি রীতি প্রচলিত রয়েছে যা সবার মধ্যে কম-বেশি প্রভাব ফেলেছে তা হলো বাহ্যিকভাবে নিজেকে মন্দ দেখানো বা 'মালামাতি পদ্ধতি'। মালামাতি পদ্ধতি কি? মালামাতি পদ্ধতি ঠিক রিয়া বা লোক দেখানো ভালোকর্মের বিপরীত বিষয়। রিয়াকারী ব্যক্তির অন্তর কলুষিত, কিন্তু বাহ্যিকভাবে লোক দেখানোর জন্য সে ভাল কাজ করে। মালামাতকারী ব্যক্তি ভালো মানুষ, কিন্তু মানুষ যেন তাকে ভালো মনে না করে সেজন্য বাহ্যিকভাবে খারাপ কাজ করার ভান করে। যেমন হয়তো সে মদ্য পান করে না, কিন্তু মদ্যপায়ীর মতো ভাব দেখায় কিংবা জেনা করে না কিন্তু বাহ্যিকভাবে এমন স্থান দিয়ে চলাফেরা করে যাতে সবাই তাকে তা মনে করে। কিন্তু কেন সে এরূপ করে? জবাবে বলে, আমার নাফ্সকে ধ্বংস ও দমন করার জন্য আমি এরূপ করি। বাস্তবিক অর্থে অবশ্যই তার এ কাজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের প্রতীক যেহেতু মানুষ চায় সাধারণের মধ্যে তার সম্মান থাকুক, মানুষ তাকে বিশ্বাস করুক, তদুপরি এরূপ ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কাজ করে যাতে কেউ তাকে বিশ্বাস না করে। কখনোবা মানুষের জিনিস নিয়ে অন্য স্থানে রাখে যাতে তাকে চোর মনে করে লোকে প্রহার করে। যদি কেউ বুঝতে না পারে তবে হয়তো সে জিনিস পূর্বের স্থানেই নিয়ে রাখত। কখনো মদের বোতল সঙ্গে বহন করে যদিও মদ্যপায়ী নয়।

এখন প্রশ্ন ইসলাম এরূপ কর্মকে সমর্থন করে কি? অবশ্যই নয়। ইসলাম বলে মুমিনের সম্মান একান্ত তার নিজের নয়। মুমিনের এ অধিকার নেই যে, এমন কাজ করবে যা মানুষের মধ্যে তার সম্মান ও মর্যাদার হানী ঘটাবে। ইসলাম যেরূপ লোক দেখানো ভালোর বেশ ধরা বা রিয়াকারীকে সমর্থন করে না তদ্রূপ বাহ্যিকভাবে মন্দ বেশ ধরাকেও সমর্থন করে না। ব্যবহারিক জীবনে এ দু'ধরনের মিথ্যার প্রকাশই ইসলামী দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য।

এরফানী সাহিত্য পবিত্র আধ্যাত্মিক অর্থসমূহকে বাহ্যিকভাবে অশালীন শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করেছে। যেমন মদ ও বাঁশী বা প্রেমিকা ও প্রেম প্রভৃতি। এটা এ কারণে যে, নিজেরা যা ছিলেন তা প্রদর্শন না করা। হাফেজ শিরাজী যিনি রিয়া ও মালামাত দু'টিরই বিরোধী ছিলেন তদুপরি তিনি এগুলো বলেছেন–

"এ হৃদয় চাও কি তোমায় করব পথ প্রদর্শন
কর না তবে দুশ্চরিত্রে অহংকার আর বকধার্মিকতার আকর্ষণ।"

হাফেজ যে মালামাত বা রিয়াবাদী কোনটিই ছিলেন না– এ কবিতায় তা বলছেন। যা হোক মালামাতি বা আত্মনিন্দা প্রচার সুফী মতবাদে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি পদ্ধতি যা ইসলাম গ্রহণ করে না। তবে সুফীদের মধ্যে সকলেই এরূপ ছিলেন না। সুফীদের মধ্যে অনেকেই খাজা আবদুল্লাহ্ আনসারীর মতো শরীয়তের বাহ্যিক আচার রক্ষায় অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। তদুপরি কারো কারো মতে এ বিষয়টি লক্ষণীয়। কথিত আছে, খোরাসানের সুফীদের মধ্যে মালামাতের প্রচলন অধিক ছিল। আমাদের কথা হলো ইসলাম আত্মনিন্দা প্রচার বা মালামাতকে অনুমোদন করে না।

তাসাউফ ও আত্মমর্যাদাবোধ

কখনো কখনো তাসাউফ বা সুফী মতবাদ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভের উদ্দেশ্যে (যাতে করে প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা যায় এবং সে কোন নির্দেশ দানে অপারগ হয়) আত্মসম্মানকে বিসর্জন দান করে। কিরূপে তা উদাহরণের মাধ্যমে বলছি। যেমন কোন ব্যক্তি হয়তো কোথায়ও নিজেকে আত্মমর্যাদা হানী হতে রক্ষা করতে পারে কিন্তু তা করে না। মুমিনের সম্মান বলে যে কিছু রয়েছে সুফী মতবাদের অনেকের কাছে এর অর্থ নেই।

এ মতবাদের অনেকের মধ্যেই একটি বিষয় প্রচলিত রয়েছে– যখন কোন মুরীদ (যে তাসাউফের পথে উস্তাদের অধীনে অগ্রসর হতে চায়) তার পীর বা শিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তখন সে পীর বা আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরু তাকে খুবই নীচ পর্যায়ের কাজ করার নির্দেশ দেন। যেমন তাকে বলে অবশ্যই তোমাকে কিছুদিন মেথরের কাজ বা পশুর মল সংগ্রহের, কখনো এর থেকে নিম্ন শ্রেণীর কোন কাজ করতে হবে যাতে তার নাফ্সের মৃত্যু ঘটে। এটা ইসলাম সমর্থন করে না।

ইবরাহীম আদহাম যিনি তাসাউফের একজন গুরু তিনি বলেন, "আমি আমার জীবনে কোন সময়েই তিনটি ঘটনায় যেরূপ খুশী হয়েছিলাম সেরূপ খুশী হতে পারিনি : একবার আমি অসুস্থ অবস্থায় মসজিদে শুয়েছিলাম। এতটা অসুস্থ ছিলাম যে, উঠবার মতো শক্তি ছিল না। এমন সময় মসজিদের খাদেম এসে সব ফকির ও মুসাফির যারা মসজিদে ঘুমিয়ে ছিল তাদের উঠিয়ে দিল। আমার নিকটও এসে রাগতস্বরে বলল : এ্যাই, উঠ! সেই সাথে পা দিয়ে আমাকে কয়েকটি লাথি মারল। যখন সে দেখল তবুও আমি উঠছি না তখন একটি মৃতদেহের মতো আমার পা ও হাত ধরে মসজিদের বাইরে ছুঁড়ে মারল। আমি এতে খুবই খুশী হলাম এ ভেবে যে, আমার নাফ্স যা সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করে তা এ অসম্মানের ফলে লাঞ্ছিত হচ্ছে ।

দ্বিতীয় ঘটনা হলো, একবার প্রচুর লোকের সঙ্গে নৌকায় করে যাচ্ছিলাম। ভাঁড় টাইপের এক লোক এই নৌকায় ছিল যে তার ভাঁড়ামো ও গল্প বলার মাধ্যমে নৌকার যাত্রীদের হাসাচ্ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলল : একবার এক যুদ্ধে কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ করলাম, যুদ্ধে অনেক কাফের হত্যা করলাম। তার মধ্যে এক দাড়িওয়ালা ছিল। আমি তার দাড়ি টেনে ধরলাম। এ কথা বলে এদিক ওদিক লক্ষ্য করে দাড়ি টানার কায়দা দেখানোর জন্য আমাকে ছাড়া অন্য কোন লোক না পেয়ে এসে আমার দাড়ি ধরে টেনে দেখালো। এতে সবাই হাসল। এখানেও খুব খুশী হয়েছিলাম নাফ্সের অপমান ও দুর্দশা দেখে।

তৃতীয় ঘটনা : এক শীতকালে রৌদ্রের মধ্যে কম্বল বের করে দেখলাম ছার পোকার পরিমাণ এত বেশী যে, পশম অধিক না ছারপোকা অধিক তা বুঝতে পারছিলাম না। তখন খুব খুশী হয়েছিলাম।"

হ্যাঁ, এ সবই নাফ্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এরূপ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ইসলাম সমর্থন করে না। কেন করে না তা পরে বর্ণনা করব। যে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম মানুষকে অসম্মানিত করে, প্রথমত কারো সঙ্গে ভাঁড়ামী করে লোক হাসানো একটি বেহুদা ও অশালীন কাজ যা ইসলাম সমর্থন করে না। দ্বিতীয়ত আমাকে কেউ অসম্মানিত করুক, ইসলাম এটাও চায় না। এটা কেমন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম যে, এক ব্যক্তি এসে আমার দাড়ি ধরে এদিক-ওদিক টানবে আর আমি

কিছুই বলব না? ইসলাম বলে, মুমিনের দায়িত্ব তার সম্মান ও মর্যাদার সীমা রক্ষা করা। ইসলামের বিধান অনুযায়ী ইবরাহীম আদহামের উপর ফরজ ছিল সেই ভাঁড়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলা, 'ভাঁড়ামো বন্ধ কর। বিতাড়িত হও, বেয়াদব!"

অন্য এক সুফী বলেন, "এক রাত্রিতে এক ব্যক্তি তার বাড়িতে ইফতারের জন্য আমাকে দাওয়াত দিয়েছিল, কিন্তু রাতে যখন তার দরজায় উপস্থিত হলাম তখন আমাকে তাড়িয়ে দিল। এরূপ দ্বিতীয়, তৃতীয় বার আমাকে দাওয়াত করেও আমার সঙ্গে এরূপ আচরণ করল। শেষে আশ্চর্য হয়ে বলল : আমি তোমাকে তিন বার দাওয়াত করে তিন বারই এরূপ আচরণ করেছি তারপরও আমি দাওয়াত করলে কেন আসো? আমি বললাম : কুকুরও এরূপ, তাকে শতবার বিতাড়িত করলেও বার বার ফিরে আসে।"

কিন্তু ইসলাম আত্মসম্মান ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করাকে বা অপমানিত হওয়াকে সমর্থন করতে পারে না। এর রহস্য এখানেই।

আমরা ইসলামে এক স্থানে দেখি যেখানে প্রবৃত্তির কথা এসেছে– তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলেছে, নাফ্স বা প্রবৃত্তিকে নিকৃষ্ট কর্মের দিকে আহ্বানকারী বলে উল্লেখ করেছে। অন্য স্থানে আবার নাফ্সের সম্মান বা আত্মমর্যাদাবোধের কথা একইভাবে বা আরো বেশি উল্লেখ করেছে। আসল কথা হলো মুমিনের নাফ্স সম্মানিত, স্বয়ং মুমিন মর্যাদার অধিকারী। তাই ইসলামী নৈতিকতা মান-মর্যাদার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। আর এজন্যই বলেছে "নিজের আত্মসম্মানের হানী করো না।"

এখন প্রশ্ন হলো এটা কিভাবে সম্ভব? ইসলাম একদিকে বলছে নাফ্সের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো আবার অন্য দিকে ব্যক্তিসত্তা ও মর্যাদাকে রক্ষার আহ্বান জানিয়ে বলছে আত্মসম্মানের হানী করো না। তাহলে কি দু'টি নাফ্সের অস্তিত্ব রয়েছে যার একটির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে এবং অন্যটিকে সম্মান দান করতে হবে?

জবাবে বলব, দু'টি নাফ্স এ অর্থে যে, ব্যক্তিসত্তা দু'টি এরূপ নয়। বরং বাস্তবে নাফ্স একটিই তবে তার উচ্চতর ও নিম্নতর পর্যায় রয়েছে। নাফ্সের উচ্চতর পর্যায় সম্মানিত ও মর্যাদার অধিকারী এবং এই নাফ্সই নিম্নতর পর্যায়ে যখন অসৎ পথে আহ্বান করে, তখন তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে হবে। এ বিষয়টিতে যেমনভাবে গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল, এরফানী মতবাদের কারো কারো মধ্যে সেরূপ লক্ষ্য করা যায় না। তাদের অনেকেরই ভাষায় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্থানে নাফ্সের সম্মানিত পর্যায়কেও আক্রমণ করা হয়েছে, শুধু নাফ্সের নিম্নতর পর্যায়ে তা সীমাবদ্ধ থাকেনি।

মানুষের প্রকৃত সত্তা

এখানে আরেকটি বিষয় যা নব্য দার্শনিকদের মধ্যেও প্রশ্ন হিসেবে এসেছে তা হলো মানুষের প্রকৃত সত্তা কোন্‌টি? এ ক্ষেত্রে দর্শনের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তাদের মতে মানুষের সত্তা হচ্ছে তার আত্মা ও অহম যাকে সে অনুভব করে। মানুষ তার সত্তাকে অনুভব করে অর্থাৎ তার আত্মাকে অনুভব করে। যখন তাকে বলা হয়, আমিত্ব কি? তখন সে বলে, আমার আত্মা।

মনস্তত্ত্ব বা মনোবিজ্ঞান বর্তমানে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, মানুষ আমিত্ব বলতে যা বুঝে বা অনুভব করে তা তার আমিত্বের একটি অংশ মাত্র। মানুষের আমিত্বের একটি বিরাট অংশ তার এ সত্তার অসচেতন অংশ যেটা সম্পর্কে সে নিজেই সচেতন নয়। অর্থাৎ বাহ্যিক অনুভূতির পরিসীমায় এ আমিত্বের অস্তিত্ব নয়। আরেফগণ এ ক্ষেত্রে সত্যিই অলৌকিকত্ব দেখিয়েছেন। মনোবিজ্ঞান হতে তাঁরা উচ্চ পর্যায়ে এবং গভীর ও যথার্থভাবে একে ব্যাখ্যা করেছেন। দার্শনিকদের বিরোধিতা করে তাঁরা বলেছেন, দর্শন ভুল করে বলেছে যে, মানুষের সত্তা হলো তার আত্মা। বরং মানুষের আমিত্ব এর থেকে আরো সূক্ষ্ম বিষয়। শাবেস্তারী বলেছেন,

"মানবাত্মা দেহ ও প্রাণ হতে ঊর্ধ্বে জেন,
দেহ ও প্রাণ তারই অংশ যদি তা মানো।"

অবশ্য আরেফগণ বলেন, মানুষ তখনই তার প্রকৃত সত্তায় পৌঁছতে পারে যখন সে তার স্রষ্টাকে চিনতে ও তার পরিচয় লাভ করতে পারে। আমার আত্মপরিচয় কখনই স্রষ্টার আত্মপরিচয় থেকে ভিন্ন নয়। যেমন কোরআন বলছে,

وَ لا تَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسىهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولائكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

"তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনিও তাদের আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন।" (সূরা হাশর : ১৯)

আরেফগণ বিশ্বাস করেন, মানুষের প্রকৃত সত্তা দর্শন যা বলে তা থেকে অনেক সূক্ষ্ম। শাবেস্তারী এরফানের জনক মহিউদ্দিন আরাবীর অনুকরণে তা-ই বলেছেন।

মাওলানা রুমী সুন্দরভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

"যে জন আপন সত্তা যুদ্ধে হারায়
সে জন পারে না দিতে অন্যেরে আপন পরিচয়
যে রূপেই আসে সে দিতে পরিচয়
কসম করে বলতে পারি সে তা নয়।"

যে ব্যক্তি তার সত্তাকে হারিয়েছে, বাজীতে সে সর্বোত্তম বস্তুকে হারিয়েছে। কোরআনও এরূপ বলেছে, قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ "সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সে সব ব্যক্তি যারা নিজেদের সত্তাকে হারিয়েছে।" (সূরা যুমার : ১৫)

মাওলানা রুমী অতঃপর তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে দলিল হিসেবে বলছেন,

"ক্ষণিক যদি হয়ে পড়ে সে একা বঞ্চিত
জগতের কষ্ট করে তারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।"

তিনি বলছেন, যখন একাকিত্ব বরণে সে বাধ্য হয় তখন এ একাকিত্বকে সে ভয় পায়। আমাদের মধ্যে ক'জন এরূপ আছেন যে, দশ দিন একাকী থাকব কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়ব না। জেলখানার এক

সেলে কাউকে একা বন্দি করে রাখলে তার জন্য তা সবচেয়ে বড় শাস্তি। যদি মানুষ নিজেকে প্রকৃতই চিনত তবে এরূপ অনুভব করত না।

"কখন তুমি হবে সেই একক ব্যক্তি
আপন সত্তায় মুগ্ধ ও সুন্দর অভিব্যক্তি।"

যদি তুমি নিজেকে উদাহরণ করতে পারতে তবে একাকিত্বের সময় কারো প্রয়োজন অনুভব করতে না। বরং আপন সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও বিভোর হতে। নিজেকে হারিয়েছ বলেই নিজের সত্তাকে অনুভব কর না ও একাকিত্বে ভয় পাও।

নিজের প্রকৃত সত্তাকে জানা ও উদ্ঘাটন আল্লাহ্‌র প্রতি মনঃসংযোগ ও ইবাদতের প্রাণ। মানুষ ইবাদতের মধ্যেই তার প্রকৃত সত্তা ও স্রষ্টার সান্নিধ্যকে অনুভব করে। সুতরাং আরেফগণ এ পর্যায় পর্যন্ত বিষয়টিকে অনুধাবন করেছেন। কিন্তু নাফ্‌সের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিষয়ে এরফান আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধের (মূলত যার উপর ভিত্তি করে মানুষ উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে) প্রতি খুব কমই দৃষ্টি দিয়েছেন। এত কম দৃষ্টি দিয়েছেন যে, বলা যায় একেবারেই নেই। যদি ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব আরেফগণ তাঁদের সকল দিক-নির্দেশনা ইসলাম থেকেই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এ দিক-নির্দেশনার প্রতি কম দৃষ্টি দিয়েছেন। সম্ভবত এ বিষয়টিকে তাঁরা তেমনভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন।

কোরআন ও হাদীসে আত্মমর্যাদাবোধ

ইসলামে যেমন প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামের নির্দেশ সম্বলিত বাণী–

উদাহরণস্বরূপ موتو قبلَ أَنْ تَموموا ,إِنَّ النَّفْسَ لامَّارة بِالسُّوْءِ نَهَى النَّفْس عَنِ الْهَوَى এবং قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىهاَ وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّىهَا – রয়েছে তেমনি আত্মমর্যাদাবোধের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। তার নমুনা হচ্ছে সূরা মুনাফিকুনের এ আয়াত– وَ لِلَّهِ عِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ "সম্মান আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্য।" কোরআন বলেনি যে, আত্মমর্যাদাবোধ আত্মপূজার শামিল। মানুষ যেহেতু প্রকৃতিগতভাবেই অন্য মানুষের মুখাপেক্ষী তাই প্রয়োজন উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি (আত্মসম্মানবোধ) লক্ষ্য রাখার জন্য উপদেশ দিয়ে রাসূল (সা.) বলেছেন, اُطْلُبُوْا الْحَوائِجَ بِعزَّة الأَنْفُسِ "তোমার প্রয়োজনকে আত্মসম্মান বজায় রেখে চাও" অর্থাৎ কারো নিকট ব্যক্তিত্ব হানী করে কিছু চেয়ো না। তাতে তোমার সম্মান থাকবে না। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের অজুহাতে ভিক্ষুকের মতো কারো নিকট কিছু চাইবে না। কারণ ইসলাম তার অনুমতি দেয় না। যদি প্রয়োজনে মানুষের দ্বারস্থ হতে হয় তাহলে আত্মসম্মান বজায় রেখে তা চাও ও নাও।

লক্ষ্য করুন আলী (আ.) যুদ্ধের ময়দানে কি বলছেন,

فَالْمَوْتُ فِى حَيَاتِكُمْ مَقْهُوْرِيْنَ وَ الْحَيَاةُ فِى مَوْتِكُمْ قَاهِرِيْنَ

"তোমাদের প্রকৃত মৃত্যু অন্যের আনুগত্যের মধ্যে বেঁচে থাকা এবং প্রকৃত জীবন হলো স্বাধীনভাবে মৃত্যু লাভের মধ্যে।" (নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ৫১) এখানে তিনি আত্মমর্যাদাবোধের কথাই বলেছেন।

"কাঁদিয়ে বন্ধুদের তুমি মৃত্যুকে করেছ বরণ
হাসত দুশমন যদি বেঁচে করতে কারাবরণ।
আমার ঘৃণা সেই জীবনের প্রতি
যদি বেঁচে থেকে করি স্বীকার শত্রুর নতি।"

ইমামা হুসাইন (আ.) বলেন, مَوْتٌ فِى عِزٍّ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِى ذُلٍّ "সম্মানের সঙ্গে মৃত্যু অসম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকা অপেক্ষা উত্তম।" (মুলহাকাতু ইহকাকিল হাক্ব) ইমাম হুসাইনের দর্শন এটা বলে না যে, নাফ্সের সাথে সংগ্রামের অজুহাতে ইয়াযীদ ও ইবনে জিয়াদের নিকট আত্মসম্মানকে বিকিয়ে দিতে হবে। তাই তিনি বলছেন,

الا وَ انَّ الدّعِىَّ ابْنَ الدَّعِى قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اثنتين بين السلّةِ وَ الْذلّةِ وَ هَيْهَات مِنَّا الذلة يأبى اللّه ذلك لنَا وَ رَسْوْلُهُ وَ الْمُؤْمِنُوْن وَ حجورٌ طَابَتْ وَ طهرت

"জিয়াদের পুত্র, এই কাপুরুষের পুত্র কাপুরুষ আমাকে এ দু'শর্তের মধ্যে ফেলেছে, হয় অপমানকে গ্রহণ করব (বাইয়াত করব), নতুবা যুদ্ধ। অপমান আমাদের থেকে দূরে। আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সা.) এবং মুমিনীন আমাদের জন্য তা কখনও মেনে নিতে পারে না।" (লুহুফ ইবনে তাউস, পৃ. ৮৫)

এ কথার মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করছেন না, বরং বলতে চাচ্ছেন, আমার দীন আমাকে এ অনুমতি দেয় না, আমার স্রষ্টা এ কাজকে অনুমোদন করেন না। নবীও তা চান না। যে পিতা-মাতার ক্রোড়ে আমি মানুষ হয়েছি তাঁরা তা পছন্দ করেন না। আমি হযরত ফাতেমা যাহ্রার দুগ্ধে প্রতিপালিত হয়েছি। এ দুগ্ধ আমাকে এ কাজের অনুমতি দেয় না। ফাতেমা (আ.) আমাকে ডেকে যেন বলছেন : হুসাইন! তুমি আমার দুগ্ধে মানুষ হয়েছ, যে আমার দুগ্ধে প্রতিপালিত হয়েছে সে অপমানকে মেনে নিতে পারে না।" তাই ইমাম হুসাইন বলেননি, "ইবনে জিয়াদ যা করার করুক, চলো আমরা তার বাইয়াত গ্রহণ করি। সে তো আমাদের অপমান ছাড়া কিছু করবে না। যত অপমান হবে তত নাফ্সের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হবে।" না, তিনি কখনই তা করতে পারেন না। বরং বলেছেন, لا وَ اللّه لا اعطِيْكُمْ بِيَدِى اعطَاع الذَّلِيْل وَ لا افِرُّ فَرَار الْعَبِيْد "আমি কখনই তোমাদের দিকে অপমানের হাত প্রসারিত করব না। কোন দাসের মতো পলায়ন করব না।" অন্য রেওয়ায়েতে "কোন দাসের মতো স্বীকার করব না" এসেছে। এ ধরনের বক্তব্য কোরআনে এবং ইমামগণের বাণীতে বিশেষত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কথায় প্রচুর এসেছে।

যুবকদের প্রতি উপদেশ

জাভিদ মসজিদে আমি যে বিষয়টি বলেছি এখানে তার পুনরাবৃত্তি করছি। সেখানে এক বৈঠকে ইমাম হুসাইনের বাণী বলে প্রচারিত 'জীবন বিশ্বাস (আকীদা) ও সংগ্রাম ছাড়া কিছু নয়' কথাটি যে ইমাম হুসাইনের নয় তা বলেছি। কারণ কোন ইসলামী গ্রন্থেই এর পক্ষে কোন দলিল নেই। এ বাক্যের অর্থও সঠিক নয় এবং ইমাম হুসাইনের যুক্তির সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইসলামের যুক্তি এরূপ নয় যে, মানুষ তার জীবনের জন্য কোন বিশ্বাসকে গ্রহণ করবে এবং তার জন্য সংগ্রাম করতে থাকবে। ইসলামে বিশ্বাসের চেয়ে সত্যের প্রতি গুরুত্ব অধিক। তাই জীবনের অর্থ সত্যের অনুসন্ধান এবং সত্যের জন্য সংগ্রাম। বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম একটি পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রসূত বিষয় যা পাশ্চাত্যে ছিল এবং পরবর্তীতে মুসলমানদের মধ্যে প্রচার লাভ করেছে।

তোমার চিন্তাকে তোমার জীবনের জন্য হাতিয়ার হিসেবে ধর এবং এর দ্বারা সংগ্রামে লিপ্ত হও। জীবন আকীদা ও সংগ্রাম ছাড়া কিছু নয়– এ কথাগুলো যে ইমাম হুসাইন থেকে নয় তা বলায় কিছু যুবক মর্মাহত হয়েছে। কারণ এ বাক্যগুলোকে তারা পছন্দ করেছে এবং ভাবছে যদি তা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর নিকট থেকে হয় তাহলে কত উত্তম! প্রথমত আমি আমাদের পূর্বসূরিদের মতো যুবকদেরও সত্যানুসন্ধানী বলে সম্মানের পাত্র বলে মনে করি। যুক্তিহীনভাবে কোন বিশ্বাসের প্রতি গোঁড়ামি পছন্দনীয় নয়। যদি এমন হয় যে, নতুন প্রজন্মের মাথায় কিছু ঢুকলে তা বের করা সম্ভব হয় না, সে বিষয়ে কথা বলা যায় না, তবে এ প্রজন্মকে স্থবির প্রজন্ম বলতে হবে। তাহলে দেখা যাবে একজনের একটি কথা ভাল লেগেছে সে সেটা আঁকড়ে ধরবে, অন্যজন অন্য একটি কথাকে অনুরূপভাবে।

দ্বিতীয়ত এখন তোমরা তোমাদেরই এক বন্ধুর মুখে শুনতে পেয়েছ যে, এ কথাটি ইসলামের যুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং কোন ইসলামী গ্রন্থে এ কথার ভিত্তি নেই। ধরা যাক, তোমাদের শত্রু ও অমুসলমান কোন ব্যক্তি তোমাদের সব সময় বলতে থাকে 'জীবন বিশ্বাস ও সংগ্রাম ছাড়া কিছু নয়' এ কথাটি ইমাম হুসাইনের। তোমাদের প্রশ্ন করা উচিত, জনাব, ইমাম হুসাইন যা যা বলেছেন তা কোন না কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে অবশ্যই রয়েছে। ইমাম হুসাইনের এ কথাটি কোন্ গ্রন্থে রয়েছে তা আমাকে দেখিয়ে দিন যাতে করে যারা বলে এ কথাটি ইমাম হুসাইনের নয় তাদের নিকট প্রমাণ করতে পারি যে, এটা ইমাম হতে। কিন্তু কোথাও তা খুঁজে না পেয়ে অবশেষে আমাকে যখন বলবে, "আমাদের মধ্যে প্রচলিত এ কথাটি ইমাম হুসাইনের নয় তা কেন আমাদের জানাননি? কেন আপনারা (আলেমরা) এ বিষয়ে এতদিন নীরব থেকেছেন?"

তৃতীয়ত তোমরা যদি বিপ্লবী বাণীসমূহের প্রতি আসক্ত হয়ে থাক, তবে 'জীবন বিশ্বাস ও সংগ্রাম ছাড়া কিছু নয়'–এ কথা অপেক্ষা শতগুণ বিপ্লবী বাণী ইমাম হুসাইন হতে রয়েছে। আজকের বৈঠকেই ইমাম হুসাইনের যে বাণীটি– 'সম্মানের মধ্যে মৃত্যু অপমানের সঙ্গে বেঁচে থাকা হতে উত্তম'– পড়েছি সেটি বেশি বিপ্লবী নাকি 'জীবন বিশ্বাস ও সংগ্রাম ছাড়া কিছু নয়' এটি? অথবা 'অপমান হতে মৃত্যু শ্রেয়। অপমান জাহান্নামে প্রবেশ হতে উত্তম' (নাফ্সিল হুমুম, পৃ. ১২৭; বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৭৮, পৃ. ২১৯)–এ কথাটি অধিক বিপ্লবী।

এরূপ অসংখ্য বিপ্লবী বাণী, যেমন 'এই কাপুরুষের পুত্র কাপুরুষ আমাকে দু'শর্তের মধ্যে ফেলেছে– অপমান নতুবা যুদ্ধ। অপমান আমাদের কখনও স্পর্শ করতে পারে না। আল্লাহ্, তাঁর রাসূল

ও মুমিনগণ আমাদের জন্য কখনও তা মেনে নিতে পারে না। আমাদের হারিম পাক ও পবিত্র।" (লুহুফ, পৃ. ৮৫) এবং "যারা জীবনকে আমাদের জন্য উৎসর্গ করবে এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্যের জন্য আগ্রহী তারা আমাদের সঙ্গে আস। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি যাত্রাশীল।" (লুহুফ, পৃ. ৫৩; কাশফুল গাম্মা, পৃ. ১৮৪)

সুতরাং আমাদের বিপ্লবী বাণীর দারিদ্র্য নেই। যদি বিপ্লবী বাণীর দারিদ্র্য থাকত তদুপরি বলা ঠিক হতো না যে, এ বাণীটি ইমাম হুসাইনের। আল্লাহ্‌র নিকট এরূপ কর্ম হতে আশ্রয় চাই। তবে বাস্তব তো এর বিপরীত কথাই বলে। আমাদের নিকট ইমাম হুসাইন (আ.)-এর নিকট থেকে, এমনকি তাঁর পিতা, মাতা, সন্তানদের নিকট থেকেও এত অধিক বিপ্লবী বাণী রয়েছে যে, বিশ্ব তা থেকে ধার নিতে পারে। তাই কেন আমরা অন্যদের ভ্রান্ত বাণীকে ধার করব? নতুন প্রজন্মের তাই এ গোঁড়ামি থাকা উচিত নয়।

তদুপরি আমি দাবি করছি, যদি কেউ এসে প্রমাণ করতে পারেন এ বাণীটি ইমাম হুসাইনের তাহলে এ মিম্বারে এসেই আমি ভুল স্বীকার করব। কিন্তু আমাদের অবশ্যই উচিত প্রামাণ্য কথা বলা এবং অপ্রামাণ্য কথা বলা থেকে দূরে থাকা। যেহেতু সময় শেষ হয়ে গেছে (যদিও এ বিষয়ে প্রচুর কথা রয়েছে) সেহেতু এখানেই শেষ করছি।

আমাদের আলোচনার যা মূল ছিল তা হলো সুফী সাহিত্যে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে এতটা বাড়াবাড়ি করা হয়েছে যে, কখনো কখনো আত্মসম্মানবোধের হানী হয়েছে। যদি এ বিষয়টিকে ইসলামী মানদণ্ডের সঙ্গে যাচাই করি তবে দেখব এ বিষয়টির সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

১০

ক্ষমতার মতবাদের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

وَكَأَيِّن مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَ هَنُوْا لِمَا أَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ مَا ضَعُفُوْا وَ مَا اسْتَكَانُوْا وَ اللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ. (সূরা আলে ইমরান : ১৪৬)

পূর্ণ, আদর্শ ও উচ্চতর মানুষের বিষয়ে অন্য যে মতবাদটি প্রচলিত তা হচ্ছে ক্ষমতার মতবাদ। এ মতবাদে পূর্ণ মানব অর্থ ক্ষমতাবান ও শক্তির অধিকারী মানুষ। অন্য অর্থে এ মতবাদে পূর্ণতা ও ক্ষমতা সমার্থক এবং অক্ষমতা ও অপারগতা অপূর্ণতার সমার্থক। যে ব্যক্তি যত ক্ষমতাবান সে তত বেশি পূর্ণ এবং যে ব্যক্তি যত দুর্বল সে তত ত্রুটিপূর্ণ। সত্য ও ন্যায় ক্ষমতা ও শক্তি ব্যতীত কিছু নয়। যদি দু'শক্তি পরস্পরের মোকাবিলায় দাঁড়ায় তখন আমরা জয় পরাজয়ের ভিত্তিতে নয়, বরং অন্য মানদণ্ডে বলি এ পক্ষ সত্যপন্থী ও অন্য পক্ষ বাতিল বা অত্যাচারী। কোথাও হয়তো সত্য মিথ্যা ও জুলুমকে পরাস্ত করে, কোথাও বাতিল সত্যপন্থীদের পরাজিত করে। অবশ্য কোরআনের যুক্তিতে শেষ বিজয় সত্য ও হক্বের পক্ষে। বাতিল হয়তো সাময়িকভাবে জয়লাভ করতে পারে, তবে তা চিরস্থায়ী নয়। তবে দু'শক্তি যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যে দল জয়ী হবে তাকেই কোরআন হক্ব বলে মনে করে না বা যে দল পরাজিত হবে তাকেও বাতিল বলে মনে করে না। কিন্তু ক্ষমতার মতবাদের দৃষ্টিতে যে দল বিপরীত পক্ষকে পরাজিত করবে সে-ই ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। শক্তিধর পক্ষ যা করবে, সেটাই ন্যায়।

ক্ষমতার মতবাদের ইতিহাস

এ মতবাদ অনেক প্রাচীন এবং এর ইতিহাস সক্রেটিসের সময়েরও পূর্বের। সক্রেটিস হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের চারশ' বছর পূর্বের মানুষ। তখন থেকে ২৪০০ অথবা ২৫০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সক্রেটিসের পূর্বে একদল লোক ছিলেন দর্শনে তাঁদেরকে সফিস্ট বা সন্দেহবাদী বলা হয়। এঁরা সামাজিক বিষয়ে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। এ দৃষ্টিভঙ্গি প্লেটো ও সক্রেটিসের আবির্ভাবের মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়। হযরত ঈসার আবির্ভাবের মাধ্যমে এ মতবাদের সমাধি ঘটে, যেহেতু খ্রিষ্ট মতবাদ এর ঠিক বিপরীত একটি মতবাদ। অর্থাৎ খ্রিষ্ট মতবাদ ক্ষমতার বিরুদ্ধেই শুধু প্রচার চালায় না, বরং দুর্বলের পক্ষে প্রচার চালায়। খ্রিষ্ট মতবাদে বলা হয়, কেউ তোমার ডান গালে চড় বসিয়ে দিলে বাম গালটিও এগিয়ে দাও, নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করো না। এটি দুর্বলতার মতবাদের পক্ষের একটি প্রচার বৈ কিছু নয়। পৃথিবীতে ইসলামের আগমনের ফলে ক্ষমতা ও শক্তির ক্ষেত্রে অপর এক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে যা স্বভাবতঃই ক্ষমতার মতবাদের পরিপন্থী যেটা বলে, হক্ব ও ন্যায়, শক্তি ও ক্ষমতা বৈ কিছু নয়। এটা পাশ্চাত্যে উদ্ভূত একটি মতবাদ যা শক্তি ও ন্যায় একই বলে জানে।

পাশ্চাত্যে কয়েক শতাব্দী পূর্বে দ্বিতীয়বারের মতো এ মতবাদ পুনর্জীবিত হয়েছে। সত্য ও ক্ষমতা সমার্থক– এ ধারণাটি প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক দর্শনে আবির্ভূত হয়েছে। ম্যাকিয়াভেলী ছিলেন একজন ইতালীয় দার্শনিক। তিনি তাঁর রাজনৈতিক দর্শনকে এ মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় হলো প্রভুত্বের যোগ্যতা। রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য (প্রভুত্ব লাভ) সকল কিছুই বৈধ। মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদান, ওয়াদা ভঙ্গ– এ সবই বৈধ। তাঁর মতে রাজনীতিতে এ সকল বিষয়কে কখনই নিন্দনীয় বলা যাবে না।

ম্যাকিয়াভেলীর পরে অন্যান্য কিছু দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা এ মতবাদকে রাজনীতির বাইরেও সাধারণভাবে প্রয়োগ করে একে একটি নৈতিক ও সাধারণ নিয়মে পরিণত করেন। ফলে সর্বোচ্চ মানবিক নৈতিকতা বলতে তাঁদের কাছে ক্ষমতা ও শক্তিই বুঝায়। এটা তাঁদের পক্ষ থেকে রাজনীতিকদের জন্য একটি সবুজ সংকেত যে, যা কিছু ইচ্ছা করতে পার। নৈতিকতার আলোচনায় প্রথম এ বিষয়টি আনেন জার্মান দার্শনিক নীচে বা নীট্সে। (নীট্সে তাঁর শেষ জীবনে পাগল হয়ে যান। আমার মতে পাগলামীর আলামত তাঁর প্রথম জীবনেই ছিল।)

দার্শনিক বেকনের দৃষ্টিভঙ্গি ও তার প্রভাব

এখানে একটি ভূমিকা দান প্রয়োজন মনে করছি। আপনারা জানেন, চারশ' বছর পূর্বে ষোড়শ শতাব্দীতে যুক্তি ও বিজ্ঞানের জগতে এক ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। দু'জন বড় দার্শনিক– একজন ইংরেজ দার্শনিক বেকন এবং অপরজন ফরাসী দার্শনিক ডেকার্ট নববিজ্ঞানের অগ্রদূত বলে পরিচিতি লাভ করেন। বিশেষত বেকনের জ্ঞান বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ববর্তী সকল ধ্যান-ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেয়। তাঁর ধারণা ও মতবাদ বিজ্ঞানের উন্নয়ন এবং প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্যের কারণস্বরূপ। আমার মতে সে সাথে মানুষের অধঃপতনের কারণ হয়েছে। অর্থাৎ এই মতবাদ যেমন প্রকৃতিকে মানুষের জন্য বাসোপযোগী করেছে তেমনি আবার মানুষের হাতেই মানুষকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাঁর এ ধারণাটি কি?

বেকনের পূর্বে দার্শনিক ও অন্যান্য মহাপুরুষরা (বিশেষত ধর্মীয়) জ্ঞানকে সত্য অনুধাবন ও উদ্ঘাটনের উপকরণ মনে করতেন (ক্ষমতার হাতের উপকরণ হিসেবে নয়)। অর্থাৎ যখন তাঁরা মানুষকে জ্ঞান অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করতেন তাঁদের উদ্দেশ্য হিসেবে বলতেন, "হে মানব! জ্ঞানী ও সচেতন হও। কারণ জ্ঞানই পারে তোমাকে সত্যে পৌঁছে দিতে। জ্ঞান সত্যে পৌঁছার মাধ্যম।" এ কারণেই জ্ঞান পবিত্র বলে গণ্য হতো। অর্থাৎ তাঁদের নিকট জ্ঞান বস্তুগত কল্যাণের ঊর্ধ্বে একটি পবিত্র বিষয় ছিল। সব সময় তাঁরা জ্ঞানকে সম্পদের মোকাবিলায় বর্ণনা করে বলতেন, "জ্ঞান উত্তম নাকি অর্থ?" আমাদের সাহিত্যে (ফার্সি, আরবী যা-ই হোক) জ্ঞান ও সম্পদের মধ্যে তুলনা করে জ্ঞানকে সম্পদের উপর প্রাধান্য দেয়া হতো। যেমন–

"জ্ঞান দিলেন খোদা ইদরিসকে, কারুনকে মাল
একজন করেছে ঊর্ধ্বে গমন, অন্যজন লাঞ্ছিত বেসামাল।"

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর কয়েকটি বাণী যা নাহজুল বালাগাতে এসেছে, সেখানে তিনি জ্ঞান ও সম্পদের মধ্যে তুলনা করে জ্ঞানকে সম্পদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ধর্মে সব সময়ই জ্ঞানকে একটি পবিত্র বস্তু ও সকল বস্তুগত বিষয়ের ঊর্ধ্বে মনে করা হয়। এ জন্য শিক্ষকের মর্যাদাকেও পবিত্র হিসেবে ধরা হয়। আলী (আ.) বলেন, "যে আমাকে একটি বাক্য শিক্ষা দান করেছে, সে আমাকে তার দাসে পরিণত করেছে।" (তাঁর শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং রাসূল [সা.])

আপনারা দেখুন, কোরআন জ্ঞানের মর্যাদা ও পবিত্রতাকে কত বড় করে দেখে– যেখানে হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি ও আদম কর্তৃক ফেরেশতাদের নামসমূহ শিক্ষাদানের বিষয়টি বর্ণনা করে বলছে, হে ফেরেশতাগণ! তোমরা আদমকে সিজদা কর। কারণ আদম এমন কিছু জানে যা তোমরা জান না। (ভাবার্থ নেয়া হয়েছে)

বেকন তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে বললেন, মানুষ সত্যকে উদ্ঘাটনের জন্য জ্ঞানের (একে পবিত্র মনে করে) পেছনে ছুটবে– এ কথাটির কোন অর্থ নেই। বরং মানুষের উচিত জ্ঞানকে নিজের জীবনের প্রয়োজনে কাজে লাগানো, জ্ঞানের মধ্যে ঐ জ্ঞানই উত্তম যা মানুষের জীবনে অধিক কাজে লাগে এবং এর মাধ্যমে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করা যায়। সুতরাং সে জ্ঞানই ঐশী পবিত্রতার পর্যায় থেকে নেমে এসে বস্তুগত লাভের উপকরণে পরিণত হলো। অর্থাৎ জ্ঞানের লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়ে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের মাধ্যমে তার উপর আধিপত্য লাভ ও উন্নত (বস্তুগত) জীবন লাভের উদ্দেশ্যে পর্যবসিত হলো।

অবশ্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে এ মতবাদ মানবতার কল্যাণে এক বিরাট ভূমিকা রেখেছে। কারণ জ্ঞান প্রকৃতিকে জানা, ব্যবহার ও প্রয়োজন পূরণের কর্মে নিয়োজিত হয়েছে। কিন্তু এর পাশাপাশি তার মর্যাদা, পবিত্রতা ও সম্মান হারাতে শুরু করেছে। তবে এখনও দীনি ছাত্ররা ধর্মীয় মাদ্রাসায় পূর্বের সেই উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ নিয়ে জ্ঞান অর্জন করছে। শহীদ সানী প্রণীত 'আদাবুল মুতাআল্লেমীন' বা 'মুনিয়াতুল মুরীদ' গ্রন্থে বর্ণিত মূল্যবোধকে তারা ধারণ করে রয়েছে। এ গ্রন্থগুলোতে জ্ঞানের মর্যাদা বর্ণনা করে প্রচুর হাদীস ও রেওয়ায়েত আনা হয়েছে। এজন্যই জ্ঞান তাদের নিকট সম্মানিত ও পবিত্র বলে গণ্য। যেমন সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে, যখন কোন দীনি ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে চাও উত্তম হচ্ছে ওযূ করে পবিত্রভাবে যাওয়া। একজন দীনি ছাত্রের জন্য শিক্ষকের মর্যাদা, সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দীনি ছাত্র তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে তার শিক্ষকের জন্য আনুগত্যের এক অনুভূতি জাগরিত দেখে। যদি কখনও তার মনে আসে যে, জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করবে তবে সে লজ্জা পায়। কারণ জ্ঞান অর্থ উপার্জনের জন্য নয়। তেমনি একজন শিক্ষকও শিক্ষাদানের বিনিময়ে অর্থ লাভের উদ্দেশ্যকে জ্ঞানের অবমাননা বলে মনে করেন।

কিন্তু বর্তমানের শিক্ষা ব্যবস্থায় বেকনের চিন্তার প্রতিফলন লক্ষণীয়। শিক্ষাদান ও জ্ঞানার্জন পূর্বের সেই সম্মান ও মর্যাদাকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে। এখন একজন ছাত্র শিক্ষা লাভ করে তার জীবনের জন্য একটি প্রস্তুতি হিসেবে। তাই বর্তমানে একজন ছাত্রের পড়াশোনা করে ডাক্তার বা প্রকৌশলী হিসেবে সচ্ছল জীবন লাভ করা আর একজন ব্যবসায়ী বা মুদির দোকান মালিকের লক্ষ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এরা উভয়েই এখন অর্থের পেছনে ধাবমান। একজন ছাত্র বর্তমানে তার

শিক্ষকের ব্যাপারে চিন্তা করে– এ ভদ্রলোক মাসে কি পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে। তাই হয়তো দেখা যাবে, একজন ছাত্র তার শিক্ষকের অগোচরে তাকে শতবার গালি দেয়, অথচ নিজের মধ্যে লজ্জা অনুভব করে না। এটি তার জন্য মামুলী বিষয় মাত্র।

বেকন বলতেন, জ্ঞান ক্ষমতার জন্য ও ক্ষমতার সেবাই এর ধর্ম। এ মতবাদ প্রথমদিকে কোন খারাপ প্রতিফল প্রদর্শন করেনি। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে যখন মানুষ জ্ঞানকে শুধু ক্ষমতা লাভ ও অর্জনের জন্য ব্যবহার শুরু করল তখন জ্ঞান ক্ষমতার সেবায় নিয়োজিত হলো।

বর্তমানের পৃথিবী 'জ্ঞান ক্ষমতার সেবায়'– এ ভিত্তিতে আবর্তমান। কোন সময়েই জ্ঞান বর্তমানের মতো শক্তিমান ও ক্ষমতাধারীদের হাতে বন্দি ছিল না। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ সবচেয়ে বেশি পরাধীন। উদাহরণস্বরূপ আইনস্টাইনের কথাই ধরুন। তাঁর জ্ঞান আজ কার সেবায় নিয়োজিত? রুজভেল্ট বা তাঁর মতো অন্য কোন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সেবায়। কারণ রুজভেল্টের দাস হওয়া ছাড়া আইনস্টাইনের গতি নেই। জ্ঞান আজ সাম্রাজ্যবাদের ছাউনিতে– হোক তা পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র– তাতে কোন পার্থক্য নেই। সকল স্থানেই জ্ঞান ক্ষমতার সেবায় লিপ্ত। বর্তমানে জ্ঞান নয় বরং ক্ষমতাই দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অনেকে যে বলেন, 'বর্তমানের পৃথিবী জ্ঞানের পৃথিবী'– কথাটিকে সংশোধন করে বলা উচিত, 'বর্তমানের পৃথিবী ক্ষমতার পৃথিবী'। কথাটি এ অর্থে যে, বর্তমানে জ্ঞান রয়েছে কিন্তু স্বাধীন নয়; সে ক্ষমতার হাতে বন্দি। বর্তমানে জ্ঞান পরাধীন এবং শক্তি ও ক্ষমতার সেবায় নিয়োজিত। এ জন্যই যে কোন উদ্ভাবন বা আবিষ্কারই পৃথিবীতে হোক, তা ক্ষমতাবানদের সেবায় নিয়োজিত। যেমন তাদের নির্দেশেই মানুষ হত্যার জন্য ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র নির্মিত হচ্ছে। আবিষ্কারসমূহ প্রথমে ক্ষমতাসীনদের ব্যবহারের পর অন্যদের ব্যবহারের জন্য দেয়া হয় (যখন তা তাদের আর কোন কাজে না লাগে)। প্রথমদিকে ক্ষমতাবানরা আবিষ্কারসমূহকে প্রকাশ না করে গোপনীয়তা রক্ষা করে। কারণ তাদের এর প্রয়োজন রয়েছে।

বেকন যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর অজান্তেই তা নী'চে ও ম্যাকিয়াভ্যালির কথায় পরিসমাপ্তি ঘটে।

নী'চে ডারউইনের মৌলনীতির ব্যবহার করেছেন

অন্য যে মৌলনীতিটি নী'চের চিন্তার ভিত্তি হয়েছে তা ডারউইনের একটি নীতি। যদিও ডারউইন একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টান ছিলেন এবং কখনও স্রষ্টাবিরোধী ছিলেন না (কারণ তাঁর কথায় আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস ও হযরত ঈসার প্রতি সম্মান ও আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়), তদুপরি তাঁর মতবাদ পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপব্যবহারের স্বীকার হয়েছে। বিশেষত বস্তুবাদীরা ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বকে স্রষ্টাকে অস্বীকারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

ডারউইনের দর্শন ও মতবাদের অন্য যে অপব্যবহারটি হয়েছে তা নৈতিকতার ক্ষেত্রে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ মানব কে– সে আলোচনায় ডারউইনের বেঁচে থাকার সংগ্রামে যোগ্যতমের বিজয় তত্ত্বটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। ডারউইন যে চারটি মৌলনীতি বর্ণনা করেছেন তার একটি হলো আত্মপ্রেম অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীই নিজের সত্তাকে ভালোবাসে এবং নিজের সত্তাকে রক্ষার জন্য চেষ্টা

চালায়। তাঁর অন্য একটি তত্ত্ব হলো বেঁচে থাকার সংগ্রাম অর্থাৎ জীবজগতে প্রণীসমূহ পরস্পরের সাথে যুদ্ধ ও সংগ্রামে লিপ্ত এবং শক্তিশালীরাই অবশেষে বেঁচে থাকবে। প্রকৃতি তার চালুনীতে প্রাণীদের চালে আর প্রকৃতির চালুনী হচ্ছে যুদ্ধ ও সংগ্রাম। সার্বক্ষণিক এ যুদ্ধ ও সংগ্রামে যোগ্যতমদের সে নির্বাচন করে। যোগ্যতম হলো সে যে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে এবং সর্বোত্তম উপায়ে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে পেরেছে।

বর্তমানে ডারউইনের এ তত্ত্বগুলোর উপর বিভিন্ন পর্যালোচনা আসছে। কোন কোন জীব শক্তিমত্তার কারণে নয় বরং অন্য কোন কারণে টিকে রয়েছে। শক্তি ও যোগ্যতা এক বিষয় নয় বরং দু'টি ভিন্ন বিষয়।

যা হোক নী'চে এ মৌলনীতি থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, সব প্রাণীর জীবনেই (এমনকি মানুষের ক্ষেত্রেও) এ নীতিটি প্রযোজ্য। যুদ্ধ, সংগ্রাম ও দ্বন্দ্ব সব মানুষের জীবনেই রয়েছে এবং যে মানুষ শক্তিশালী সে-ই টিকে থাকবে। যে টিকে থাকে সত্যও তার পক্ষে। তারপর বলেছেন, প্রকৃতি উন্নত মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই পূর্ণ ও উন্নততম মানুষের আবির্ভাব ভবিষ্যতে ঘটবে। পূর্ণ মানুষও সে-ই যার শক্তি ও ক্ষমতা সমধিক। তার মধ্যে দুর্বলদের জন্য করুণার লেশমাত্র থাকবে না। দুর্বলদের প্রতি করুণার উৎস, যেমন ভালোবাসা, অনুগ্রহ, সেবাদান, সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কে তাঁরা বলেন, এগুলো মানব জাতির ক্ষতি করছে। এগুলো মানুষের পূর্ণতার পথে বাঁধাস্বরূপ এবং উন্নত ও শক্তিশালী মানুষ তৈরির অন্তরায়। পূর্ণ মানব সেই ব্যক্তি যার মধ্যে এ সকল দুর্বল দিকের (ভালোবাসা, সেবা, কল্যাণ, অনুগ্রহ ইত্যাদি যেগুলোকে আমরা পূর্ণতা মনে করি) অস্তিত্ব থাকবে না। তাই নী'চে হযরত ঈসা (আ.) ও সক্রেটিস দু'জনেরই শত্রু। তিনি বলছেন, সক্রেটিস তাঁর মতবাদে নৈতিকতার বিষয়ে পবিত্রতা, আত্মসংযম, ন্যায়বিচার, ভালোবাসা ও সেবার যে উপদেশ দিয়েছেন তা মানবতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। ঈসা (আ.) সক্রেটিস থেকেও মন্দ। কারণ তিনি ভালোবাসা, প্রেম, সেবা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর থেকেও অধিক কথা বলেছেন। নী'চের মতে এগুলো মানুষের দুর্বলতার বৈশিষ্ট্য। মানুষের মধ্যে এ সব বৈশিষ্ট্য যত কম থাকবে সে পূর্ণ মানবের তত বেশি নিকটবর্তী। যেহেতু তাঁর মতে পূর্ণতা হলো শক্তিমত্তা আর অপূর্ণতা বা ত্রুটি হলো দুর্বলতা।

নী'চের মতবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিষয়টি শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়িয়েছে তা পরিষ্কার হওয়ার জন্য নী'চের কিছু কথা দর্শন সম্পর্কিত ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করছি। যে সকল গ্রন্থ নী'চের কথাগুলো বর্ণনা করেছে তার মধ্যে ফুরুগী অন্যদের হতে উত্তমরূপে নী'চের কথাগুলো উদ্ধৃত করেছেন। তাই ফুরুগী নী'চের যে কথাগুলো উদ্ধৃত করেছেন আমি তার কিছু অংশ আপনাদের জন্য পড়ব। তিনি নী'চে সম্পর্কে বলেছেন, "যখন পৃথিবীর সব দার্শনিক স্বার্থপরতাকে অপছন্দনীয় এবং পরোপকার ও আত্মত্যাগকে পছন্দনীয় মনে করেছেন তখন নী'চে তার বিপরীতে স্বার্থপরতাকে সত্য ও পছন্দনীয় এবং আত্মত্যাগকে দুর্বলতা ও ত্রুটি মনে করেছেন।" আমরা পরবর্তীতে 'আত্মত্যাগ কি দুর্বলতার লক্ষণ' এ বিষয়ে আলোচনা করব।

ডারউইনের দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে নী'চে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামকে দ্বন্দের অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং অন্যরা ডারউইনের যে তত্ত্বকে ভুল মনে করেছেন তাকে তিনি সঠিক বলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন, নিজে বিজয়ী হওয়ার জন্য সব ব্যক্তি ও সত্তাই একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। বিশ্বের সকল শুভাকাঙ্ক্ষীই অধিকাংশের কল্যাণকে দৃষ্টিতে রাখার পক্ষপাতি এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীকে অধিকার লাভের উপযোগী বলে বিশ্বাস করেন। নী'চের চিন্তার ভিত্তি হলো 'ব্যক্তির ক্ষমতা তার সৌভাগ্যের হাতিয়ার'। পূর্ণ সত্তা সেই যার প্রবৃত্তি শক্তিমান ও বিকশিত এবং এ প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণের শক্তিরও সে অধিকারী।

এ পর্যন্ত সবাই বলতেন, যদি এরূপ কাজ কর তা অনৈতিক কর্ম বলে গণ্য হবে। কিন্তু তিনি বলেন, না, বরং যে কাজগুলো তোমার প্রবৃত্তি চায় তা-ই কর এবং নৈতিকতাও এটাই। তোমার প্রবৃত্তি যা বলে তা-ই ভালো কাজ বলে গণ্য।

নী'চের ভাষায়– "অনেকেই বলেন, ভালো হতো যদি পৃথিবীতে না আসতাম। সম্ভবত তা-ই। কিন্তু ভালো-মন্দ যা-ই হোক যখন পৃথিবীতে এসেছি অবশ্যই আমাকে এটা ভোগ করতে হবে। যত বেশি ভোগ করব তত উত্তম।"

তিনি বলছেন, "আমার লক্ষ্য হওয়া উচিত যত বেশি পারা যায় পৃথিবীকে ভোগ করা ও এ থেকে লাভবান হওয়া। যা কিছুই আমার এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সহায়ক হবে তা ভালো এবং নৈতিক।" মুয়াবিয়াও এ ধরনের চিন্তা করত এবং সব সময় বলত, "পৃথিবীর নেয়ামতের মধ্যে আমরা নিজেদের ভাসিয়ে দেব।"

অন্য স্থানে নী'চে বলেছেন, "এ লক্ষ্যের জন্য যা সহায়ক, যেমন নিষ্ঠুরতা, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত সবই ভালো। আর এর বিরোধী ও প্রতিবন্ধক যা কিছু আছে যদিও তা সততা, ভালোবাসা, অনুগ্রহ, আত্মসংযম হয় তা মন্দ... সব মানুষ, গোত্র ও জাতি সমানাধিকারপ্রাপ্ত– এ কথা বর্জনীয় এবং এ ধরনের বক্তব্য মানব জাতির উন্নয়নের পথে অন্তরায়।"

এ ছাড়াও তিনি বলেছেন, "'সকল মানুষের অধিকার সমান'– এটা ভ্রান্ত চিন্তা। কারণ এর ফলে দুর্বলরা শক্তিশালীদের সারিতে চলে আসে এবং উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্ত হয়। বরং উচিত দুর্বলদের অধিকারকে পদদলিত হতে দেয়া যাতে করে সবলদের জন্য পথ প্রশস্ত হয়। যখন সবলদের জন্য পথ উন্মোচিত হবে তখন উন্নত মানুষ তৈরি হবে।"

তিনি বলেন, "মানুষকে অবশ্যই দু'ভাগে ভাগ করতে হবে। একদল কর্তৃত্বশীল ও ক্ষমতাবান। অন্যদল আনুগত্যপরায়ণ ও দাস। সম্মান ও মর্যাদা কর্তৃত্বশীলদের ইচ্ছা পূরণের হাতিয়ার। সামাজিক ও নগর কাঠামো উচ্চ শ্রেণীর উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য গঠিত হয়েছে। সুতরাং এটা ঠিক নয় যে, কর্তৃত্বশালীরা অনুগতদের সংরক্ষণ করবে।"

তিনি বলছেন, "সমাজ শুধু এজন্য যে, শক্তিমানরা যাতে আরামপ্রিয়তা ও বিলাসিতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে এবং এ সমাজে দুর্বলরা তাদের বোঝা বহনকারী।" সাদীর ভাষায়–

"ভেড়ার পাল রাখালের জন্য নয়
বরং রাখাল ভেড়ার পালের জন্য।"

"শক্তিমান ও ক্ষমতাবান প্রভু শ্রেণী হিসেবে বিশেষ পরিচর্যা ও যত্নের অধিকারী যাতে করে উন্নত মানুষ তৈরি হতে পারে এবং মানবতা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে।"

পাশ্চাত্যে মানুষের উন্নত প্রজন্ম সৃষ্টি এবং প্রজাতির সংস্কারের বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। আলেক্সিস ক্যারল 'মানুষ এক অপরিচিত জীব' গ্রন্থের শেষে এ দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন, প্রজাতিগুলোকে সংস্কার করতে হবে এবং দুর্বল মানবগোষ্ঠীকে প্রজন্ম সৃষ্টির অনুমতি দেয়া যাবে না।

নী'চের ভাষায়– "নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে মৌলনীতিটি এতদিন অনুসৃত হয়েছে তা সাধারণের কল্যাণে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দুর্বল শ্রেণীর পক্ষে, প্রভু ও উচ্চ শ্রেণীর পক্ষে নয়। এ মৌলনীতিকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে এবং এমন মৌলনীতি গ্রহণ করতে হবে যা উচ্চ শ্রেণীর কল্যাণের জন্য হয়।"

এ কথাটির অর্থ হলো নী'চের দৃষ্টিতে কল্যাণ, সত্যপ্রিয়তা ও সৌন্দর্যের মতো বিষয়গুলো (যা যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য লক্ষণীয় বিষয়) আপেক্ষিক ও বাস্তব নয় এবং যা বাস্তব তা হলো সকলেই ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষী।

অতঃপর নী'চে ধর্মগুলোর প্রতি আক্রমণ করে বলেছেন, "ধর্মগুলো মানবতার প্রতি খেয়ানত করেছে যেহেতু মানুষকে ন্যায়বিচার এবং দুর্বল ও বঞ্চিতদের সাহায্যের আহ্বান জানিয়েছে।"

যখন ধর্ম ছিল না তখন যে জঙ্গলী বিধান চালু ছিল তা-ই ভালো ছিল। কারণ শক্তিশালীরা দুর্বলদের খেয়ে ফেলত এবং এভাবে দুর্বলরা নিশ্চিহ্ন হতো।" তিনি আরো বলেছেন, "প্রথমদিকে পৃথিবী শক্তিশালী মানুষদের ইচ্ছা ও মর্জিমাফিক পরিচালিত হতো এবং দুর্বল ও অনুগতরা তাদের দাস ছিল। কিন্তু শক্তিশালীরা সংখ্যায় স্বল্প এবং দুর্বলরা সংখ্যায় অধিক। তখন এ দুর্বলরা তাদের সংখ্যাধিক্যকে তাদের ভাগ্য উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করল এবং চক্রান্তের আদলে দয়া, অনুগ্রহ, নিঃস্বার্থতা, ন্যায়বিচার, সম্মান প্রভৃতিকে সুন্দর ও সত্য বলে প্রচার চালানো শুরু করল যাতে করে ক্ষমতাবানদের প্রভাবকে কমানো যায় এবং নিজরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়। এ লক্ষ্য ধর্মের মাধ্যমে সর্বত্তোমরূপে অর্জিত হয়েছে এবং আল্লাহ্ ও সত্যের আবরণে তারা নিজেদের রক্ষা করেছে।"

এ দৃষ্টিভঙ্গি কার্ল মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির ঠিক বিপরীত। নী'চে ও মার্কস দু'জনই ধর্মের বিরোধী। কিন্তু নী'চের দাবি অনুযায়ী দুর্বলরা শক্তিশালীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা হিসেবে ধর্মকে উদ্ভাবন করেছে যেহেতু তিনি নিজেকে ক্ষমতাবানদের সমর্থক বলে মনে করেন। আর কার্ল মার্কস যিনি নিজেকে দুর্বল ও শোষিত-বঞ্চিত শ্রেণীপন্থী বলে প্রচার করেন তাঁর মতে ধর্মকে ক্ষমতাবানরা দুর্বলদের বিদ্রোহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে তৈরি করেছে'।

নী'চে অতঃপর সক্রেটিস, গৌতম বুদ্ধ ও ঈসা (আ.)-কে আক্রমণ করে বলেন, "ঈসা মাসীহর চরিত্র দাসের চরিত্র এবং তা প্রভুদের চরিত্র ও নীতিকে ধ্বংস করেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, সন্ধি, শ্রমিক, নারী ও শিশু অধিকার রক্ষার যে সংলাপসমূহ প্রচলন লাভ করেছে তা ধর্ম থেকে

উৎপত্তি লাভ করেছে এবং এগুলো এক রকম ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও ধোঁকা বৈ কিছু নয়। এগুলো দারিদ্র্য, দুর্বলতা ও পতনের কারণ। এজন্যই এ সকল নীতিকে অপসারিত করে প্রভুত্বের উপযোগী নীতিমালা চালু করতে হবে। প্রভুসুলভ জীবনের নীতি কি? স্রষ্টা, পরকাল প্রভৃতিকে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে হবে।... হৃদয়ের কোমলতা ও দুর্বলতাকে দূর করতে হবে। দয়া ও অনুগ্রহ মানুষের অক্ষমতার প্রকাশ; বিনয় ও নম্রতা ব্যক্তির নতজানুতার লক্ষণ; ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও করুণা হলো ভীরুতা ও কাপুরুষতা। আমাদের পৌরুষত্বকে গ্রহণ করতে হবে। শ্রেষ্ঠ মানব ভালো-মন্দের ঊর্ধ্বে এবং শক্তিশালী ইচ্ছাশক্তির অধিকারী।"

পাশ্চাত্যে এ ধরনের বহু মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে এরূপ কোন মতবাদের সৃষ্টি হয়নি যা তাদের মধ্যে হয়েছে।

পাশ্চাত্যমনা প্রাণ এটাই। মানবাধিকারের যে সনদ তাঁরা ঘোষণা করেন তা অন্যদের প্রতারণার জন্যই। পাশ্চাত্যের নৈতিকতা ও সভ্যতা নী'চে আর ম্যাকিয়াভেলীর চিন্তাভুক্ত নৈতিকতা। সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীতে যা করছে তা এ চিন্তাধারার ভিত্তিতেই। পাশ্চাত্য চরিত্র– হোক তা আমেরিকান বা ইউরোপীয়– সে চরিত্র সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র এবং নী'চের নৈতিকতা। যদিও কখনো কখনো তাদের কেউ আমাদের সামনে মানবাধিকারের কথা বললে আমরা দুর্ভাগারা ঢোক গিলে তাদের কথার পুনরাবৃত্তি করে থাকি, তবুও কসম করে বলতে পারি এটা ভুল। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকা ভিয়েতনামে যে কাজটি করেছে তা নী'চের দর্শনের প্রয়োগ বৈ অন্য কিছু? এটা যথার্থই নী'চের দর্শনের বাস্তব প্রয়োগ। পাশ্চাত্য যে এত অধিক মানবতা ও মানবসেবার স্লোগান দেয় ও বলে, বারট্রান্ড রাসেল এরূপ বলেছেন, সারটার এরূপ বলেছেন, অথচ তার সকল চিন্তার ভিত্তি নী'চের দর্শন। সম্ভবত দু'একজন ব্যতিক্রমী দার্শনিকের সন্ধান পাওয়া যাবে যাঁদের চিন্তার ভিত্তি এটা নয় এবং খুব সম্ভব তাঁদের রক্তের সাথে প্রাচ্যের মিশ্রণ ঘটে থাকবে। হয়তো তাঁদের মাতৃকুল প্রাচ্য থেকে গিয়েছিলেন, নতুবা পাশ্চাত্য জাতি এরূপ নয়।

নী'চে বলেন, "আত্মনিয়ন্ত্রণ আবার কেন? বরং প্রবৃত্তিকে শক্তিশালী করতে হবে। পরোপকারই বা কেন? বরং নিজের উপাসনা কর এবং নিজের চাওয়াকে অর্জন কর। দুর্বল ও অক্ষমকে ত্যাগ কর যাতে তারা বিলুপ্ত হয় এবং পৃথিবীর সকল দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হবে... পুরুষকে অবশ্যই শক্তিশালী হতে হবে এবং শক্তিমত্তার সাথে জীবন যাপন করতে হবে যাতে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা যায়।"

পুরুষের শক্তিমত্তার মধ্যেই পূর্ণতার সমাপ্তি– সৃষ্টি এবং অস্তিত্বের সকল প্রস্তুতি তার জন্যই। এখন দেখুন, নী'চের এ কথা থেকে কি বোঝা যায়। এর অর্থ হচ্ছে, কোন কিছুই এর প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নয়। তাই নৈতিকতা, দয়া, অনুগ্রহ, মানবতা, ন্যায়বিচার, উৎসর্গ ও বিসর্জন প্রভৃতি মূল্যবোধকে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে হবে এবং নিজেকে এ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে হবে। এজন্য তিনি বলেছেন, "নিজের প্রবৃত্তির ইচ্ছা পূরণ করুন। সুখী হোন, নিজেকে প্রভু ও কর্তা জানুন এবং নিজের প্রভুত্বের প্রতিবন্ধক সকল বস্তুকে সামনে থেকে অপসারিত করুন, কোন বিপদ ও যুদ্ধকে ভয় করবেন না।"

অতঃপর নারীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "পুরুষ ও নারীর সাম্যের বিষয়টি অযৌক্তিক এবং নারীর অধিকার রক্ষার বিষয়টিও অগ্রহণযোগ্য। পুরুষই সব কিছু। পুরুষ যুদ্ধংদেহী এবং নারী শৈল্পিক। তাই সে পুরুষকে আনন্দ দেবে এবং সন্তান আনয়ন করবে।"

তাই নী'চের দৃষ্টিতে নারী আনন্দের উপকরণ, বাচ্চা উৎপাদনের যন্ত্র এবং পুরুষের ইচ্ছার দাস বৈ কিছু নয়। পূর্ণ মানবের পরিচয় লাভের জন্য এ পদ্ধতিটিও একটি মানদণ্ড হিসেবে পাশ্চাত্যে প্রচলিত। আদর্শ ও সর্বোত্তম মানব (তাদের ভাষায় সুপারম্যান) কে তা যাচাইয়ের মানদণ্ড হলো শক্তি ও ক্ষমতা।

এ মতবাদের বিপরীত যে মতবাদ– যা দুর্বলতার পক্ষে প্রচারণা চালায় এবং সকল কল্যাণকে দুর্বলতার মধ্যে বলে জানে– তা খ্রিষ্ট মতবাদ। খ্রিষ্টবাদ নৈতিকতার ক্ষেত্রে দুর্বলতার প্রচারণা চালায়। প্রচলিত একটি কথা 'কেউ তোমার ডান গালে চড় বসিয়ে দিলে বাম গালটিকেও তার দিকে বাড়িয়ে দাও'– এটা খ্রিষ্টবাদ হতে এসেছে।

ক্ষমতার বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ক্ষমতার বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ? ইসলাম সবলতার পক্ষে নাকি দুর্বলতার পক্ষে প্রচার চালিয়েছে। নাকি সবলতার পক্ষেও নয় বা দুর্বলতার পক্ষেও নয়? এর জবাব হলো ইসলাম এক অর্থে ক্ষমতার পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে তবে তা নী'চের প্রচারিত ক্ষমতা নয়, বরং এমন ক্ষমতা যা মানবিকতার সব উচ্চ বোধকে ধারণ করে এবং দয়া, অনুগ্রহ, আত্মত্যাগ ও সকল উচ্চতর মানবীয় গুণাবলী হতে উৎসারিত।

ইসলামে নিঃসন্দেহে ক্ষমতা ও শক্তির দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। কোরআন ও হাদীস এর পক্ষে দলিল। অন্য যাঁরা ইসলামের বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন তাঁরাও ইসলামকে সকল ধর্মের মধ্যে ক্ষমতার ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী দেখেছেন। কোন ধর্মই ইসলামের মতো এত অধিক ক্ষমতা ও শক্তির দিকে আহ্বান করেনি। উইল ডুরান্ট তাঁর 'সভ্যতার ইতিহাস'[১] গ্রন্থের একাদশ খণ্ডে ইসলামী সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেখানে এ উক্তিটি করেছেন, "কোন ধর্মই ইসলামের মতো তার অনুসারীদের ক্ষমতা ও শক্তির দিকে আহ্বান করেনি।"

এ বিষয়ে কোরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। এক স্থানে হযরত ইয়াহিয়া (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্পাক বলছেন,

يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ

"হে ইয়াহিয়া! কিতাবকে (বিধানকে) শক্তিমত্তার সঙ্গে গ্রহণ কর।" (সূরা মারইয়াম : ১২)

আমার বক্তব্যের শুরুতে যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি দেখুন তা কতটা বিপ্লবী ও মুমিনদের কিরূপ শক্তিমান ব্যক্তিরূপে বর্ণনা করে বলেছে,

كَأَيِّن مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَ هَنُوْا لِمَا أَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ مَا ضَعُفُوْا وَ مَا اسْتَكَانُوْا وَ اللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ. (সূরা আলে ইমরান : ১৪৬)

"কত ঐশী ব্যক্তি নবীদের সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে যখন কোন কষ্ট তাদের স্পর্শ করেছে তখন কোন ক্লান্তি, দুর্বলতা ও অযোগ্যতা প্রদর্শন করেনি বা দমেও যায়নি। আর যারা ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্ তাদের ভালোবাসেন।

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ

"যারা আল্লাহ্‌র পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে তারা যেন সীসা ঢালা প্রাচীর। তিনি তাদের ভালোবাসেন।" (সূরা ছফ : ৪)

তিনি আরো বলেছেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

"মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং যারা তার সাথে রয়েছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেদের (মুমিনদের) মধ্যে রহমদিল।" (সূরা ফাত্‌হ : ২৯) এরূপ আয়াত কোরআনে প্রচুর রয়েছে।

ইসলামে সাহসিকতা একটি প্রশংসিত গুণ। সম্মানবোধ একটি উচ্চ মর্যাদার বিষয় যার অর্থ এ পরিমাণ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হওয়া যাতে কেউ তাকে দুর্বল ও লাঞ্ছিত করতে না পারে। দেখুন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রস্তুতির পক্ষে ইসলাম কি বলছে?

وَ أَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ.

"শত্রুর মোকাবিলার জন্য সর্বোত্তম শক্তির প্রস্তুতি গ্রহণ কর, অস্ত্র ও বাহন (পালিত ঘোড়া) প্রস্তুত কর যেন আল্লাহ্‌র ও তোমাদের শত্রুরা তোমাদের হতে ভীত হয় (তোমাদের প্রতি লোভের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে না পারে)।" অন্য একটি আয়াতে বলেছেন,

وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

"তোমাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না (অর্থাৎ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের সময়েও সত্য ও ন্যায়ের সীমাকে সংরক্ষণ কর) নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।"

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, শত্রুর সঙ্গে ততক্ষণ যুদ্ধ কর যতক্ষণ সে যুদ্ধ করে। শত্রু যখন আত্মসমর্পণ করে অস্ত্রসংবরণ করবে তখন তোমরা আর অস্ত্রকে ব্যবহার করো না। কারণ তা সীমালঙ্ঘনের শামিল। বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের হত্যা করো না, তাদের প্রতি অত্যাচার করো না। যারা যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। এগুলো কোরআন কর্তৃক নির্দেশিত যুদ্ধের সীমা। এরূপ আয়াত কোরআনের অন্যান্য স্থানেও রয়েছে।

হাদীসসমূহে শক্তিমত্তা ও ক্ষমতার বিষয়

এখানে আপনাদের জন্য কয়েকটি হাদীস পড়ছি যা থেকে বোঝা যাবে যে, ইসলাম ভীতি ও দুর্বলতাকে কতটা নিন্দনীয় এবং ক্ষমতা ও শক্তিকে কতটা প্রশংসনীয় মনে করেছে! অবশ্য ইসলামের শক্তিমত্তা ও ক্ষমতা নী'চের বর্ণিত ক্ষমতা নয়।

রাসূল (সা.) বলেছেন, لاَ يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ انْ يَكُوْنَ بَخِيْلاً وَ لاَ جَبَاناً "মুমিনদের জন্য দু'টি বিষয় অনাকাঙ্ক্ষিত (তার মধ্যে থাকতে পারে না) : একটি কৃপণতা (অর্থাৎ অর্থের প্রতি মোহ) এবং অন্যটি ভয়।" (উসূলে কাফী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৩)

মুমিন কখনও ভীত নয় বরং সাহসী ও শক্তিশালী। রাসূল তাঁর দোয়ার মধ্যে পড়তেন :

أَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخلِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট কৃপণতা ও ভীরুতা হতে আশ্রয় চাই।"

আলী (আ.) মুমিনদের সম্পর্কে বলেছেন, الْمُؤْمِنُ نَفْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الصَّلْدِ "মুমিনদের আত্মা কঠিন শিলা হতেও কঠিনতর এবং দৃঢ়।"

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤمِنِ أُمُوْرَه كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضُ إِلَيْهِ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِيْلاً'

"আল্লাহ্ মুমিনকে সকল কিছুর অধিকার দান করেছেন শুধু একটি বিষয়ের অধিকার ব্যতীত এবং তা হচ্ছে নিজেকে অন্যের নিকট ছোট করার অধিকার (অর্থাৎ অপমানিত হওয়ার অধিকার ব্যতীত)।"

'أَمَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللّهِ تَعَالى يَقُوْل : وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهِ وَ لِلْمُؤمِنِيْن

"তুমি আল্লাহ্র এ বাণী শোননি যে, তিনি বলেছেন : নিশ্চয় সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্য।"

'فَالْمُؤْمِنُ يَكُوْنُ عَزِيْزاً وَ لاَ يَكُوْنُ ذَلِيْلاً'

"মুমিন সব সময়ই সম্মানিত এবং কখনই অপমানিত হতে পারে না।"

إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ الْجَبَلِ'

"মুমিন পর্বত হতেও সমুচ্চ এবং সম্মানিত।"

কারণ পর্বতের একটি অংশকে বা পাথরগুলোকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব, কিন্তু মুমিন ব্যক্তির আত্মিক শক্তিকে খর্ব করা সম্ভব নয়।"

'إِنَّ الْجَبَلَ يُسْتَقَلُّ عَنْهُ بِالْمِعْوَلِ, وَ الْمُؤْمِنُ لاَ يَسْتَقَلُّ مِنْ دِيْنِهِ شَيْءً'

"পর্বতকে কুঠার বা ক্রেন দিয়ে স্থানচ্যুত করা সম্ভব, কিন্তু মুমিনকে তার ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়।"

ইমাম বাকির (আ.) বলেন, "মহান আল্লাহ্ মুমিনকে তিনটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন : এক দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান; দুই উভয় দুনিয়ায় সাফল্য এবং 'وَ الْمهَابَةَ فِيْ صُدُوْرِ الظّالِمِيْن' অত্যাচারী ও ইসলামের শত্রুদের তাদের বিষয়ে আতঙ্ক (অর্থাৎ মুমিনদের ব্যক্তিত্বের কারণে অন্যায়কারীর হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়)।"

যেহেতু আত্মিক শক্তি হতেই 'গাইরাত' (ধর্মীয় ও ব্যক্তিসত্তাগত আত্মমর্যাদাবোধ– পারিভাষিক অর্থে গাইরাত হলো ব্যক্তির মানবীয় আত্মসম্মানবোধ যে কারণে সে ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-বিধান, স্ত্রী ও পরিবারের নারীদের সম্মান রক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ সংরক্ষণের তাড়না অনুভব করে) সৃষ্টি হয় তেমনি দুর্বলতা হতে সৃষ্টি হয় ধর্মীয় ও ব্যক্তিসত্তার প্রতি অনীহা ও উপেক্ষার মানসিকতা।

রাসূল বলেছেন, "হযরত ইবরাহীম (আ.) ধর্ম ও আত্মসম্মানবোধে ছিলেন খুবই সচেতন, আমি এ বিষয়ে তাঁর থেকেও সচেতন।" তেমনি রাসূল বলেছেন,

'جَدَعَ اللّٰهُ أَنْفَ مَنْ لاَ يُغَارُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ'

"আল্লাহ্পাক সেই ব্যক্তির নাসিকাকে কর্তন করুন যার গাইরাত নেই (অর্থাৎ তার সম্মুখে তার ধর্ম, পরিবার ও সমাজ লাঞ্ছিত হয়, অথচ সে তার প্রতিবাদ করে না– এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ লাঞ্ছিত করুন)।"

তৎকালীন আরবে সা'দ নামক এক আত্মসম্মানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বিষয়েও রাসূল (সা.) বলেছেন, "আমি তাঁর থেকেও অধিক আত্মসম্মান রক্ষাকারী।"

পাকিস্তানী কবি ইকবাল একটি সুন্দর কথা বলেছেন। সম্ভবত মুসোলিনীর কথার বিপরীতেই তিনি এ কথাটি বলেছেন। মুসোলিনী বলেছেন, "যার হাতে লৌহ রয়েছে সে-ই রুটি পাবে।" অর্থাৎ যদি খাদ্য পেতে চাও তবে তোমাকে অস্ত্র ও শক্তির অধিকারী হতে হবে। ইকবাল বলেন, "যে নিজেই লৌহে পরিণত হয়েছে সে-ই রুটি পাবে।" মুসোলিনী অস্ত্র ও বস্তুগত শক্তির উপর নির্ভর করেছেন, কিন্তু ইকবাল ব্যক্তির রূহ, প্রাণ ও মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে বলেছেন, নিজকেই লৌহ হতে, তবেই রুটি পাবে। আমীরুল মুমিনীন (আলী) বলেছেন,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ أَصْلَبُ مِنَ الصَّلْدِ

"মুমিনদের আত্মা কঠিনতম শিলা হতেও কঠিনতম।"

এ সকল হাদীসে ইসলাম যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেছে তা হচ্ছে শক্তিমত্ত ও ক্ষমতা।

লক্ষ্য করুন আলী (আ.) নাহজুল বালাগায় শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন এবং দুর্বলতাকে ইসলামী সমাজের জন্য অনুপযোগী মনে করেছেন! যেমন তিনি বলেছেন,

'فَوَ اللَّهِ مَا غُزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِيْ عُقْرِ دَارِهِمْ إِلاَّ ذَلُّوْا'

"আল্লাহ্‌র কসম, যে জাতি তার ঘরের মধ্যে আক্রান্ত হয়, সে জাতি লাঞ্ছিত হতে বাধ্য।" অন্যত্র বলেছেন,

'وَ لاَ يَمْنَعُ الضَّيْم الذَّلِيْلُ وَ لاَ يُدْرَكُ الْحَقُّ إِلاَّ بِالْجِدِّ'

"ভীরু ও কাপুরুষ ব্যক্তি জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না তেমনি পারে না তাকে প্রতিরোধ করতে এবং দৃঢ়তা ও কর্ম প্রচেষ্টা ব্যতীত সত্যে পৌঁছানোও সম্ভব নয় (অর্থাৎ অধিকার লাভ সম্ভব নয়)।" (নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ২৭)

অধিকার অর্জন করতে হয় নাকি দিতে হয়?

পাশ্চাত্যের ধারণায় সত্য ও অধিকার অর্জন করতে হয়। সুতরাং এ বিষয়টি বিবেচ্য যে, অধিকার 'অর্জনীয়' নাকি 'দেয়'? অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে কোন্‌টি সঠিক– মানুষের অপরের অধিকারকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দেয়া উচিত নাকি ব্যক্তিকে তার অধিকার অর্জন করতে হয়? কোন কোন মতাদর্শের দৃষ্টিতে অধিকার 'দেয়', তাই অবৈধ অধিকার দখলকারী ব্যক্তির উচিত অধিকার ফিরিয়ে দেয়া। যদি সে না দেয় তবে কিছু করার নেই। অধিকার যেহেতু 'দেয়' তাই দাবি করা বা এ বিষয়ে সোচ্চার হওয়া ঠিক নয়। খ্রিষ্টধর্মের অন্যতম মূলনীতি এটা যে, অধিকার হরণকারীকে বলব তোমার অধিকার ফিরিয়ে দিতে। এরপর তার সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা করো না। হে অধিকারহারা মানুষ! তোমাদের প্রতি আমাদের (খ্রিষ্টবাদের) উপদেশ ও অনুরোধ হলো যতক্ষণ অত্যাচারী ব্যক্তি তোমাদের অধিকার ফিরিয়ে না দেবে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করো না, কারণ তা মানবতা ও নৈতিকতার পরিপন্থী কাজ।

আবার আরেক দল বলেন, অধিকার আদায় করে নিতে হয়। এটা সম্ভব নয় যে, যে ব্যক্তি অধিকার হরণ করেছে সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অধিকার ফিরিয়ে দেবে। কারণ অধিকার হরণকারী ব্যক্তি মানবতা, বিবেক ও সহমর্মিতার বিরোধী।

কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে অধিকার যেমন 'অর্জনীয়' তেমনি 'দেয়'। অর্থাৎ ইসলাম অধিকার পাবার জন্য দু'টি ফ্রন্টে সংগ্রাম করে। একটি ফ্রন্টে অধিকার হরণকারীকে প্রশিক্ষিত করে, যে অধিকারসমূহ সে হরণ করেছে সেগুলোকে ফিরিয়ে দেয়ার মানসিকতা সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু ইসলাম এটুকু করেই তার কর্মের সমাপ্তি ঘটেছে বলে মনে করে না, বরং অন্য ফ্রন্টে অধিকারহৃত ব্যক্তিকে সচেতন করে বলে, অধিকার অর্জনীয়। তাই অধিকার আদায়ের জন্য প্রচেষ্টা চালাও এবং তা অর্জন কর।

আলী (আ.) তাঁর প্রসিদ্ধ একটি পত্র যা মালিক আশতারকে লিখেছিলেন সেখানে বলেছেন, "রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি–

فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ (ص) يَقُوْلُ فِيْ غَيْرِ مُوْطِنٍ : لَنْ نُقَدَّسَ أُمَّةٌ حَتَّى يُؤْخَذَ لِلضَّعِيْفِ حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ

"কোন জাতিই সম্মান ও মর্যাদার পবিত্র স্থানে পৌঁছতে পারে না যতক্ষণ না তাদের দুর্বলরা শক্তিমানদের নিকট থেকে তাদের অধিকার আদায় করে নেবে, অথচ তাদের মধ্যে কোন দ্বিধা থাকবে না।"

যে দুর্বল নিজের অধিকার আদায়ের জন্য সোচ্চার হয় না ইসলাম তাকে অযোগ্য মুসলমান বলে মনে করে। যে সমাজে দুর্বলরা এতটা দুর্বল মনের যে, নিজের অধিকারের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর সাহস পায় না সে সমাজকে মুসলিম সমাজ বলে মনে করে না।

আমাদের মুসলিম জাতির প্রাথমিক যুগের মহান ব্যক্তিবর্গ কিরূপ ছিলেন? স্বয়ং আমাদের নবী কিরূপ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন?

রাসূলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই শক্তিশালী ছিলেন। রাসূলের আত্মিক ও মানসিক শক্তির বর্ণনা তাঁর জীবনেতিহাসে প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

রাসূল (সা.)-এর আত্মিক ও শারীরিক ক্ষমতা

রোমান লেখক কুনেস্টান ভিরজিল গিওরগেভ তাঁর 'নবী মুহাম্মদকে নতুন করে চিনুন' গ্রন্থে দু'টি বিষয় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন (যদিও গ্রন্থটিতে প্রচুর ভুল তথ্য রয়েছে। কারণ ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের কোন ব্যক্তির পূর্ণ ধারণা থাকাটা অস্বাভাবিক, তদুপরি এ দু'টি বিষয়কে সুন্দরভাবে চিত্রিত করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন)। একটি হলো রাসূল (সা.)-এর দৃঢ়তা। রাসূল কখনো কখনো এমন অবস্থায় পড়তেন যে, সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্ভাবনার দ্বার তাঁর সম্মুখে বন্ধ হয়ে যেত, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ প্রতিকুলে চলে যেত এবং আশার কোন আলোই অবশিষ্ট থাকত না, সে মুহূর্তেও তিনি অবিচল থাকতেন, তাঁর ইচ্ছাশক্তি পর্বতের মতো অটল থাকতো। প্রকৃতই রাসূল (সা.)-এর তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবনে তাঁর অপরিসীম মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ যখন তা অধ্যায়ন করে তখন আশ্চর্যান্বিত হয়। এজন্যই কবি হাস্সান বিন সাবিত (রাসূলের সাহাবী ও প্রসিদ্ধ কবি) বলেছেন,

لَهُ هِمَمٌ لاَ مُنْتَهَى لِكِبَارِهَا وَ هِمَّتُهُ الصُّغْرَى أَجَلُّ مِنَ الدَّهرِ

"তাঁর বড় হিম্মতের কোন সীমা নেই এবং তাঁর ক্ষুদ্র হিম্মত কালের চেয়েও মহিমান্বিত।"

রাসূল (সা.) বাহ্যিক শক্তি ও ক্ষমতায় যেমন শক্তিশালী মানুষ ছিলেন তেমনি তাঁর সুঠাম দেহ সাহসিকতার স্বাক্ষর বহন করত। রাসূল মোটাও ছিলেন না আবার শীর্ণও ছিলেন না বরং মধ্যম শরীরের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পেশীসমূহ পরস্পর সংযুক্ত ও দৃঢ় ছিল, স্থুল দেহের মানুষের মতো তাঁর পেশী ঢিলা ছিল না।

রাসূলের সাহসিকতা এ পর্যায়ের ছিল যে, স্বয়ং আলী (আ.) বলেছেন,

وَ كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ اتَّقَيْنَا بِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

"কখনো কখনো পরিস্থিতি যখন আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ত, আমরা রাসূল (সা.)-এর আশ্রয় গ্রহণ করতাম।" (নাহজুল বালাগাহ্, আলীর অপরিচিত বাণী নং ৯)

প্রায় আট বছর পূর্বে প্রথমবার যখন মক্কায় হজ্বে গিয়েছিলাম তখন সেখানে একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম যা আমার জন্য আশ্চর্যজনক কিন্তু সুখময় ছিল। যখন পেছন থেকে রাসূল (সা.)-কে দেখেছিলাম ঠিক তখনই আলী (আ.)-এর উপরিউক্ত বাণীর কথা স্বপ্নেই অজান্তে মনে হয়েছে। মুখে আওড়িয়েছিলাম আলী (আ.) অযথা এ কথা বলেননি।

রাসূল নিজে যেমন শক্তিমান ও সাহসী ছিলেন তেমনি শক্তিমত্তা ও সাহসিকতাকে প্রশংসা করতেন। সুতরাং ইসলামে ক্ষমতা ও শক্তির বিষয়টি প্রশংসিত হয়েছে এবং শক্তি ও ক্ষমতা ইসলামে অন্যতম মূল্যবোধ বলে গৃহীত হয়েছে।

অন্য আরেকটি বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করছি। এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ইনশাল্লাহ্ পরবর্তী বৈঠকে করব। শক্তি ও ক্ষমতা একটি মূল্যবোধ হিসেবে ইসলামের অন্যান্য অসংখ্য মূল্যবোধের পাশে অবস্থান করছে। তাই এ সকল মূল্যবোধ একত্রিতভাবে পূর্ণ মানব বা ইনসানে কামেল সৃষ্টি করে। জনাব নী'চে সকল মূল্যবোধ হতে শুধু ক্ষমতার মূল্যবোধকে গ্রহণ করেছেন। যদি একটি বৃক্ষের সকল শাখা কর্তন করে শুধু একটি শাখা রেখে দেয়া হয় তবে শুধু ঐ শাখাটিরই বৃদ্ধি ঘটবে এবং অন্য সকল শাখার অবলুপ্তি হবে। ইসলাম ও নী'চের মতবাদের মধ্যে পার্থক্য হলো নী'চের মতে মানুষের মধ্যে শুধু একটি মূল্যবোধ রয়েছে এবং তা ক্ষমতা ও শক্তি। এ মূল্যবোধের জন্য অন্য সকল মূল্যবোধকে তিনি বিসর্জন দিতে বলেছেন। কিন্তু ইসলামে উচ্চ মর্যাদার মূল্যবোধগুলোর অন্যতম মূল্যবোধ হলো ক্ষমতা এবং এটা যখন অন্য মূল্যবোধগুলোর পাশে এসে দাঁড়ায় তখনই তা পূর্ণতা লাভ করে, নতুবা নয়।

১১

ক্ষমতা ও প্রেমের মতবাদের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإِحْسَانِ وَ إِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (সূরা নাহল : ৯০)

গত আলোচনায় আমাদের বিষয়বস্তু ছিল ক্ষমতার মতবাদে পূর্ণ মানব। আমরা জেনেছি এ মতবাদে পূর্ণতা ও ক্ষমতা একই বিষয় আর অক্ষমতাই হলো অপূর্ণতা। এমনকি ভালো-মন্দও এ মাপকাঠিতে মাপা হয়ে থাকে। ভালো অর্থ ক্ষমতা। তাই ভালোত্ব হচ্ছে ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। আর মন্দ হচ্ছে অক্ষমতা। তাই মন্দত্ব হলো ক্ষমতা ও শক্তির অনুপস্থিতি।

দর্শন সাধারণত যে কোন আলোচনা পূর্ণতা ও অপূর্ণতার আলোকে এবং ধর্মশাস্ত্রবিদগণ ভালো-মন্দের আলোকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। ক্ষমতার মতবাদ পূর্ণত্ব ও অপূর্ণত্ব এবং ভালো ও মন্দের সকল বৈশিষ্ট্যকে ক্ষমতা ও অক্ষমতার মানদণ্ডে যাচাই করে। দর্শন যখন পূর্ণত্ব ও অপূর্ণত্বের কথা বলে তখন বলে, পূর্ণত্ব হলো ক্ষমতার অধিকারী হওয়া আর অপূর্ণত্ব হলো ক্ষমতাহীন হওয়া। ধর্মশাস্ত্রবিদগণ যখন বলেন ভালো ও মন্দ, তখন এরা বলেন ক্ষমতা আর অক্ষমতা। তাই এ মতবাদে সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায় এ মাপকাঠিতেই চিন্তা করা হয়। অর্থাৎ সত্য ক্ষমতা হতে বিচ্ছিন্ন কিছু নয় আর মিথ্যা ও অক্ষমতাও পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। ন্যায় ও অন্যায়ও তা-ই। সুতরাং দু'ব্যক্তি যদি পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং তাদের একজন অপর জন অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হয়, তবে সে পূর্ণতর এবং উত্তমও বটে। তাই সত্য ও ন্যায়ও তার পক্ষে। আর যে পরাজিত ও অক্ষম সে এই পরাজয় ও অক্ষমতার কারণেই মন্দ, অপূর্ণ, মিথ্যা ও অন্যায়ের ধ্বজাধারী। কারণ পরাজয়, অক্ষমতা ও ত্রুটি অন্যায় ও মন্দ।

এ মতবাদের ত্রুটি

ক্ষমতার মতবাদে দু'টি বড় ত্রুটি রয়েছে। প্রথমত মানবের সকল মূল্যবোধের মধ্যে ক্ষমতার মূল্যবোধ ব্যতীত বাকি সকল মূল্যবোধকে এ মতবাদ উপেক্ষা করেছে। ক্ষমতা একটি মানবিক মূল্যবোধ হিসেবে বর্তমানের পরিভাষায় একটি valeur (ফ্রেঞ্চ শব্দ) এবং দর্শনের পরিভাষায় তা যে একটি পূর্ণত্ব তাতে সন্দেহ নেই। নিঃসন্দেহে ক্ষমতা একটি পূর্ণত্বের সমান, কিন্তু সমগ্র পূর্ণত্ব ক্ষমতার সমান নয়। এজন্যই দার্শনিক ও প্রাজ্ঞরা বলেছেন, ওয়াজিবুল উজুদ বা অপরিহার্য চিরন্তন অস্তিত্বের সত্তা যা শুধুই অস্তিত্ব সে অস্তিত্ব পূর্ণতার সমান। তাই যা কিছুই পূর্ণত্বের সমান আল্লাহ্‌র সত্তার জন্য তা প্রমাণ করে। এজন্যই বলা হয় পূর্ণত্বের মধ্যে অন্যতম হলো ক্ষমতা এবং ক্ষমতা নিজেই একটা পূর্ণতা যেরূপ জ্ঞান, ইচ্ছা এবং স্বাধীনতা ও জীবন পূর্ণতা সেরূপ ক্ষমতাও।

সুতরাং ক্ষমতা যে মানুষের জন্য একটি পূর্ণতা তাতে সন্দেহ নেই। এ কারণেই দুর্বলতার মতবাদ দুর্বলতার পক্ষে যে প্রচারণা চালায় তা সম্পূর্ণরূপে ভুল। কিন্তু কথা হচ্ছে ক্ষমতা একমাত্র পূর্ণতা নয়। যেমনটি মহান আল্লাহ্‌র পূর্ণত্বের মধ্যে আমরা দেখি যে, ক্ষমতা একমাত্র পূর্ণতা নয় বরং তাঁর মধ্যে পূর্ণতার সকল গুণাবলী রয়েছে। অথবা তাঁর যে অসংখ্য সুন্দর নাম (আসমায়ে হুসনা) রয়েছে সেই সব সুন্দর নামের একটি হলো কাদীর বা সর্ব শক্তিমান এবং তাঁর এ অসীম ক্ষমতার মধ্যে সকল পূর্ণতা সীমিত নয়।

দ্বিতীয় যে ভুলটি এ মতবাদের রয়েছে তা প্রথমটি হতে বড় না হলেও ছোট নয়। তাঁরা ক্ষমতার অর্থেই ভুল করেছেন। এ মতবাদে শুধু অন্যান্য মানবিক মূল্যবোধকে অস্বীকারই করা হয়নি বরং তাঁরা ক্ষমতার দাবিদার হিসেবেও ক্ষমতাকে সঠিকভাবে চিনতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা ক্ষমতা ও শক্তির একটি দিককে চিনেছেন আর সেটা হচ্ছে পশু শক্তি। পশু শক্তি হচ্ছে সেই শক্তি বা ক্ষমতা যা পশুর দেহে রয়েছে। পশুর সকল ক্ষমতা তার দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং পশুর সকল চাওয়া-পাওয়া তার প্রবৃত্তির অনুগত। মানুষের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সেখানেই যে, তার মধ্যে দৈহিক শক্তির বাইরেও এক শক্তি রয়েছে। তাই ইসলামের মতবাদ যদি ক্ষমতার মতবাদ হতো তাহলে তার ফলাফল নী'চে যা বলেন তা হতো না। নী'চে বলেন, 'মানুষের ক্ষমতার অনুগত হওয়া উচিত। ক্ষমতা অর্জনের জন্য তাকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে', 'যখন ক্ষমতা অর্জন করবে তখন দুর্বলের উপর তা প্রয়োগ করবে', 'প্রবৃত্তির বিরোধিতা না করে তার অনুসরণ করো, দুনিয়ার বস্তুগত সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করো'। দৈহিক ক্ষমতার বাইরের ক্ষমতায় বিশ্বাস করলে তার ফল এগুলো হবে না।

আত্মিক শক্তি ও ক্ষমতা

এখানে আমরা রাসূল (সা.)-এর জীবনী হতে একটি ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে ইসলামের দৃষ্টিতে ক্ষমতার মাপকাঠি কি– তা আলোচনা করব। হাদীস গ্রন্থসমূহে এসেছে, রাসূল (সা.) একদিন মদীনার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, একদল মুসলমান যুবক পাথর উত্তোলনের (ভারত্তোলনের) মাধ্যমে নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করছে। যে যত অধিক ওজনের পাথর উঠাতে পারে সে তত শক্তিশালী। সকলেই চেষ্টা করছিল অপর হতে অধিক ভার উত্তোলনের। নবী (সা.) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা চাইলে তোমাদের এ প্রতিযোগিতার আমি বিচারক হতে পারি।" সবাই খুশী হয়ে বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে যে, আপনি আমাদের এ প্রতিযোগিতার বিচারক হয়ে ঘোষণা করবেন আমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে শক্তিশালী।" নবী বললেন, "প্রয়োজন নেই তোমরা এ জন্য পাথর উত্তোলন করবে। আমি তোমাদের হাতে শক্তি মাপার একটি মানদণ্ড দান করব।" সবাই বলল, "তা কি?" নবী বললেন, "কোন ব্যক্তির প্রবৃত্তি যখন তাকে গুনাহ করার জন্য প্ররোচিত করে তখন যদি সে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ও যে গুনাহের প্রতি তার মন আকৃষ্ট হয়েছে তা থেকে বিরত হয় তাহলে সে-ই সবচেয়ে শক্তিশালী।"

এখানে নবী (সা.) ইচ্ছাশক্তি ও মানসিক ক্ষমতাকে প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে উল্লেখ করেছেন। কারণ শক্তি ও ক্ষমতা শুধু এটাই নয় যে, মানুষ শারীরিক শক্তিতে ভারী পাথর উত্তোলন করবে যা ক্ষমতার দৈহিক প্রকাশ মাত্র এবং সকল প্রাণীই এ শক্তির অধিকারী। তাই এরূপ শক্তির ক্ষেত্রে মানুষ

ও অন্যান্য প্রাণী একই পর্যায়ে রয়েছে। অবশ্যই আমরা এটা বলছি না যে, এরূপ শক্তি ও ক্ষমতা পূর্ণতা নয়। বরং আমরা বলছি এটাও এক প্রকার পূর্ণতা কিন্তু দৈহিক শক্তির যে পূর্ণতা তা হতে উচ্চতর পূর্ণতা হলো মানুষের ইচ্ছা ও মানসিক শক্তি যা তার আত্মিক ক্ষমতার প্রকাশ। মানুষের আত্মিক শক্তি তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার বিপরীতে তাকে দাঁড়ানোর শক্তি ও ক্ষমতা দান করে।

এ যুক্তিতেই ইসলামী নৈতিকতায় বিশেষত এরফানী সাহিত্যে আত্মিক শক্তিকেই প্রকৃত ক্ষমতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী (সা.) বলেছেন, 'أَشْجَعُ النَّاس مَنْ غَلَبَ هَواه' "মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তি হলো সে-ই যে তার প্রবৃত্তির ইচ্ছার উপর জয়ী হয়েছে।" এখানে সাহসিকতা, ক্ষমতা ও জয়ের কথা বলা হয়েছে। যেমন সা'দী বলেন,

"পৌরুষ তা নয় যা দ্বারা আঘাত হানা হয় পরের মুখে
পৌরুষ তা-ই যা প্রবৃত্তির মোকাবিলায় অপরকে রাখে সুখে।"

পৌরুষ (শক্তি ও ক্ষমতা) এটা নয় যে, মানুষ তার মুষ্ঠিবদ্ধ হাত দিয়ে কারো মুখে আঘাত হানবে, বরং পৌরুষ সেটাই যে, মানুষ তার প্রবৃত্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যকে সন্তুষ্ট ও তার ইচ্ছা পূরণ করে।

মৌলভী (রুমী) বলেন,

"ক্রোধ ও লালসায় সংযত সেই পুরুষ কোথায়?
যারে খুঁজে ফিরি আমি পর্বত হতে পর্বত চুড়ায়।"

মাওলানা রুমী ক্ষমতাবান মানুষকে ক্রোধ ও লিপ্সার সময় খুঁজেছেন। যখন ক্রোধে মানুষ লেলিহান শিখায় পরিণত হয় তখন ক্ষমতাবান পুরুষ চরম আত্মিক শক্তির অধিকারী হওয়ায় এ ক্রোধাগ্নির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যখন প্রবৃত্তির লালসা তার মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করে তখন সে প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের চেষ্টায় রত হয়। এটাকেই ক্ষমতা ও শক্তি বলা হয়। নৈতিকতার যে সুন্দর বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা নীতি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন এবং নী'চে দুর্বলতা বলে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যদি সঠিকভাবে আমরা সেগুলো যাচাই করি তাহলে দেখব এ সবই ক্ষমতা। অবশ্য আমি বিশ্বাস করি, কখনো কখনো এমন অনেক বিষয় যা শক্তি ও ক্ষমতা নয় কিন্তু শক্তি ও ক্ষমতা বলে ভুল হয়। তাই নীতিশাস্ত্রবিদরা বলেন, স্নেহ-ভালোবাসা বুদ্ধিবৃত্তি ও ঈমান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ যেখানেই আমাদের স্নেহ ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটবে দেখতে হবে তা যুক্তিসঙ্গত কিনা?

স্নেহ ও সহানুভূতির সঠিক ও অযাচিত প্রকাশ

প্রথমে সা'দীর একটি কবিতা ও পরে কোরআনের একটি আয়াত আপনাদের জন্য পড়ব। সা'দী তাঁর কবিতায় বলেছেন,

"যদি দেখাও সহানুভূতি ধারালো দাঁতের নেকড়ের প্রতি
জুলুম করলে তুমি নিরীহ মেষ শাবকের প্রতি।"

কোন চিতা বা নেকড়ের প্রতি সহানুভূতি দেখানো মেষদের প্রতি জুলুমের শামিল। অর্থাৎ শত শত মেষ হত্যাকারী কোন নেকড়েকে যদি হত্যা করা হয় আর তাতে কারো ঐ নেকড়ের প্রতি মায়া জন্মে,

তবে মেষদের প্রতি অবিচার করা হলো। এটি অবশ্য সা'দী উদাহরণ দিয়েছেন। মূলত তাঁর উদ্দেশ্য অত্যাচারী এবং তার অধীন অসহায় ও বঞ্চিত মানুষরা। দুর্বল আত্মার লোকেরা অত্যাচারীদের প্রতি অজ্ঞতাবশত সহানুভূতি প্রদর্শন করে থাকে।

জেনাকারী পুরুষ ও নারীর ব্যপারে কোরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যদি স্ত্রী রয়েছে এরূপ কোন পুরুষ বা স্বামী রয়েছে এরূপ কোন নারী জেনা করে ইসলামে তার শাস্তি হচ্ছে তাদেরকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করতে হবে। কোরআন বলছে, এদের শাস্তিদান ও হত্যার সময় একদল মুমিনকে সেখানে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।

'وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ' এ রকম ক্ষেত্রে দুর্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ যারা সমাজের উচ্চতর সঠিক কল্যাণের দিকটি লক্ষ্য করে না তাদের সহানুভূতি জেগে উঠে বলতে পারে, এ কাজ না করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখানো উচিত।

কোরআন বলছে, 'وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِيْ دِيْنِ اللَّهِ' "আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি তোমাদের মনে যেন দয়ার উদ্রেক না হয়।"

এটা ঐশী বিধান কার্যকর করার স্থান যে ঐশী বিধান উচ্চতর কল্যাণ ও মানবতার সার্বিক শৃঙ্খলা বিধানের জন্য প্রণীত হয়েছে, তাই এখানে সহমর্মিতার স্থান নেই। কেউ এরূপ ক্ষেত্রে সহমর্মিতা দেখালে তা সমাজের প্রতি জুলুমের শামিল।

এরূপ অপর একটি বিষয় যা অনেকেই বলে থাকেন তা হলো মৃত্যুদণ্ড আবার কেন? মৃত্যুদণ্ড অত্যন্ত অমানবিক বিষয়। অপরাধী যে অপরাধই করুক তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। এরা এদের এ কর্মকাণ্ডকে এভাবে ব্যাখ্যা করে যে, অপরাধীকে সংশোধন করতে হবে।

কত বড় ভুল কথা! এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মানুষকে সংশোধন করতে হবে, কিন্তু অবশ্যই তা অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে যাতে করে কোন অপরাধ সংঘটিত না হয়। কিন্তু অধিকাংশ সমাজেই শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ নেই, বরং অনৈতিকতা ও বিশৃঙ্খলার উপাদান পুরো মাত্রায় বিদ্যমান। কিংবা ধরি, কোন সমাজে নৈতিক প্রশিক্ষণের সকল সুবিধা বিদ্যমান, কিন্তু সমাজে সব সময় একদল অপরাধপ্রবণ বিচ্যুত ব্যক্তি রয়েছে যারা ঐ সমাজেও অপরাধে লিপ্ত হয়। এদের জন্য কি করা উচিত? আমরা অপরাধীকে সংশোধন করব– এ অজুহাতে অপরাধীকে অপরাধ করার সুযোগ দেব আর তারপর যখন অপরাধ সংঘটিত হবে তখন তাকে সংশোধন করতে যাব। এভাবে সকল অপরাধীকে গ্রীন সিগনাল দেয়া হবে এবং তারা অপরাধ করতে উৎসাহিত হবে। সে নিজেকে বলবে, সমাজ এতদিন আমার সংশোধনের চিন্তায় ছিল না– যখন আমি কিশোর ছিলাম তখন আমার পিতা আমাকে প্রশিক্ষিত করার ও সংশোধনের পদক্ষেপ নেননি, যখন বড় হয়ে সমাজে প্রবেশ করেছি তখনও সমাজ তা করেনি, এখন অপরাধ করার পর জেলে আমাকে প্রশিক্ষিত ও সংশোধন করা হবে। তাই প্রথমে একটি অপরাধ করি তাহলে সমাজ আমাকে সংশোধনের সুযোগ পাবে।

আরেক দল বলেন, চোরের হাত কাটা হবে কেন? যে সকল মানুষের দৃষ্টি সংকীর্ণ তাঁরাই এ কথা বলেন। আপনারা দৈনিক পত্রিকার পাতাগুলো লক্ষ্য করুন, দেখবেন চুরি-ডাকাতির কারণে কি পরিমাণ সম্পদ মানুষের হাতছাড়া হয়! শুধু তাই নয়। কত মানব হত্যার মতো অপরাধ সংঘটিত হয়! যদি চোরের যথাযথ শাস্তি হয় এবং চোর জানে যে, পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তার চার আঙ্গুল কাটা যাবে যা মৃত্যু পর্যন্ত তার দেহে চুরির সাক্ষ্য হিসেবে থাকবে তবে সে কখনই চুরি করবে না। যদি কয়েকজন, এমনকি একজন চোরকেও এ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয়, তবে চুরির পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে।

যে সকল হাজী পঞ্চাশ-ষাট বছর (এ গ্রন্থটি প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বের) পূর্বে মক্কা গিয়েছিলেন তাঁরা দেখেছেন, আর যাঁরা না গিয়েছেন তাঁরা হয়তো শুনেছেন যে, তখন সৌদি আরবে চুরি কিরূপ ভয়াবহ ছিল! সে সময় যেহেতু বাস বা প্লেন ছিল না, সবাই উট বা এরূপ অন্য কোন বাহনে হজ্ব করতে যেত। সশস্ত্র ব্যক্তিসহ দু'হাজার ব্যক্তির কফেলা না হলে মরুপথে হাজীরা হজ্বে যাওয়ার সাহস পেতেন না। তদুপরি প্রতি বছর শোনা যেত অনেক ব্যক্তি মরুদস্যুদের হাতে নিহত হয়েছেন, তাদের সম্পদসমূহ লুণ্ঠিত হয়েছে। যদিও দস্যুরাও অনেকেই নিহত হতো, কিন্তু মুত্যু তাদের জন্য একটি সম্ভাবনা বিধায় তারা এ কাজ হতে সহজেই নিবৃত্ত হতো না। সৌদি সরকার অন্তত এ একটি বিষয়ে পৃথিবীতে সফল হয়েছে (তাদের অন্য কর্মকাণ্ড খারাপ কি ভালো সে আলোচনায় না গিয়ে)। শুধু এক বা দু'বছর চোরের হাত কাটার কারণে চুরি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। পূর্বে প্রতি বছরই শত শত চোর ও হাজী নিহত হতেন তাতে কোন প্রভাব পড়ত না। কিন্তু যখন চোরকে আরাফাত বা মিনা বা অন্য কোথাও এনে প্রকাশ্যে হাত কাটার মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হলো এবং কয়েকবার এ কাজের পূনরাবৃত্তি করা হলো তখন দেখা গেল যারা এ কাজ করত তারা ভীত হয়ে এ কাজ হতে বিরত হলো এবং চুরি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। যে দেশটিতে চুরির ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল সে দেশটিতেই হাজীদের সুটকেস ও মালপত্র কয়েকদিন এক স্থানে পড়ে থাকে, অথচ কেউ সাহস করে না তাতে হাত দেয়ার বা পা দিয়ে নেড়ে দেখার। যতক্ষণ পর্যন্ত এর মালিককে পাওয়া না যায় তা এভাবেই পড়ে থাকে। এর কারণ হলো চোরের যথাযথ শাস্তির বিধান কার্যকর করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

'وَ لاَ تَأْخُذكُمْ بِهِمَا رَافَةُ فِيْ دِيْنِ اللَّهِ'

তাই এরূপ অপরাধীর প্রতি যে কোনরূপ সহমর্মিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন অযৌক্তিক অর্থাৎ তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন নিরপরাধ ব্যক্তিদের প্রতি নিষ্ঠুরতারই নামান্তর। তাই এরূপ সহানুভূতির কোন স্থান ইসলামে নেই, বরং এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ শক্তিমত্তার প্রকাশ।

সুতরাং ক্ষমতার মতবাদের অনুসারী যারা সব সময় বলে পূর্ণ মানব হলো শক্তিমান মানব, তারা অন্য সকল মানবিক মূল্যবোধকে উপেক্ষাই শুধু করেনি, স্বয়ং ক্ষমতাকে বুঝতে ও সনাক্ত করতেও ব্যর্থ হয়েছে।

হাদীসসমূহের প্রকৃত ক্ষমতা

ক্ষমতা হচ্ছে এটাই যে, মানুষ অন্যের সহযোগিতায় তার হাত প্রসারিত করবে। শক্তিমান আত্মার অধিকারী ব্যক্তি তাঁর সন্তানকে বলেন, 'كُوْنَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُوْمِ عَوْناً' হযরত আলী (আ.) তাঁর প্রিয়

পুত্রদ্বয় ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, "হে আমার সন্তানেরা! সব সময় তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতা মজলুমের সহযোগিতায় জালেমের প্রতিরোধে দ্রুত অগ্রসর হবে। এটা ক্ষমতার নিদর্শন।" (নাহজুল বালাগাহ্, পত্র নং ৪৭)

বাস্তবত হিংসা, বিদ্বেষ, অন্যের অকল্যাণ কামনা এরূপ যে সব বিষয় নী'চে জন্মদানের চেষ্টা করেছেন এর সবই দুর্বলতাপ্রসূত।

যে ব্যক্তি সব সময় অন্যদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায় এবং অন্যদের কষ্ট দেয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে এগুলো ক্ষমতাপ্রসূত নয়, বরং দুর্বলতাপ্রসূত। মানুষ যত শক্তিমান হবে তার মধ্যে হিংসা-দ্বেষ তত কমে আসবে।

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর একটি হাদীস খুবই আকর্ষণীয়। তিনি বলেছেন, 'الْقُدْرَةُ تُذْهِبُ الْحَفِيْظَةَ' "ক্ষমতা মন হতে বিদ্বেষ দূর করে।" অর্থাৎ যখন মানুষ নিজের মধ্যে ক্ষমতা অনুভব করে তখন অন্যদের প্রতি তার বিদ্বেষ আর থাকে না। (বালাগাতুল হুসাইন, পৃ. ৮৯)

দুর্বল ব্যক্তিরাই কেবল বিদ্বেষ পোষণ করে এবং হিংসাকে লালন করে থাকে। ইমাম হুসাইনের এ কথাটি যথার্থ মনোতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

হযরত আলীর গীবত সম্পর্কে একটি বাণী রয়েছে। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো কিরূপ ব্যক্তি গীবত করে অর্থাৎ মানুষের অনুপস্থিতিতে তার নিন্দা ও দোষ ত্রুটি বর্ণনা করে আনন্দ পায়? আলী (আ.) বলেন, "দুর্বল ও অক্ষমরা" 'الْغِيْبَةُ جُهْدُ الْعَاجِزْ' অর্থাৎ গীবত অক্ষমদের সর্বশেষ প্রচেষ্টা। (নাহজুল বালাগাহ্, হেকমত ৪৬১)

একজন শক্তিমান মানুষ যে আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান, গীবত তার নিকট লজ্জার বিষয় এবং সে এ কাজকে নিকৃষ্ট ও দুর্বলদের কাজ বলে মনে করে। তাই প্রকৃত ক্ষমতাবান মানুষ যেমন অন্যদের গীবত করেন না তেমনি শুনতেও চান না। আলী (আ.) তাই গীবতকে দুর্বলতাপ্রসূত বলে উল্লেখ করে বলেছেন, শক্তিমান আত্মার অধিকারী মানুষ কখনও গীবত করে না।

ইমাম আলী (আ.) এমনকি জেনাকেও দুর্বলতাপ্রসূত মনে করেন। তিনি বলেছেন, 'مَا زِنَى غُيُوْر قطّ' "আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি জেনা করতে পারে না।" পৃথিবীতে যে ব্যক্তির মধ্যে বিন্দুমাত্র আত্মসম্মানবোধ রয়েছে সে কান নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে না। তাই কেবল আত্মসম্মানহীন ব্যক্তি যে নিজের মধ্যে এ বিষয়ে দুর্বলতা অনুভব করে সে-ই এরূপ কাজ করে। কারণ আত্মসম্মানহীন ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে যদি অন্য পুরুষ অনুরূপ কাজ করে তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। এ জন্যই আলী (আ.) বলেছেন, 'مَا زنى غيور قطّ' (নাহজুল বালাগাহ্, হেকমত ৩০৫)

কিন্তু জনাব নী'চে এরূপ ক্ষমতাকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ক্ষমতা পেশী শক্তি ও অস্ত্র বল অর্থাৎ তরবারী ধারণ করতঃ অন্যের উপর আঘাত হানা। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছে মানুষরূপী

শক্তিধর কোন পশু যার বাহুর শক্তি অধিক। তাই তাঁর নিকট আত্মিক শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান নেই। অতএব, ইসলামী মতাদর্শে নিঃসন্দেহে ক্ষমতা একটি মানবীয় মূল্যবোধ এবং মানুষের পূর্ণতার পথের অন্যতম পূর্ণরূপ। তাই ইসলাম দুর্বল ব্যক্তিকে পছন্দ করে না। 'إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْف' অর্থাৎ দুর্বল ও অক্ষম মুমিনকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। (কাফী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৯)

সুতরাং প্রথমত ইসলাম ক্ষমতাকে মানুষের একমাত্র মূল্যবোধ বলে মনে করে না বরং এর পাশাপাশি পূর্ণতার অন্যান্য মূল্যবোধ রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। দ্বিতীয়ত ইসলাম ক্ষমতা বলতে যা বুঝে তা নী'চে, সংশয়বাদী দার্শনিক ম্যকিয়াভেলী এবং অন্যদের ধারণা হতে পৃথক। ইসলাম মানুষের মধ্যে এমন অনেক ক্ষমতায় বিশ্বাসী এবং সেগুলোর বিকাশে প্রয়াসী যার ফল নী'চের ধারণার বিপরীত এবং যা সমাজের জন্য কল্যাণকর।

নী'চে বলেন, দুর্বলের জন্য সহমর্মিতা দুর্বলতা হতে উদ্ভূত। তাঁকে বলতে চাই, সহমর্মিতা শুধু নয়, এখানে ভালোবাসা, ক্ষমা, দানশীলতা– সর্বোপরি কল্যাণকামিতা রয়েছে। কেন প্রতিটি বিষয়কে এক চোখে দেখেন? আপনার নিকট প্রশ্ন একজন ক্ষমতাবান মানুষের দান ও অনুগ্রহ অন্যদের নিকট পৌঁছে নাকি এক দুর্বলের? তাই জবাব দিন অনুগ্রহ ক্ষমতা হতে উৎসারিত নাকি দুর্বলতা হতে? অবশ্যই ক্ষমতা হতে, দুর্বলতা হতে নয়। যা হোক আমরা এখন অন্য আলোচনা শুরু করব।

ভালোবাসার মতবাদ

অন্য যে মতবাদটি মূলত ভারতে এবং অন্য স্থানে খ্রিষ্টবাদের মধ্যে প্রচলিত তা হলো ভালোবাসা বা প্রেমের মতবাদ। অবশ্য খ্রিষ্টানরা তাঁদের ধর্মকে ভালোবাসা এবং প্রেমের ধর্ম বলে প্রচার করে। এ ক্ষেত্রে তারা এতটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে গিয়েছে যে, তাদের ধর্মকে 'দুর্বলতার মতবাদ'-এর অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। অর্থাৎ তাদের এ মতবাদকে প্রেমের মতবাদ না বলে দুর্বলতার মতবাদ বলাই শ্রেয়। ভারতীয়দের মতবাদকে প্রেমের মতবাদ বলা যেতে পারে (আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু তত্ত্ব নিয়ে, বাস্তবে তাদের আচরণ নিয়ে নয়)। এখন প্রশ্ন হলো প্রেমের মতবাদ কি?

প্রেমের মতবাদ মানুষের পূর্ণতাকে মানুষ ও সৃষ্টির সেবার মধ্যে নিহিত বলে মনে করে। এটা নী'চের মতবাদের ঠিক বিপরীতে অবস্থান করছে। নী'চে যে বিষয়গুলোকে প্রত্যাখ্যান করেন তাঁরা সে বিষয়গুলোকে গ্রহণীয় বলে মনে করেন। তাই তাঁরা বলেন, প্রকৃত পূর্ণ মানব সেই ব্যক্তি যার থেকে সৃষ্টি কল্যাণ লাভ করে। মানবতার অর্থও তাই সৃষ্টির কল্যাণ করা। পাশ্চাত্যের মতবাদগুলো যখন মানবতার কথা বলে তখন মানব সেবা ও মানব প্রেমই তাদের লক্ষ্য যদিও কার্যত এ কথার প্রতি তারা তেমন দৃঢ় নয়। আমাদের পত্রিকা ও সাময়িকীগুলোও যখন বলে, এ বিষয়টি মানবিক, ঐ বিষয়টি অমানবিক তখন ঐ অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে। মানবিক বিষয়গুলো তাদের জন্য অকল্যাণকর। সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে মানবতা হলো মানুষ ও সৃষ্টির সেবা।

কখনো কখনো আমাদের কবিদের মধ্যেও এ বিষয়ে অতিরঞ্জন লক্ষ্য করা যায়। যেমন সা'দী বলেছেন,

"ইবাদত সৃষ্টির সেবা বৈ কিছু নয়
তাসবিহ, জায়নামাজ ও আলখাল্লা নয়।"

অবশ্য সা'দীর উদ্দেশ্য এখানে ভিন্ন। একদল দুনিয়াত্যাগী সুফীর প্রতি তাঁর এ কথা– যাঁদের কাজ তাসবীহ, জায়নামাজ আর দরবেশী পোশাক নিয়ে। মানবকল্যাণমূলক কাজ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে তাঁরা এ সব নিয়ে ব্যস্ত। যদিও সা'দী নিজে একজন সুফী তদুপরি এরূপ দরবেশদের কাজে তিনি বীতশ্রদ্ধ ও অসন্তুষ্ট। তাই অনেকটা অতিরঞ্জনের ভাষায় বলেছেন, ইবাদত সৃষ্টির সেবা বৈ কিছু নয়।

কেউ কেউ এ বিষয়টি অন্যভাবে বলে থাকেন যা ঠিক নয়। তাঁরা বলেন, "শরাব পানে মাতাল হয়ে পড়ে থাক, তবুও মানুষকে কষ্ট দিও না।" তাঁদের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে শুধু একটি অকল্যাণ বিদ্যমান আর সেটা হচেছ অপরকে কষ্ট দান, আর কল্যাণও একটি, তা হলো মানুষের সেবা ও সৃষ্টির কল্যাণ। প্রেমের মতবাদের বাণী একটি, আর তা হলো মানবতার কল্যাণ করো। তাঁদের দৃষ্টিতে ক্রটিও একটি, তা হলো মানুষকে কষ্ট দান।

সৃষ্টির কল্যাণ সাধন ও আত্মত্যাগের প্রতি কোরআনের আহ্বান

এ বিষয়ে ইসলামী মতবাদেরও একটি পর্যালোচনা দরকার। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সেবা ও কল্যাণ যে স্বয়ং একটি স্বর্গীয় ও মানবীয় মূল্যবোধ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মানব প্রেম ও সেবা, মানুষের কষ্ট অনুধাবন ও সহমর্মিতা ইসলামের দৃষ্টিতে এক প্রকার পূর্ণতা ও মূল্যবোধ, তাই এর মর্যাদাও অনেক বেশি, কিন্তু ইসলাম সীমাবদ্ধতায় বিশ্বাসী নয়।

বক্তব্যের শুরুতে আমি এ আয়াতটি পাঠ করেছি,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإِحْسَانِ وَ إِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ

"আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন ন্যায়বিচার (মানুষের অধিকারকে রক্ষা করার), সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার এবং নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্য হতে।"

এখানে আল্লাহ্ শুধু মানুষের অধিকার রক্ষার কথাই বলেননি, বরং নিজের অধিকার হতেও তাদের প্রতি দান করা ও সদাচরণের নির্দশ দিয়েছেন।

আত্মত্যাগ কোরআনের একটি মৌলিক বিষয়। আত্মত্যাগ অর্থ নিজের অধিকার ত্যাগ করা এবং যে বস্তু তার নিজের ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অন্যের প্রয়োজনে তার উপর ঐ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া। আত্মত্যাগ মনুষত্বের এক মহৎ ও গৌরবময় প্রকাশ এবং কোরআন আত্মত্যাগকে আশ্চর্যজনকরূপে প্রশংসা করেছে। রাসূল (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে আনসাররা মুহাজিরদের নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি কোরআন এভাবে বলেছে–

وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِم وَ لَوْ كَانَ بِهِم خَصَاصَة

এবং সূরা দাহ্‌রে হযরত আলী, ফাতেমা এবং ইমাম হাসান ভ্রাতৃদ্বয়ের আত্মত্যাগের বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْناً وَ يَتِيْماً وَ أَسِيْراً إِنَّمَا يُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لاَ شُكُوْراً

"তারা আল্লাহ্‌র প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দিদের আহার্য দান করে। তারা বলে : কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদের আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।" এ আয়াতের শানে নুযূল এরূপ যে, ইমাম হাসান ও হুসাইন অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত আলী ও ফাতিমা (আ.) তিন দিন রোযা রাখার জন্য নযর করেন। হযরত আলী কাজ করে কিছু যবের আটা যোগাড় করেন এবং হযরত ফাতিমা তা দিয়ে রুটি তৈরি করেন। ইফতারের সময় একজন মিসকিন এসে খাদ্য চাইলে তাঁরা পুরো আহার্যই তাকে দান করেন। এরূপ দ্বিতীয় দিন একজন এতীম এবং তৃতীয় দিন একজন বন্দি এসে খাদ্য চাইলে পরপর তিন দিন তাঁরা এ আত্মত্যাগ করেন এবং নিজেরা অভুক্ত থাকেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আত্মত্যাগ মানব মর্যাদার এক গৌরবময় ও মহান বিষয় যা ইসলাম প্রশংসা করেছে এবং ইসলামের ইতিহাসে আত্মত্যাগের এরূপ অসংখ্য নমুনা রয়েছে।

স্নেহ-ভালোবাসার একটি উদাহরণ :

স্নেহ, ভালবাসা ও অনুগ্রহ সব সময় ইসলামে পুণ্য কর্ম হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ ঘটনাটি হয়তো শুনে থাকবেন যে, একদিন এক জাহেলিয়াতের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে লক্ষ্য করল তিনি তাঁর এক নাতীকে কোলে বসিয়ে আদর করে চুমু খাচ্ছেন। লোকটি রাসূলকে লক্ষ্য করে বলল, "আমার দশটি সন্তান রয়েছে। কিন্তু আমার সারা জীবনে তাদের কাউকে একবারও চুমু খাইনি।" একটি বর্ণনায় এসেছে, فَالْتَمَعَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللَّهِ তার এ কথায় রাসূল এতটা অসন্তুষ্ট হলেন যে, তাঁর মুখের আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং ঐ লোকটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন,

مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ "যে অন্যকে দয়া ও অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ্‌ও তার প্রতি দয়া করেন না।" (জামেয়ুস সাগীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩)

অন্য বর্ণনায় এসেছে– আল্লাহ্ যদি তোমার হৃদয় হতে দয়া উঠিয়ে নেন তাহলে আমি কি করব?

এ বিষয়ে প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর জীবন দয়া ও মহানুভবতার উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি প্রকৃতই দয়া ও রহমতের প্রতীক। দুর্বলের মুখোমুখি দাঁড়ালে দয়া ও অনুগ্রহ তাঁর মধ্যে ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত হতে শুরু করত।

পাশ্চাত্যে মানবিক স্নেহ-ভালোবাসার নমুনা ও অনুভূতি

আমি গত বৈঠকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানসিকতা নিয়ে আলোচনা করে বলেছি, পাশ্চাত্য মানসিকতা কঠোর এবং হৃদয় নিষ্ঠুর। অবশ্য পাশ্চাত্যের মানুষরা এটা স্বীকার করে ও বলে ভালোবাসা, করুণা, আত্মত্যাগ, সহমর্মিত বিষয়গুলো প্রাচ্য মানসিকতা উদ্ভূত। এমনকি সন্তানের প্রতি পিতার, সন্ত

ানের পিতা-মাতার প্রতি, ভাই ও বোনের প্রতি ভাইয়ের, ভাই ও বোনের প্রতি বোনের ভালোবাসাও খুব কম দেখা যায়। প্রাচ্যের অধিবাসী এটা অনুভব করে যে, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রাচ্যেই রয়েছে এবং পাশ্চাত্যে এ বিষয়গুলো উপেক্ষিত; সেখানে ন্যায়পরায়ণতা এবং সামাজিক সমতা বিদ্যমান থাকলেও সহমর্মিতা ও ভালোবাসার অস্তিত্ব নেই।

আমাদের এক বন্ধু যিনি তাঁর পাকস্থলীর অপারেশনের জন্য অষ্ট্রিয়া গিয়েছিলেন (তাঁর পুত্র সেখানে পড়াশোনা করত সে সুবাদে) তিনি আমাদের জন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। ঘটনাটি এরূপ– তিনি বলেন, "আমার অপারেশন সম্পন্ন হওয়ার পর আরোগ্যের জন্য বিশ্রামের পর্যায়ে ছিলাম। একদিন আমার পুত্র আমাকে একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায়। সেখানে সে আমার সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত ছিল এবং আমাকে ঘিরে যেন ঘুরছিল। আমাদের বিপরীত দিকে এক দম্পতি (আমার ধারণা) আমাদেরকে লক্ষ্য করছিলেন। একবার যখন আমার ছেলে তার স্থান হতে উঠে ঐ দম্পতিকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল তাঁরা তাকে কি যেন প্রশ্ন করলেন। আমার পুত্রের আচরণ ও ভঙ্গিতে বুঝলাম সে যেন তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। সে আমার নিকট ফিরে আসলে আমি জিজ্ঞেস করলাম : তারা তোমাকে কি জিজ্ঞেস করল? সে বলল : আমাকে তাঁরা জিজ্ঞেস করছিলেন, যে ব্যক্তির তুমি এত সেবা করছ উনি তোমার কি হন? আমি বললাম : আমার পিতা। তাঁরা বললেন : পিতা হলেই কি এতটা সেবা করতে হবে? আমি তখন তাঁদের যুক্তিতেই জবাব দিলাম যাতে বিষয়টি তাঁদের বোধগম্য হয়। আমি বললাম, সে আমার জন্য টাকা পয়সা পাঠাত বলেই তো আমি পড়াশোনা করতে পেরেছি। নতুবা আমার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যেত। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে বললেন : যে অর্থ সে নিজে উপার্জন করে তা থেকে তোমাকে পাঠায়! আমি বললাম : হ্যাঁ। তখন তাঁরা আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যেন আমরা অন্য কোন সৃষ্টি। কিছুক্ষণ পর নিজেদের স্থান হতে উঠে এসে আমাদের সঙ্গে গল্প করলেন। তাঁরা বললেন : আমাদেরও এক সন্তান দীর্ঘ দিন হলো বিদেশে অবস্থান করছে। সেও এমন। আমার পুত্র তাঁদের বিষয়ে পরে খোঁজখবর করে জানতে পারে যে, তাঁরা মিথ্যা বলেছেন। তাঁদের কোন পুত্রই নেই। পরে তাঁরা তা স্বীকার করে বলেন : আমরা ত্রিশ বছর পূর্বে এনগেজমেন্ট করেছি এবং বিবাহের উদ্দেশ্যে কিছুদিন একসঙ্গে থাকব ভেবেছিলাম যাতে করে পরস্পরের আচরণ বুঝতে পারি। যদি একে অপরের আচরণ পছন্দ করি, তবে বিয়ে করব। কিন্তু আজও সে সুযোগ হয়ে উঠেনি।"

জনাব মুহাক্কেকীকে (আল্লাহ্ তাঁকে রহমত করুন) আয়াতুল্লাহ্ বুরুজেরদী জার্মানীতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেখানকার একটি ঘটনা আমার নিকট বর্ণনা করেছিলেন যা বেশ আশ্চর্যজনক। তিনি বলেন, "আমাদের সময়ে যে ক'জন স্বনামধন্য ব্যক্তি মুসলমান হয়েছিলেন তাঁর মধ্যে একজন জার্মান প্রফেসর ছিলেন। লোকটি যথেষ্ট জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাবান ছিলেন। তিনি আমাদের নিকট ঘন ঘন আসতেন, আমরাও সুযোগ পেলে উনার ওখানে যেতাম। তাঁর জীবনের শেষ দিকে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তখন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। আমরা এবং অন্য মুসলমানরা তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যেতাম। একদিন এ বৃদ্ধ আমাদের নিকট বেশ কিছু অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন : যে দিন প্রথম আমি অসুস্থ হই এবং ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানান যে, আমার ক্যান্সার

হয়েছে সে দিন আমার স্ত্রী ও পুত্র আমাকে এসে বলল : তোমার ক্যান্সার হয়েছে, তাহলে তো নিশ্চিতভাবেই মারা যাচ্ছ। আমরা আর তোমাকে দেখতে আসছি না, এখনই শেষ বিদায় জানিয়ে যাচ্ছি। তারা তখনই আমাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল। চিন্তাও করল না এ হতভাগার একটু স্নেহ-ভালোবাসার প্রয়োজন। এ কথা শোনার পর আমরা ঘন ঘন তাঁকে দেখতে যেতাম। একদিন খবর পেলাম উনি মারা গেছেন। আমরা তাঁর দাফন-কাফনের জন্য হাসপাতালে গেলাম। গিয়ে দেখি তাঁর পুত্র সে দিন এসেছে। মনে মনে খুশী হলাম যে, অবশেষে অন্তত পিতার দাফন-কাফনের জন্য এসেছে। কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে বুঝলাম, সে তার পিতার লাশটি হাসপাতালের নিকট বিক্রি করে দিয়েছে, এখন এসেছে টাকা নেয়ার জন্য।" কিরূপ আশ্চর্যের বিষয়!

আত্মত্যাগের পূর্বের ধাপ হলো ন্যায়পরায়ণতা

উপরিউক্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায়, এ লোকগুলো ভালোবাসাশূন্য। এখানে আমি আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে, আমরা আমাদের অনেক কাজকেই মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও অনুগ্রহের প্রকাশ মনে করি এবং সেগুলোকে মানবিকতা বলি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভালোবাসা বা অনুগ্রহ নয়।

অনুগ্রহের অর্থ কি? অনুগ্রহ হচ্ছে মানুষ তার বৈধ অধিকার হতে অন্যের কল্যাণে যে কাজ করে। যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করতে চায় তাকে এর পূর্বের ধাপ অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। আর তা হলো সে কারো অধিকার খর্ব করবে না, অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান দেবে, নিজের অধিকারের সীমালঙ্ঘন করবে না বরং যথাযথভাবে তা মেনে চলবে। কোন ব্যক্তি এগুলো মেনে চললে তাকে সমাজহিতৈষী বলা যেতে পারে।

কিন্তু সমাজে আপনারা একদল লোককে সব সময় দেখেন যারা নিজেদের প্রাপ্ত অধিকারের প্রতি সন্তুষ্ট নয়, বরং সব সময় সেই প্রচেষ্টায় লিপ্ত যাতে অধিক সম্পদ কুক্ষিগত করা যায়। এরা হারাম-হালালের ধার ধারে না, মানুষের অধিকারের প্রতি সম্মান দেয় না, অন্যের অধিকার খর্ব করে। এরূপ কোন ব্যক্তি যদি তার কোন বন্ধুর জন্য একদিন কয়েক হাজার টাকা খরচ করে তাকে কি আমরা মানবসেবা ও দানশীলতা মনে করে বলব যে, এটা সমাজ-কল্যাণমূলক কাজ। না, কখনই তা নয়। বরং নাম অর্জনের জন্য সে এ কাজ করেছে, তাই এটা স্বার্থপরতা ছাড়া কিছু নয়। কোন ব্যক্তি যদি নিজের নাম ও সম্মান বাড়ানোর জন্য এরূপ কাজ করে তবে তাকে মানবকল্যাণ বলা যায় না।

এরূপ একটি উদাহরণ এখানে পেশ করছি। আমাদের মধ্যে অনেকেরই একটি স্বভাব রয়েছে মেহমানদারী করার। তারা বলে, "আমাদের মন বড়, আমাদের দরজা সব সময় মেহমানদের জন্য উন্মুক্ত। একজন মেহমান যাচ্ছে তো আরেকজন আসছে। সকাল, দুপুর, রাতের খাবারের মেহমানই শুধু নয়, রাতে থাকার মেহমানও আমার বাড়ীতে কম নেই।" কারো সামর্থ্য থাকলে এরূপ কর্ম মন্দ নয়। কিন্তু অন্য একটি দিকও তো আমাদের দেখতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় এ মেহমানদারী করতে গিয়ে ঘরে যে স্ত্রী রয়েছে তার উপর অতিরিক্ত চাপ নেমে আসে, অথচ আমাদের শরীয়তসম্মত কোন অধিকার নেই তাকে এরূপ নির্দেশ দেয়ার। বরং সে আমাদের ঘরে কাজ করা বা না করার

বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাই তার উপর এরূপ নির্দেশ জারী মেহমানদারীর নামে একজন মানুষের উপর জুলুম ও অত্যাচারের শামিল।

আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) তাঁর ঘরে হযরত ফাতেমা (আ.)-এর কাজে সহযোগিতা করতেন। হযরত ফাতেমাও ঘরের কাজ নিজ ইচ্ছায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন। আলী তা চাপিয়ে দেননি। তদুপরি আলী চান না তাঁর প্রিয় স্ত্রীর উপর অতিরিক্ত চাপ থাকুক।

তাই একে কি আমরা মেহমানদারী ও বন্ধু হিতৈষী কর্ম বলব যে, এক ব্যক্তি সার্বক্ষণিক মেহমান এলে তার স্ত্রীকে নির্যাতন করবে আর একদিন এ নারী ক্লান্তির কারণে কাজ করতে অস্বীকার করলে সে বলবে, যদি কাজ না করতে চাও তবে আমার ঘর থেকে বের হয়ে যাও। তাই এগুলো সমাজ হিতৈষিতা নয়। তবে এমন কিছু যা আত্মত্যাগের পর্যায়ে পৌঁছে তার কথা ভিন্ন। যে ব্যক্তি সমাজ হিতৈষিতার ভিত্তিতে কাজ করতে চায় তাকে প্রথমে ন্যয়পরায়ণতার পর্যায় অতিক্রম করতে হবে অর্থাৎ যদি কেউ ন্যায়পরায়ণ হয়, অন্যের অধিকারের সীমালঙ্ঘন না করে, তারপর নিজের বৈধ অধিকার ত্যাগ করে তবেই তার কর্মকে আত্মত্যাগ বলা যাবে, নতুবা নয়। তাই প্রসিদ্ধ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা এ বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত সচেতন থাকতেন যাতে করে কারো অধিকার সামান্য পরিমাণও খর্ব না হয়। এমনকি নিজ পরিবারে স্ত্রী বা পুত্র-কন্যাদের নির্দেশ দিয়ে নিজের কোন কাজ করিয়ে নিতেন না। (মানুষের ব্যক্তিগত কাজের ক্ষেত্রে এরূপ করতেন। কিন্তু যে বিষয়টি সন্তানদের প্রশিক্ষণের জন্য সে ক্ষেত্রে নয়।)

মরহুম আয়াতুল্লাহ্ শেখ আবদুল করিম হায়েরীর শিক্ষক প্রসিদ্ধ মার্জায়ে তাকলীদ মির্জা মুহাম্মদ তাকী শিরাজী (রহ.)-এর ব্যাপারে এ রকম একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর স্ত্রী মাড়ী ভাত তৈরি করে ঘরের মধ্যে রেখে যান তাঁর জন্য। কিন্তু যখন তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন মনে করলেন দুর্বলতার কারণে যেখানে তা রাখা ছিল সেখান হতে তা গ্রহণে সক্ষম হলেন না। এভাবে কয়েক ঘন্টা অতিক্রান্ত হলে যখন স্ত্রী এসে দেখেন খাবার ঐ অবস্থায়ই রয়েছে তখন জিজ্ঞেস করলেন, "কেন তা খাননি?" তিনি বললেন, "শরীয়ত আমাকে এ অনুমতি দিয়েছে কি যে, স্ত্রীকে রান্নাঘর থেকে ডেকে এনে সেটা আমার নিকট এগিয়ে দেয়ার নির্দেশ দানের– সে বিষয়ে সন্দেহে ছিলাম। যে কাজ তুমি নিজ ইচ্ছায় করছ, আমি তার বাইরে অন্য নির্দেশ দান নিজের জন্য বৈধ মনে করছি না।"

সুতরাং কোন কাজ তখনই সমাজহিতৈষী হবে যখন তা আত্মপ্রচার ও স্বার্থপরতার কারণে নয়, বরং আত্মত্যাগের মনোবৃত্তি নিয়ে হবে।

ইতিহাসে আত্মত্যাগের নমুনা

মুতার যুদ্ধে রাসূল (সা.)-এর সাহাবীদের আত্মত্যাগের এক আশ্চর্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে– যাকে আত্মত্যাগের নমুনা বলা যেতে পারে। মুতার যুদ্ধে যখন একদল সাহাবী আহত হয়ে ময়দানে পড়েছিলেন। যেহেতু যুদ্ধাহত মানুষের শরীর হতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় তাই নতুন রক্তের চাহিদার কারণে প্রচণ্ড তৃষ্ণা অনুভূত হয়। এ যুদ্ধে এক ব্যক্তি আহতদের নিকট পানি নিয়ে যাচ্ছিল। সে প্রথমে

এক আহত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে পানি দিতে চাইলে সে অন্য ব্যক্তির দিকে ইশারা করে বলল, "তাকে প্রথমে পানি দাও, তার পানির প্রয়োজন অধিক।" তার নিকট পানি নিয়ে গেলে সে অন্য আরেকজনকে দেখিয়ে বলে, "ঐ ভাইকে পানি দাও, সে পানির জন্য কাতরাচ্ছিল।" যখন সে ঐ ব্যক্তির নিকট গেল, গিয়ে দেখল সে মারা গেছে। তাই দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট ফিরে আসল, কিন্তু ততক্ষণে দ্বিতীয় ব্যক্তিও মারা গেছে। এরপর প্রথম ব্যক্তির নিকট এসে দেখল সেও আর জীবিত নেই, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে গেছে। এটাকেই আত্মত্যাগ বলা হয়। মানুষ তার অত্যন্ত প্রয়োজন জেনেও সে বস্তুটি অন্যের জন্য ত্যাগ করে এবং অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়।

ভালোবাসার মতাদর্শের ত্রুটিসমূহ

সৃষ্টিসেবার মতাদর্শ যার উৎপত্তি ভালোবাসার মতবাদ হতে– এতে দু'টি ত্রুটি লক্ষণীয়। যদিও ভালোবাসা ও মানবসেবা দু'টি মানবীয় মূল্যবোধ, কিন্তু ক্ষমতার মতবাদের দু'টি ত্রুটি এ মতবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একটি হচ্ছে এ মতবাদ একমাত্রিক মূল্যবোধের দোষে দুষ্ট অর্থাৎ এ মতবাদ অন্যান্য মতবাদকে উপেক্ষা করে শুধু একটি মূল্যবোধকে ধারণ করেছে, আর তা হলো ভালোবাসা ও সেবার। ভালোবাসা মানুষের পূর্ণতার পথের অন্যতম মূল্যবোধ এবং পূর্ণ মানবের জন্য দানশীলতা এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা তার স্রষ্টা পরম সত্তার এক পূর্ণময় বৈশিষ্ট্য। তাই আল্লাহ্‌পাককে অসীম দানশীল বলা হয় এবং তাঁর হতেই সে এ বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। তবে এ মতবাদের ত্রুটি হচ্ছে তাঁরা অন্য সকল মূল্যবোধকে উপেক্ষা করেছেন এবং সৃষ্টির সেবার মূল্যবোধকে মনুষ্যত্বের একমাত্র মূল্যবোধ বলে প্রচার করেছেন।

ক্ষমতার মতবাদেরও সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল তাঁরা ক্ষমতাকে ঠিকমত বুঝতে পারেননি ও ভেবেছেন, ক্ষমতা অর্থ শারীরিক শক্তি ও ক্ষমতা বৈ অন্য কিছু নয়। তাঁরা যেমন আত্মিক ও মানসিক শক্তিকে ভুলে গিয়েছিলেন তেমনি ভালোবাসার মতবাদও মানবসেবার ক্ষেত্রে এমনই একটি বড় ত্রুটি করেছে যা এখানে আলোচনা করব।

সৃষ্টির সেবার অর্থ কি? সেটা সৃষ্টির কোন্ সত্তার সেবা? এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, আপনি বলেছেন, মনুষ্যত্বের অর্থ মানুষ সৃষ্টির সেবা করবে। খুব ভালো কথা, কিন্তু আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন যে, সৃষ্টির কোন্ সত্তার সেবা করব? যদি বলেন, সৃষ্টির উদরের সেবা অর্থাৎ যখন সে ক্ষুধার্ত তখন তাকে খাদ্য দান করে তার উদরের সেবায় নিয়োজিত হব। অবশ্যই এটি ভালো কাজ যে, ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য দিতে হবে। তেমনি বস্ত্রহীন মানুষকে বস্ত্র দানও তার দেহের প্রতি সেবা বলে পরিগণিত যেহেতু তা তাকে শীত-গ্রীষ্মের শীতলতা ও উষ্ণতা হতে রক্ষা করে। মানুষের বাসস্থান ও স্বাধীনতাও প্রয়োজন। এ সবই ঠিক এবং তা মানবসেবা বলেও গণ্য হবে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন হলো এর শেষ লক্ষ্য কি? আমরা যদি মানুষের এ প্রয়োজনগুলো পূরণ করি এটুকুই মানবসেবা হবে। যদি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি অর্থাৎ মানুষ এমতাবস্থায় থাকে যে, নিজের প্রতি সে সেবা করে না অর্থাৎ অজ্ঞতার কারণে নিজেই নিজের প্রথম শ্রেণীর শত্রু হয়, এমন কাজ করে যা তাকে সৌভাগ্যের পথে তো পরিচালিত করেই না বরং দুর্ভাগ্য ও মানবতার অবক্ষয়ের দিকে পরিচালিত করে, তখনও কি আমরা চোখ বন্ধ করে বলব, আমাদের আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবা করতে হবে, তার উদর পূর্ণ করতে হবে, দেখার দরকার নেই যে, সে

কোন্ পথে চলেছে? মানুষের উদর পূর্তি করার মধ্যেই আমাদের মানবসেবা সীমাবদ্ধ থাকবে নাকি আমরা দেখব যে, কোন্ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের দিকে সে যাত্রা করছে? যদি কেউ বলে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কোন্ লক্ষ্যের দিকে চলছে তা আমার দেখার প্রয়োজন নেই, বরং আমরা দেখব কিরূপে তার উদর পূর্তি ও দেহ আবৃত করা যায়, তবে সে ভুল করবে। কারণ মানবসেবা তখনই মানবসেবা বলে পরিগণিত হবে যখন তা মানবীয় মূল্যবোধের সেবায় নিয়োজিত হবে, নতুবা তার বিন্দুমাত্র মূল্য নেই।

মানবসেবা ঈমানের পূর্বশর্ত

একদল লোক বলে থাকেন, ঈমানের মূল এবং ইবাদতের লক্ষ্য হলো মানব-কল্যাণ ও সৃষ্টির সেবা। আল্লাহ্‌র আনুগত্যের অর্থও তা-ই। আমরা এজন্য ঈমানের অধিকারী হব যাতে করে ঈমানের ছায়ায় মানবের সর্বাত্মক কল্যাণ করা যায়। ঈমান ব্যতীত তা সম্ভব নয় বলেই আমাদের ঈমানের ছায়ায় আশ্রয় নিতে হবে। তাঁদের মতে ইসলামসহ সকল ধর্মের ও বিশেষ ব্যক্তিত্বদের নির্দেশ এটাই ছিল যে, সৃষ্টির সেবা কর। তাঁরা বলতে চান না এ সেবার ফলে সৃষ্টি কি লাভ করবে? তাঁরা সৃষ্টির সেবার কথা বললেও সৃষ্টির প্রকৃত উন্নয়নের জন্য এঁদের কোন পরিকল্পনা নেই। তাই ঈমান বা ইবাদত মানবসেবার পূর্বশর্ত নয়, বরং মানবসেবা ঈমান ও ইবাদতের পূর্বশর্ত বা প্রাথমিক ধাপ। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার এবং এরূপ অন্যান্য সকল মানবীয় মূল্যবোধ অর্জনের পূর্ব ধাপ হচ্ছে মানবসেবা। অর্থাৎ আমরা মানবসেবার মাধ্যমে সৃষ্টিকে ঈমানের দিকে পরিচালিত করব। মানবসেবার মাধ্যমেই সেই আল্লাহ্‌র ইবাদত ও অন্যান্য মানবীয় মূল্যবোধের পথে মানুষকে পরিচালিত করব।

মানবসেবা ঈমানের পরিবেশ সৃষ্টি করে। ঈমান মানবসেবার পূর্বশর্ত নয়। যদি এরূপ না হয় তবে তা অর্থহীন হবে এবং মনুষ্যত্ব ছাড়া মানুষকে চিন্তা করতে হবে। তখন লুলুম্বা আর মূসা চুম্বাকে একই দৃষ্টিতে দেখা শুরু করবে কারণ দু'জনেরই শরীর ও উদর রয়েছে এবং দু'জনই ক্ষুধার্ত হয় ও বস্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করে। দৈহিকভাবে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আমি কোন কোন নামকরা পত্রিকায় এমন কিছু লেখা দেখেছি যেখানে ইসলামী এরফানের বেশ প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের এরফান ক্ষুদ্র নয় বরং অনেক মূল্যবান কথা বলেছে, মানব ও সৃষ্টিসেবাকে তার মহান ও শেষ লক্ষ্য নির্ধারণ করেছ।

না, এ কথা ঠিক নয়। এরফানের শেষ লক্ষ্য মানবসেবা নয়, বরং এর গন্তব্যের প্রথম ধাপসমূহের একটি হলো মানবসেবা। অন্যভাবে বলা যায়, আল্লাহ্‌র নৈকট্য মানবসেবার পূর্বশর্ত নয়, বরং মানবসেবা আল্লাহ্‌র নৈকট্যের অন্যতম পূর্বশর্ত।

সুতরাং ভালোবাসার মতবাদের দু'টি ত্রুটি : প্রথমত ভালোবাসাকে একমাত্র মূল্যবোধ মনে করে, দ্বিতীয়ত মানবসেবাকে মানবতার সর্বশেষ ধাপ মনে করে (ঈমান ও ইবাদতকে সেখানে পৌঁছানোর সোপান বলে ধারণা করে)। কিন্তু ইসলাম তা গ্রহণ করে না। ইসলাম ভালোবাসা ও সৃষ্টির সেবাকে একটি মানবীয় মূল্যবোধ হিসেবে প্রশংসা করে, কিন্তু একমাত্র মূল্যবোধ হিসেবে নয় এবং এ পথের প্রথম গন্তব্য মনে করে, শেষ গন্তব্য নয়– এখান থেকে শুরু করলেও শেষ লক্ষ্য অন্য কিছু।

وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَ بِاللهِ العَلِي الْعَظِيْمِ.

১২

সমাজতান্ত্রিক মতবাদের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّه وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ

ইনসানে কামেল সম্পর্কিত অপর একটি মতবাদ হলো সোশ্যালিজম বা সমাজতন্ত্র। এ মতবাদে মানুষের পূর্ণতা ও অপূর্ণতা দু'টি বস্তুতে বিশ্বাস করা হয়। মানুষের অপূর্ণতা মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মধ্যে আর তার পূর্ণতা সমাজ বা সামষ্টিকতার মধ্যে এ অর্থে যে, যতক্ষণ মানুষ আমিত্বের ধারণায় থাকবে ততক্ষণ অপূর্ণ (অবশ্য এরফান যে আমিত্ব বলে তা থেকে এটা আলাদা) আর আমিত্বের ধারণার বিলুপ্তির মাধ্যমে তার পূর্ণতা অর্জিত হবে।

এরফানী ধারণায় আমিত্বকে তার জন্য ধ্বংস কর অর্থাৎ ব্যক্তির প্রথম ও নিজসত্তা হিসেবে আমিত্বের বিলুপ্তি ঘটলে তৃতীয় সত্তা যিনি হলেন মহান আল্লাহ্পাক তিনি সে স্থান দখল করবেন। তাঁর মধ্যে আমার বিলুপ্তি অর্থ আল্লাহ্র মধ্যে মানুষের বিলুপ্তি।

এরফানী মতবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের এ ক্ষেত্রে মিল রয়েছে যে, এ দু'মতবাদই আমিত্বের অবসান চায়, তবে সমাজতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার বিলুপ্তি চায় তৃতীয় সত্তার প্রতিস্থাপনের জন্য নয় বরং সেখানে 'সামষ্টিকতা' বা 'আমরা'কে স্থান দেয়ার জন্য। এদের মতে পূর্ণ মানব আরেফ নয় যে বলবে, আমার আলখাল্লার নীচে খোদা ব্যতীত অন্য কেউ নেই বরং আমরায় বা সামষ্টিক সত্তায় বিলুপ্ত আমিই হলো পূর্ণ মানব। সে পূর্ণ মানব আমিত্বকে অনুভব করে না, করে আমরাকে।

এ পর্যন্ত এ মতবাদ যা বলে, অন্যান্য অনেক মতবাদই তা গ্রহণ করে। এমনকি যে সকল মতবাদ তৃতীয় সত্তার জন্য প্রথম সত্তাকে বিলুপ্ত করার পক্ষপাতী তারাও এ বিষয়টির বিরোধী নয়। তারাও চায় 'আমি' বিলুপ্ত হয়ে 'আমরা'য় পরিণত হোক।

এ মতবাদের সারকথা

এ মতবাদ 'আমি'কে 'আমরা'য় রূপান্তরিত করার পথও বাতলে দিয়ে বলেছে, কোন বস্তু আমার না হয়ে আমাদের হওয়া অর্থাৎ মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে সামষ্টিক মালিকানায় রূপান্তরই এ পূর্ণতার পথ। আপনি যদি সম্পদের স্বত্বাধিকারের বিষয়টি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন তা দু'ধরনের : এক ধরনের বিষয় রয়েছে যা আমাদের সমাজে আমাদের সকলের সম্পদ, যেমন ইরানীদের জন্য ফার্সী ভাষা– যা আমার-আপনার কারোরই ব্যক্তি মালিকানার বিষয় নয় বরং এটা সকল ফার্সী ভাষাভাষির সম্পদ। দেশ বা রাষ্ট্রও তেমনি কোন ব্যক্তির সম্পদ নয় বরং ঐ রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সম্মিলিত সম্পদ। যা কিছুরই

সামষ্টিক মালিকানা রয়েছে তা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। স্বদেশী, স্বভাষী, এক সংস্কৃতি, এক ধর্ম এরূপ বিষয়সমূহ ব্যক্তি মালিকানার বিষয় না হওয়ায় এগুলো সাধারণভাবে 'আমাদের' ধারণার জন্ম দেয়।

অন্যদিকে কিছু বস্তু বা বিষয় রয়েছে যেগুলো ব্যক্তিগত ও বিশেষ সত্ত্বাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- আমার বাড়ি, আমার অর্থ, আমার পোশাক, আমার কার্পেট, আমার গাড়ী। আমার বাড়ি আমারই, অন্য কারো নয়। আমার অর্থ-সম্পদও আমার, অন্য কারো অধিকার সেখানে নেই। এরূপ মালিকানার বিষয় যা বিশেষ ব্যক্তির স্বত্বাধিকারের অন্তর্ভুক্ত সেটা সাধারণ নয়। বলা হয়ে থাকে, যে সকল বিষয় ব্যক্তিসত্তা ও মালিকানার জন্ম দেয় সেগুলো আমিত্বের সৃষ্টি করে। ব্যক্তি মালিকানা ও সত্বাধিকার হতে 'আমাদের' ধারণা সৃষ্টি হয়। সুতরাং মানুষের পূর্ণতার মানদণ্ড হলো 'আমরা' ও 'আমাদের' হওয়া। আর 'আমাদের' হওয়ার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি মালিকানা ও সত্তাকে বিলীন করে সামাজিক ও সামষ্টিকতাকে (সামষ্টিক মালিকানা) প্রতিষ্ঠা করা।

তাদের দাবি মানুষ যখন প্রথম সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করা শুরু করে তখন মানবসমাজ সামষ্টিক সমাজ ছিল, কোন ব্যক্তি মালিকানা ছিল না। আমার জমি, তোমার জমি, আমার সম্পদ, তোমার সম্পদ এগুলোও ছিল না। সব কিছুর উপর সামষ্টিক মালিকানা ছিল এবং মানুষ সে সমাজে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করত। আমাদের ধর্মে যেমন এসেছে যে, আমাদের আদি পিতা-মাতা এক বেহেশতে বাস করতেন, অতঃপর অপরাধ করার কারণে বেহেশত থেকে বিতাড়িত হন এবং মাটির এ পৃথিবীতে কঠিন জীবনের সম্মুখীন হন। এ মতবাদের প্রবক্তাদের বর্ণনাও আমরা এ ঘটনার অনুরূপে ব্যাখ্যা করতে পারি। মানব জাতি সৃষ্টির আদিতে সামষ্টিক মালিকানার স্বর্গীয় সমাজে বাস করত। পরবর্তীতে এক অপরাধ করে সেই স্বর্গ হতে বহিষ্কৃত হন। সেই অপরাধ হলো ব্যক্তি মালিকানার জন্মদান এবং 'আমাদের' স্থানে 'আমার' চিন্তার উৎপত্তি। যখন মানব সমাজে ব্যক্তি মালিকানার সৃষ্টি হলো তখন মানুষ সৌভাগ্য বঞ্চিত হয়ে কঠিন পরিবেশের সম্মুখীন হয়ে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং এখনও সে এ বোঝা বহন করছে। এখন মানুষকে তওবা করতে হবে যাতে করে পূর্ণতার সেই স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করতে পারে এবং সে তওবা হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানা হতে অনুশোচনা করে ফিরে আসা। যখনই মানুষ সামগ্রিকভাবে ব্যক্তি মালিকানা ও সত্বাধিকার হতে তওবা করবে ও সামষ্টিক মালিকানাকে গ্রহণ করবে তখনই মানুষ তার পূর্ণতায় পৌঁছবে।

বলা হয়ে থাকে, ব্যক্তি মালিকানা হতেই জুলুমের সৃষ্টি হয়। তাই ব্যক্তি মালিকানা হতেই শোষক ও শোষিতের জন্ম হয়েছে। মানুষ যতক্ষণ শোষক অথবা শোষিত থাকবে ততক্ষণ অপূর্ণ। শোষক ও শোষিতের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য যাদের একদল সম্পদ পুঞ্জিভূত করে দামাভান্দ পর্বতের মত উঁচু করেছে এবং অপরদল সম্পদহীনতার গভীর গহ্বরে নিপতিত হয়েছে। যতক্ষণ এ অবস্থা বিরাজ করবে মানবসমাজ সৌভাগ্যের মুখ দেখতে পারবে না। সমাজ তখনই সৌভাগ্যের মুখ দেখতে পারবে যখন পাহাড় ও গহ্বর সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। অর্থাৎ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হবে এবং তখনই মানুষ পূর্ণতায় পৌঁছবে। সুতরাং এ মতবাদ মানুষের পূর্ণতা ব্যক্তি মালিকানা ও এর ফলে উদ্ভূত শোষক ও শোষিত শ্রেণীর বিলুপ্তির মধ্যে নিহিত বলে মনে করে। শোষণ যেমন শোষিতের মধ্যে হিংসা

ও বিদ্বেষের জন্ম দেয় তেমনি শোষকের মধ্যে সৃষ্টি করে লোভ ও সম্পদলিপ্সা। যখন এই শোষণের মূল 'ব্যক্তি-মালিকানা'র অবসান ঘটবে তখনই মানুষের পূর্ণতা ঘটবে।

এ মতবাদের মৌল ত্রুটি

'আমি' পরিবর্তিত হয়ে 'আমরা'য় রূপান্তর অর্থাৎ আমিত্ব বলে সমাজে কিছু থাকবে নাথ– এ ধারণা সমাজতন্ত্রের একার কথা নয়। যে পথ সমাজতন্ত্র দেখায় এবং এরই নিজস্ব তা হচ্ছে 'আমিত্ব'-এর জন্মদানকারী হলো ব্যক্তি-মালিকানা এবং 'আমাদের' ধারণার জন্মদাতা হলো সামষ্টিক মালিকানা।

কেউ সমাজতন্ত্রের এ চিন্তার উত্তর দিতে চাইলে এভাবে তা দিতে পারেন– তিনি বলতে পারেন, 'জনাব সমাজতান্ত্রিক! বস্তুর উপর ব্যক্তির মালিকানা আমিত্বের জন্ম দেয়, নাকি বস্তুর প্রতি মানুষের আসক্তি অর্থাৎ যখন বস্তুই মানুষের সর্বস্বে পরিণত হয়? বস্তুর উপর ব্যক্তির মালিকানা অর্থাৎ মানুষ মালিক এবং বস্তু তার অধীন হলে আমিত্বের সৃষ্টি করে মানুষের পরস্পরের মধ্যে সীমারেখা টেনে দেয় ও ঐক্য বিনষ্ট করে নাকি এর উল্টোটা? মানুষের মালিকানা ও স্বত্বাধিকার এর জন্য দায়ী নয় বরং এর বিপরীতে বস্তু যখন মালিক এবং মানুষ তার অধীন হয় তখন এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এরফানের পরিভাষায় মানুষ যখন বস্তুর আসক্ত হয়ে পড়ে তখনই আমিত্বের সৃষ্টি হয়। অর্থ-সম্পদের অধিকারী হওয়া আমিত্বের জন্ম দেয় না, বরং অর্থ ও সম্পদের দাস হলেই মানুষের মধ্যে আমিত্বের সৃষ্টি হয় ও 'আমাদের' ধারণার বিলুপ্তি ঘটে।

এ মতবাদের মতে ব্যক্তি-মালিকানাকে বিলুপ্ত করলে 'আমিত্ব' পরিবর্তিত হয়ে আমাদের হয়ে যাবে। বিপরীতপক্ষে আমাদের মতবাদে (ইসলামে) এ কথা বলে না যে, ব্যক্তি-মালিকানা বিলুপ্ত কর বরং বলে প্রকৃত মানুষ তৈরি কর, মানুষকে সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ দান কর, তাকে সর্বোত্তম আদর্শ শিক্ষা দাও যাতে করে সম্পদ ও বস্তুর অধিকারী হলেও বস্তুর প্রতি তার আসক্তি থাকবে না, সে বস্তুর দাস হবে না, বরং স্বাধীন হবে। কোন্ মানুষটি আমাদের ধারণা পোষণ করে? যে মানুষের কোন কিছু নেই সে, নাকি যে মানুষ আত্মিক স্বাধীনতার অধিকারী? এটা কখনই ঠিক নয়, যে ব্যক্তির কিছু নেই সে-ই আমাদের ধারণার অধিকারী। মানুষ তখনই আমাদের ধারণার অধিকারী হবে যখন তার বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকবে না, বস্তু তাকে নিজের অধীন করবে না এবং কখনও করে না। এরূপ ব্যক্তিরই 'আমিত্ব' নেই; রয়েছে 'আমাদের' ধারণা। এখানে দু'টি উদাহরণ দেয়া হয়। বলা হয় যে, আমরা সব সময় একদল মানুষকে দেখি যারা বস্তুর মালিক হয়েও বিশেষ প্রশিক্ষণের কারণে বস্তুর দাস, অধীন ও বন্দি নয়। যুহদ বা দুনিয়া বিমুখতার প্রকৃত অর্থ এটাই যা হযরত আলী নাহজুল বালাগায় বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ দুনিয়ার দাস না হয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচা। অপরপক্ষে একদল লোক রয়েছে যাদের তেমন কোন সম্পদই নেই, অথচ ঐ সম্পদকে আঁকড়ে থাকে ও তারই দাস ও সেবক হিসেবে সে নিয়োজিত। এদের 'আমিত্ব' 'আমাদের' চিন্তায় পরিণত হয়নি।

আলীর দৃষ্টিতে দুনিয়া

আলী দুনিয়াকে লক্ষ্য করে বলছেন, "হে দুনিয়া! তোমাকে তিন তালাক দিলাম– যে তিন তালাক ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ নেই।" أُعْزُبِيْ عَنِّي "হে দুনিয়া! আমা হতে দূর হও।"

فَوَ اللّٰهِ لا أَذِلُّ لَكَ فَسْتَذِلِّيْنِيْ وَ لا أَسْلَسُ لَكَ فَتَقُوْدِيْنِيْ "আল্লাহ্‌র কসম! কখনই তোমার নতি স্বীকার ও তোমার অনুগত হয়ে অপমানিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করব না।" (নাহজুল বালাগাহ্, পত্র নং ৪৫)

আলী সব সময় দুনিয়া ও সম্পদের প্রতি উপেক্ষা ও ঔদ্ধত্য ভাব দেখিয়েছেন। কখনই দুনিয়াকে তাঁর অন্তরে প্রভাব ফেলার কোন সুযোগ দেননি। وَ لا اَسْلَسُ لك (اسلس অর্থ এমন উট বা প্রাণী যে এতটা অনুগত যে, একটা বাচ্চাও তাকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম) "আমি কখনই তোমাকে সে সুযোগ দেব না যাতে করে আমার মনে প্রভাব ফেলে আমাকে নিয়ন্ত্রণ কর, যে দিক খুশী টেনে নিয়ে যাও।" এটাই ইসলামের দুনিয়া বিমুখতা ও দুনিয়ার নেয়ামতের নিকট নিজেকে বিক্রি না করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার নমুনা।

অন্যত্র আলী বলেছেন,

اَلدُّنْيَا دَارُ مَمَرٍّ لا دَارُ مَقَرٍّ وَ النَّاسُ فِيْهَا رَجُلاَنِ رَجُلٌ باعَ فِيْهَا نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا وَ رَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا

"দুনিয়া অস্থায়ী স্থান, স্থায়ী বাসস্থান নয় (এটা বাজারের মতো)। এখানে দু'ধরনের মানুষ রয়েছে : একদল নিজেকে বিক্রী করে ধ্বংস করে অন্যদল নিজেকে কিনে স্বাধীন হয় ও মুক্তি লাভ করে।" (নাহজুল বালাগাহ্, হেকমত ১৩৩)

একদিন আলী (আ.) নিজ মালিকানাধীন কিছু দিরহাম বা দিনার নিজের হাতে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে অর্থ! তুমি যতক্ষণ আমার হাতে রয়েছ ততক্ষণ আমার নও।" কথাটি আমাদের ধারণা ও কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা বলি যতক্ষণ অর্থ আমার পকেটে অথবা হাতে রয়েছে তা আমার, যখন খরচ করে ফেলব তখন আমার থেকে চলে গেল। আলী (আ.) এর বিপরীতে বলছেন, "তুমি যতক্ষণ আমার হাতে রয়েছ আমার নও।" কারণ ততক্ষণ আমাকে তোমার সেবা করতে হবে ও তোমাকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আর যখন তোমাকে খরচ করে ফেলব তখন তোমার প্রতি কোন দায়িত্ব নেই। তাই তখন তুমি আমার অধীন।

আলী (আ.) একদিন কুফার বাজারে এক কসাইয়ের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। কসাই তাঁকে ডেকে বলল, "আজকে খুব ভালো মাংস এনেছি যদি কিনেন।" আলী (আ.) বললেন, "আমার নিকট অর্থ নেই।" কসাই বলল, "আমি অর্থের জন্য ধৈর্যধারণ করতে রাজী আছি।" হযরত আলী বললেন, "আমি আমার উদরকে বলব ধৈর্যধারণ কর। কেন তুমি আমার উদরের জন্য ধৈর্যধারণ করবে? আমি বরং তোমার নিকট ঋণী না থেকে ধৈর্যধারণ করব।"

আমিত্ব থেকে মুক্তির জন্য আত্মিক সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম বলে যদি মানুষকে 'আমিত্ব' থেকে 'আমাদের' ধারণায় আনতে চাও, তবে তার অভ্যন্তরকে সংশোধিত কর। তাকে বস্তুর দাস ও অনুগত হওয়ার সুযোগ দিও না। নতুবা শুধু ব্যক্তি-মালিকানা রহিত করবার মাধ্যমে এর উপশম সম্ভব নয়। অবশ্য এ বিষয়ে দু'ধরনের মত রয়েছে। কারো কারো মতে ব্যক্তি-মালিকানা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই, শুধু আত্মিক প্রশিক্ষণ ও সংশোধনের বিষয়ে গুরুত্ব দাও। অন্যদের মতে এটা ঠিক যে, মানুষের অভ্যন্তরীণ দিকটিই মুখ্য, তদুপরি তার বাইরের

দিকটিকেও সংশোধন না করলে তা সম্ভব নয়। ইসলামে আমরা অভ্যন্তরের সাথে বাইরের বিষয়েও গুরুত্ব দিতে দেখি। ইসলাম মানুষের বাইরের অসামঞ্জস্য ও ভারসাম্যহীনতার সামঞ্জস্য বিধান করতে চায়, তবে তা ব্যক্তি-মালিকানাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদের মাধ্যমে নয়। ইসলাম বাইরের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়, তবে 'আমি' 'আমরা'য় রূপান্তরিত হওয়ার জন্য বাইরের সামঞ্জস্য বিধানকে যথেষ্ট মনে করে না বরং সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রকৃত আত্মিক ভারসাম্য প্রয়োজন বলে মনে করে।

ব্যাকরণে নিশ্চয়ই 'সম্বন্ধ' ও 'সম্বন্ধিত' পদ সম্পর্কে পড়েছেন। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হলো সম্বন্ধের দিকে। এই সম্বন্ধ পদগুলো যখন 'আমার' সঙ্গে আসে, যেমন আমার বাড়ি, আমার টাকা ইত্যাদি তখন আমিত্বের জন্ম হয়। এই সম্বন্ধ পদগুলোই সব সমস্যার মূল। তাই একে উচ্ছেদ করে আমাদের করতে হবে। (আপনারা জানেন, এরা পূর্বেও যেমন বর্তমানেও তেমন যৌথ মালিকানার বিষয়টি পরিবারের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারণের পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘটিত বিপ্লবের প্রারম্ভিক পর্যায়ে নারীর উপর সামষ্টিক মালিকানার বিষয়টি প্রয়োগের চিন্তা করে, কিন্তু তা করতে ব্যর্থ হয়ে ১৯৩৬ সালে রহিত করে।)

কিন্তু ইসলাম বলে, তাদের সম্বন্ধ করার কিছুই নেই; সম্বন্ধিত সত্তা অর্থাৎ 'আমি' সব কিছুর জন্য দায়ী। আমাদের দেখতে হবে, এ 'আমি' কার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। যদি সম্বন্ধ পদটি সীমিত ও ব্যক্তি বিষয়ের হয়, তবে 'আমি' আমিত্বে পরিণত হবে (১*) আর যখন সমাজের আত্মা সম্পর্কিত বিষয় হয়, যেমন আদর্শ, ঈমান, স্রষ্টা প্রভৃতি তখন 'আমি' 'আমাদের' ধারণায় পরিণত হবে। এ মতবাদের সমর্থকরা যুক্তি দেখান, "আমরা একদিকে একদল লোক দেখি যারা প্রচুর সম্পদের অধিকারী, কিন্তু তাদের 'আমি' 'আমাদের' সত্তায় পরিণত হয়েছে। যখন তাদের কিছুই ছিল না তখনও তাদের সত্তা 'আমাদের' ছিল। আবার যখন সব কিছুই তারা লাভ করেছে তখনও তাদের সত্তা 'আমাদের' ধারণা হতে সরে আসেনি। কারণ তাদের মন ও মানসিকতা বস্তুর প্রতি আসক্ত ছিল না।" আলী ইবনে আবি তালিব এমনই এক ব্যক্তি। যখন আলীর জীবন অত্যন্ত সংগ্রামমুখর ছিল ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কাটত, হয়তো কোন দিন নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের খাওয়ার মতো খাদ্যই তাঁর জুটেছে যার সবটুকুই দান করে দিতেন, নিজের পরিবারের জন্য কিছুই রাখতেন না। আবার এমন দিনও আলীর এসেছে যে, সর্ববৃহৎ দেশের অর্থাৎ তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের খলিফা হিসেবে বায়তুল মালের অধিকারী ছিলেন। যেমন খুশী নিজের ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু এ দু'অবস্থার কোনটিতেই তাঁর মধ্যে আমিত্ব ছিল না, সব সময়ই তাঁর সত্তা ছিল আমাদের। সব সময়ই নিজেকে ভুলে অপরের চিন্তায় নিমজ্জিত ছিলেন। সুতরাং 'আমি'কে 'আমাদের' করার জন্য ব্যক্তি-মালিকানার অবসানের প্রয়োজন নেই।

আমিত্ব সৃষ্টির একমাত্র কারণ ব্যক্তি-মালিকানা নয়

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলতে হয়, মানুষের সকল কর্মকাণ্ড অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় যে, বলা যাবে ব্যক্তি-মালিকানাকে সামষ্টিক মালিকানায় পরিণত করলে 'আমি' 'আমরা'য় পরিণত হয়ে যাবে। মানুষের জীবনের অনেকগুলো দিকের একটি দিক হলো অর্থনীতি যেখানে ব্যক্তি-মালিকানার বিষয় রয়েছে। কিন্তু তার জীবনের অন্যান্য দিক অর্থনীতি ও ব্যক্তি-মালিকানার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, যেমন 'পদমর্যাদা'

ও 'নারী'। এ দু'টি বিষয় মর্যাদার দিক হতে কোন অবস্থাতেই অর্থনীতি হতে কম মূল্যের নয়। কখনো কখনো মানুষ একজন নারীর জন্য তার সকল অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করে বা কোন সামাজিক পদমর্যাদার জন্য তা ব্যয় করে। তাকে আমরা কি বলব? সকল নারীকে একই ছাঁচে ফেলে সকল দিক হতে পরস্পরের সমমান করা সম্ভব কি? যদিও বাস্তবে নারীর মালিকানার ক্ষেত্রে যৌথ বা সামষ্টিক মালিকানার কোন ব্যাপার নেই তদুপরি এখানে 'আমার' ধারণা বর্তমান।

পদমর্যাদাও তদ্রূপ। যদি ধরি, যে ব্যক্তি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে রয়েছেন তিনি খাদ্য, বাসস্থান ও যানবাহনের ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিকের সমান, যেমন সমাজতান্ত্রিক চীনের প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর দেশের কোন এক কারখানার শ্রমিকের সম অবস্থানে রয়েছেন, তাদের বাসস্থান, যানবাহন সবই এক রকম, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির উপহার তিনি গ্রহণ করে গর্বিত হন না। এখন কি বলা যাবে, তিনি বাকী সকল বিষয়ে সাধারণ নাগরিকদের পর্যায়ে রয়েছেন? না, কারণ তিনি যে পদ ধারণ করে রয়েছেন অন্যরা তা ধারণ করছে না এবং এ পদের সুবাদে রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিক প্রভৃতিতে শতবার তাঁর নাম উচ্চারিত হচ্ছে ও ছবি আসছে, অথচ ঐ শ্রমিক এ সব ক্ষেত্রে সাম্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে ও ঐ সুবিধাগুলো পাচ্ছে না।

তাই বোঝা যায়, ঐ প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদাকে সামষ্টিক মালিকানার আওতায় আনা সম্ভব নয়। বাধ্যতামূলকভাবেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতৃত্বের দায়িত্ব কোন এক ব্যক্তিকে দিতে হবে। এক ব্যক্তি সাধারণ সম্পাদক হবে, কেউ সহ-সভাপতি হবে, এমনভাবে দায়িত্ব বণ্টিত হতে হবে শেষ পদ পর্যন্ত। কোন অফিসের ক্ষেত্রেও সেরূপ।

'আমি' 'আমরা'য় পরিণত হতে হলে ব্যক্তি-মালিকানা বিলুপ্তকরণই যথেষ্ট নয়। যেহেতু অনেক স্থানেই দেখেছি ব্যক্তি-মালিকানা বিলুপ্ত হলেও 'আমি' 'আমরা'য় পরিণত হচ্ছে না। এ কারণেই সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যেও প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব রয়েছে। তারা একে অপরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত। তাদের এ প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য আধিপত্য বিস্তার ও সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা। সুতরাং 'আমি' 'আমরা'য় রূপান্তরের তাদের এ কথা শুধুই কথা।

অবশ্য আমরা স্বীকার করি, আমিত্ব সৃষ্টিতে মালিকানার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং তা 'আমরা' ধারণার প্রতিবন্ধক। এজন্য ইসলাম মালিকানা ও সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। পূর্ণ মানবের অন্যতম শর্ত হলো 'আমি' 'আমরা'য় পরিণত হওয়া, এটা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু শুধু 'আমি' 'আমরা'য় পরিণত হলেই মানুষ পূর্ণ মানবে পরিণত হবে– এ কথাটি ঠিক নয়। তাই সমাজতান্ত্রিক মতবাদ একপেশে মূল্যবোধকেন্দ্রিক মতবাদ এবং তাদের এ ধারণাটি ঠিক নয় যে, সকল মূল্যবোধ 'আমি' 'আমরা'য় পরিণত হওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং এ ছাড়া মূল্যবোধের অস্তিত্ব নেই। আমরা অন্যান্য মতবাদের ব্যাপারেও লক্ষ্য করেছি যে, বিশেষ একটি মূল্যবোধকে মানবের পূর্ণতার জন্য যথেষ্ট মনে করেছে। কিন্তু একটি বিষয়কে একমাত্র মানবীয় মূল্যবোধ মনে করা ঠিক নয়।

‘আমি’ ‘আমরা’য় পরিণত হওয়ার পথ হলো ঈমান

প্রকৃতপক্ষে ‘আমিত্ব’ তখনই ‘আমরা’য় পরিণত হবে যখন তা পূর্বেই ‘সে’ ধারণায় পরিণত হয়ে থাকবেথ– যেটা আরেফদের ধারণা। ‘আমি’ ‘সে’ ধারণায় পরিণত হওয়ার পূর্বে ‘আমরা’য় পরিণত হতে পারে না। ‘আমি’ ‘সে’ ধারণায় পরিণত হওয়ার অর্থ আল্লাহ্য় বিশ্বাস।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّه وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ

এ আয়াতের লক্ষ্য আহ্লে কিতাব। তাদের উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে– “হে আহ্লে কিতাব! (ইহুদী, নাসারা, মাজুসী, যারথুষ্ট্র) তোমরা একটি সত্য বাণীর দিকে এসো যা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে একই, আর তা হলো আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত করব না এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করব না ও আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের মধ্যে একে অপরকে প্রভু বলে গ্রহণ করব না।” কোরআনের سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ কথাটি কতটা আশ্চর্যজনক! বলা হয়েছে, সে-ই সত্যের দিকে এসো যা আমারও নয়, তোমারও নয়, আমাদেরও নয়, তোমাদেরও নয়। এই আমরা– আমরা এবং তোমরা সকলে মিলে। আমি ইসলামের নবী হয়ে বলতে পারি না যে, এ আল্লাহ্ শুধু আমার– ঈসার অনুসারীদের আল্লাহ্ নয়, ইহুদীদের আল্লাহ্ নয়, যারথুষ্ট্রদের আল্লাহ্ নয়, মূর্তি বা পাথর পূজারীদের আল্লাহ্ নয়, তিনি বায়ু ও পানির আল্লাহ্ নন। বরং তিনি সকলের স্রষ্টা ও প্রভু। তাই সকল কিছুই তাঁর অধীন। মানুষ যদি তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে এক অসীমের সংশ্লিষ্টতা লাভ করেছে যা ‘আমিত্ব’ ও ‘সীমা’র ধারণা সৃষ্টি করে না। এটা ‘অর্থ’ (টাকা) নয় যে, তুমি বা আমি তার সঙ্গে সংযুক্ত হলে যুদ্ধ বেঁধে যাবে। বরং এটা এমন এক মহাসত্য একই মুহূর্তে যা সকলকে নিজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখতে সক্ষম। কিরূপে ‘আমরা’ ধারণা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব? অবশ্যই ঈমান ও আদর্শের ভিত্তিতে, যার উৎস একটি শব্দ, আর তা হলো আল্লাহ্। প্রথমে তাঁকে ধারণ করার মাধ্যমেই ‘আমরা’য় পরিণত হওয়া সম্ভব। যখন ‘সে’তে পরিণত হব তখন ‘আমিত্ব’ বিলীন হয়ে যাবে এবং সকলেই ‘তাঁর’ এই রংয়ে রঞ্জিত হব। আর এভাবেই ‘আমরা’য় পরিণত হতে পারব। সেই সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। ধরি, যদি নবী (সা.) প্রস্তাব করতেন, এসো আমরা সকলে আরবী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করে এক হয়ে যাই। তবে ফার্সী বা অন্য ভাষার কেউ হয়তো বলবে, কেন আরবী শিক্ষা করব বরং ফার্সী শিক্ষা গ্রহণ করি বা ফ্রেঞ্চ। তাই আরবী ভাষা এমন নয় যাতে সকলেই সমান হতে পারে। আরবী, ফার্সী, তুর্কী, ফ্রেঞ্চ এ সকল ভাষা কোন বিশেষ জাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভাষা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলোও অনুরূপ।

যে বিষয়টি সকলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও বিশেষ কারো নয় তা হলো স্রষ্টা, যিনি সকলকে সৃষ্টি করেছেন এবং সকলের প্রত্যাবর্তন তাঁর দিকেই। تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ “এসো আমরা সকলেই তাঁর দিকে ফিরে যাই এবং কেবল তাঁরই উপাসনা করি ও তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকেই শরীক না করি।” যখন তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করব তখনই ‘আমরা’ হতে পারব ও অন্যদের নিজেদের প্রভু বানাব না।

অন্যদের প্রভুত্ব ও দাসত্বের ধারণা বিলুপ্ত হবে, শোষক ও শোষিতের ধারণা বিলুপ্ত হবে; উঁচু-নীচুর ব্যবধান ঘুচবে। তবে এ সবের শর্ত হলো :

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّه وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ

তাই কোরআন আমাদের ধারণার পক্ষে এবং সব সময় এ স্লোগান দেয়।

নামাযে আল্লাহ্‌র প্রশংসার পর তাঁকে উদ্দেশ্য করে আমরা বলি, إِيَّكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّكَ نَسْتَعِيْنُ "আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য চাই।" যদিও একা নামায পড়ছি, তদুপরি বলছি, আমরা আপনারই ইবাদত করি ও আপনার নিকটই সাহায্য চাই। নামাযের শেষের দিকেও আমরা বলি, السَّلامُ عَلَيْنَا وَ عَلى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ "আমাদের এবং আপনার বান্দাদের সৎকর্মশীলদের উপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক।"

সা'দীর কবিতার অর্থের অপূর্ণতা

সা'দী বলেছেন,

"মানব জাতি পরস্পর যেন অঙ্গ
উৎপত্তির উৎস তাদের একই রত্ন
অনুভূত হয় যদি এক অঙ্গে ব্যথা
অন্য অঙ্গেও ছড়িয়ে পড়ে সে ব্যথা
যে তুমি অন্যের কষ্টে হও না ব্যথিত
তোমার নামে মনুষ্যত্ব হয়েছে কলঙ্কিত।"

সা'দীর এ কবিতাটি অত্যন্ত উঁচু মানের বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা নবী (সা.)-এর নিকট থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের অনুবাদ; অবশ্য অসম্পূর্ণ অনুবাদ। নবীর বাণীটি এরূপ :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادُدِ وَ تَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى بَعْضُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ أَعْضَاءِ جَسَدِهِ بِالْحُمَّى وَ السَّهَرِ

"মুমিনদের নমুনা বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে এক দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায়। যখন শরীরের কোন অঙ্গ ব্যথায় আক্রান্ত হয় তখন শরীরের অন্য অঙ্গও সে কষ্ট ও ব্যথায় বিনিদ্রতা ও উষ্ণতার মাধ্যমে সাড়া দিয়ে থাকে।"

আমাদের দেহের কোন অঙ্গে ব্যথা অনুভত হলে অন্য অঙ্গ কি চিন্তাহীন ও বিনিদ্র থাকতে পারে? অন্য অঙ্গ তার সমব্যথী না হয়ে বলে না যে, ঐ অঙ্গ যে কষ্ট করছে করুক। বরং সে তার সমব্যথী ও সহমর্মী হয়ে উঠে। নবী (সা.) বলছেন, দু'ভাবে এ সহমর্মিতা সে প্রকাশ করে : এক উত্তাপ, দুই নিদ্রাহীনতা। উদাহরণস্বরূপ যদি কারো ক্ষুদ্রান্তে ব্যথা অনুভূত হয় বা যকৃত জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হয়

তখন তার হাত, মাথা, হৃদয় কোন অঙ্গই নিদ্রা যায় না, তার শরীর বিশ্রাম নেয় না বরং উত্তাপের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে।

কিন্তু এখানে নবী বিশেষ একটি বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি যখন বলছেন মুমিনদের নমুনা এক দেহের মতো তখন তার আত্মার প্রতিও তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। কারণ দেহের জন্য আত্মা প্রয়োজন যা তাকে 'সে'তে পরিণত করার মাধ্যমে 'আমরা'র জন্ম দান করবে। যদি মৃত্যুর পর দেহকে টুকরো টুকরো করা হয় দেহ কোন ব্যথা অনুভব করে না। কারণ সেখানে আত্মার উপস্থিতি নেই যে, ব্যথা অনুভব করবে। এই আত্মাই সকল মুমিনকে এক সত্তায় পরিণত করে 'আমরা' করেছে যাদের একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা রয়েছে। সে আত্মাটি হলো ঈমান যেখানে كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ নির্দেশ দান করে 'আমি'কে 'সে'তে পরিণত করে প্রকৃতিগতভাবেই সহমর্মী করেছে। কিন্তু كَلِمَةٍ سَوَاءٍ বা একই কথায় বিশ্বাসী না হলে এটা সম্ভব নয়। নবী (সা.) বলেছেন, "মুমিনরা এক আত্মার অংশীদার" যাদের উপর উপরিউক্ত বাণী ক্রিয়াশীল। সা'দী ভুল করে বলেছেন, সকল মানুষ এক দেহের ন্যায়। যদি আদম সন্তানরা كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ বা একই মতে বিশ্বাসী না হয় তাহলে কখনই এক দেহে পরিণত হতে পারে না। 'মানব জাতি এক দেহের ন্যায়' কথাটি অসত্য। আমেরিকান ও ভিয়েতনামীরা এক মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত, নয় কি? যদি বলি, ভিয়েতনামীরা আদম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু আমেরিকানরা নয়, তবে যেরূপ ভুল করব সেরূপ যদি বলি, আমেরিকানরা মানুষ, ভিয়েতনামীরা নয়, তাও ভুল বলা হবে। যদিও তারা উভয়েই আদম সন্তান তদুপরি এক দেহ নয়। যখন মানব জাতির মধ্যে এক আত্মা এবং এক ঈমান ক্রিয়াশীর হবে তখন 'আমি' 'সে'তে পরিণত হবে এবং 'আমিত্ব' আর থাকবে না। তারা পরস্পর সহমর্মী হবে। আর তখনই বলা যাবে–

"যদি এক অঙ্গে হয় ব্যথা অনুভুত,
অন্য অঙ্গও হয় চিন্তায় মথিত।"

সুতরাং আমরা জানলাম, এ মতবাদে পূর্ণ মানব সম্পর্কে একটি ভুল হলো এতে একটি মূল্যবোধ ব্যতীত অন্য সকল মূল্যবোধ বিস্মৃত হয়েছে এবং একমাত্র মূল্যবোধ 'আমরা' হতে হবে বলে মনে করা হয়েছে। 'আমরা' হওয়ার বিষয়টি অবশ্যই ঠিক অর্থাৎ যদি কোন মানুষের 'আমি' 'আমরা'য় পরিণত না হয় তাহলে সে পূর্ণ মানব নয়। কিন্তু যদি কেউ মনে করে, শুধু মানুষের 'আমিত্ব' 'আমরা'য় পরিণত হয়ে গেলেই সে পূর্ণ মানবে পরিণত হবে, তবে তা নিতান্তই অসত্য। 'আমরা' হওয়া পূর্ণ মানব হওয়ার পথের অন্যতম গন্তব্যরেখা, কিন্তু একমাত্র গন্তব্যরেখা নয়।

তাঁদের দ্বিতীয় ভুলটি হচ্ছে তাঁরা মনে করেছেন, যে বস্তুটি 'আমি'কে 'আমরা'য় পরিণত করে তা হলো সামষ্টিক মালিকানা অর্থাৎ ব্যক্তি ও বিশেষ মালিকানাকে বিলুপ্ত করে সামষ্টিক মালিকানার রূপ দিলেই 'আমি' 'আমরা'য় পরিণত হয়ে যাবে এবং কেউ 'আমিত্ব' অনুভব করবে না।

উষ্ট্র ও শৃগালের গল্প

কয়েক বছর পূর্বে একটি ম্যাগাজিনে একটি গল্প পড়েছিলাম। গল্পটি এরূপ যে, একদিন এক উষ্ট্র ও শৃগাল পরস্পর বন্ধু হলো। শৃগাল উষ্ট্রকে বলল, "এসো আমরা পৃথক জীবন বাদ দিয়ে যৌথ ও সামষ্টিক জীবন শুরু করি। আমরা পরস্পর এক হয়ে একে অপরকে 'বন্ধু' বলে ডাকতে শুরু করি। আমি তোমাকে বলব, 'বন্ধু উষ্ট্র', আর তুমি আমাকে বলবে, 'বন্ধু শৃগাল'। এটা শুধু কথায় নয়, আমরা কাজেও পরিণত করব। আমার ও তোমার সব কিছুই আমরা এখন হতে 'আমাদের' বলব, এমনকি আমার বাচ্চা ও তোমার বাচ্চাকে বলব, 'আমাদের বাচ্চা'। এসো 'আমি'কে 'আমরা'য় পরিণত করি। তোমার পৃষ্ঠ ও আমার লেজ সবই আমাদের পৃষ্ঠ ও লেজে পরিণত হোক।" উষ্ট্র শৃগালের কথায় বিশ্বাস করে একটি যৌথ জীবন শুরু করল। এভাবে কিছুদিন চলার পর একদিন শৃগাল বাইরে কোন শিকার পেল না, সে প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে তাদের যৌথ ঘরে ফিরে এল। ক্ষুধায় যখন তার বৃহদান্ত্র ক্ষুদ্রান্ত্রকে হজম করে ফেলার উপক্রম করল ঠিক তখন তার চোখ পড়ল উষ্ট্রের বাচ্চার উপর। তৎক্ষণাৎ উষ্ট্রের বাচ্চাকে হত্যা করে ক্ষুধা নিবৃত্ত করল। এদিকে দিনের শেষে উষ্ট্র ঘরে ফিরে বাচ্চাকে না পেয়ে কাঁদতে শুরু করল ও বলল, "কে 'আমার' বাচ্চার এ অবস্থা করল?" শৃগাল বলল, "তুমি এখনও ঠিক হতে পারনি, এখনও বলছ, 'আমার বাচ্চা', বল, 'আমাদের বাচ্চা'।"

এভাবে 'আমি' 'আমরা'য় পরিণত করার চেষ্টা করা হলে উষ্ট্র আর শৃগালের দশাই হবে।

সুতরাং এ মতবাদ পূর্ণ মানব সম্পর্কিত অপূর্ণ মতবাদ। কারণ এ মতবাদে শুধু কয়েক'টি মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে, সেগুলোও আবার অসম্পূর্ণ।

অস্তিত্ববাদ বা ব্যক্তিসত্তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আজকের বৈঠকের শেষে অন্য একটি মতবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। মতবাদটি হচ্ছে অস্তিত্ববাদ।

এ মতবাদটি আজকাল খুবই প্রচার লাভ করেছে। এ মতবাদ মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পূর্ণ মানবের যে রূপরেখা দান করে তা সমাজতান্ত্রিক ধারণার ঠিক বিপরীত। সমাজতন্ত্রে সামাজিক বিষয়ের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, মানুষ তখনই পূর্ণ মানুষ হবে যখন সকল মানুষ সমান ও এক হয়ে যাবে। তাঁরা যে সামষ্টিক মালিকানার কথা বলেন তাও এ সামাজিকতার দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই।

আর অস্তিত্ববাদের মতবাদে যে মূল্যবোধগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে তা সমাজকেন্দ্রিক নয়, বরং ব্যক্তিকেন্দ্রিক। যেমন ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, সিদ্ধান্ত ও কর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ের উপর মূলত এজন্য নির্ভর করা হয়েছে। সে-ই পূর্ণ মানব যার সত্তা সকল বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত, সে অন্য কোন শক্তির অধীন হয় না, স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করে। অন্যভাবে বলা যায়, এ মতবাদের একমাত্র ভিত্তি হলো 'স্বাধীনতা'। যদিও এর সঙ্গে তাঁরা সচেতনতার কথাও বলেন, কিন্তু তা 'স্বাধীনতা'র প্রাথমিক শর্ত হিসেবে। তাঁরা বলেন, 'পূর্ণ মানব' হচ্ছে যে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। তাই যে মানুষ যত স্বাধীন সে তত বেশি পূর্ণ। যদি তার স্বাধীনতা অন্য কিছুর দ্বারা খর্ব হয়, তবে তার পূর্ণতা অপূর্ণতায় পরিণত হয়। এমনকি এ মতবাদ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস এবং আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়া মনুষ্যত্বকে খর্ব করে তাকে অপূর্ণ মানবে

পরিণত করে। কারণ এটা মানুষকে আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় আত্মসমর্পণে বাধ্য করে মানুষের স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে। তাই পূর্ণ মানব সে-ই যে সব কিছু হতে স্বাধীন, এমনকি ধর্ম হতেও সে স্বাধীন।

আমাদের কবি হাফেজ বলেছেন,

"সেই হিম্মতের অধিকারী স্বাধীন আমি
নীল আকাশের নীচে কারো রং ধারণ করি না যে আমি।"

অর্থাৎ এই নীল আকাশের নীচে যদি কাউকে পাওয়া যায়, যে কোন কিছুর অধীন নয়, সে-ই পূর্ণ মানব।

অন্যত্র তিনি বলেছেন,

"পূর্ণিমার চাঁদের রূপ দেখার মুগ্ধ আশায়
হয় যদি বিদূরিত দুঃখ সকল তার ভালোবাসায়
একটি গোপন কথা তোমাদের নিকট করছি প্রকাশ
আমি প্রেমের গোলাম, তাই পেয়েছি দু'বিশ্ব হতে মুক্তির সুবাস।"

অস্তিত্ববাদ বলে, 'আমি ভালোবাসার গোলাম' এটাও ভ্রান্ত। বরং বলা উচিত, 'আমি দু'বিশ্ব, প্রেম-ভালবাসা, এমনকি পূর্ণিমার চাঁদের প্রতি আসক্তি হতেও মুক্ত ও স্বাধীন।" মনুষ্যত্ব অর্থ স্বাধীনতা। স্বাধীনতা যা চায় তা হলো সব কিছুকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করা এবং কারো আনুগত্য না করা। পরবর্তী বৈঠকে ইনশাল্লাহ্‌ এ মতবাদ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إلا باللّٰه الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

১৩

অস্তিত্ববাদী মতবাদের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِتَّقُوْا اللهَ وَ لَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوْا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ وَ لا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوْا اللَّهَ فَأَنْسَيهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولائِكَ هُمْ الْفَاسِقُوْنَ (সূরা হাশর : ১৮ ও ১৯)

আমরা গত বৈঠকের শেষ পর্যায়ে অন্য একটি মতবাদ যাকে বর্তমান কালের সবচেয়ে নতুন মতবাদগুলোর একটি বলা যেতে পারে, সে দৃষ্টিতে পূর্ণ মানবের রূপ কিরূপ তার প্রতি ইশারা করেছি।

এ মতবাদটি স্বাধীনতাকে মানুষের পূর্ণতার মানদণ্ড অথবা মানুষের অস্তিত্বের প্রকৃত মূল্যবোধ বলে মনে করে। এ মতবাদের প্রবক্তাদের বিশ্বাস এ বিশ্বজগতে একমাত্র স্বাধীন অস্তিত্ব হলো মানুষ অর্থাৎ মানুষ কোন বাধ্যবাধকতার আওতাভূক্ত নয়, তাই তার উপর কিছুই চাপিয়ে দেয়া যায় না। পুরাতন দার্শনিকদের ভাষায়– সে এ সৃষ্টিজগতে একটি স্বাধীন অস্তিত্ব যে কারো বাধ্য ও পরাধীন নয়। তাঁদের কারো কারো মতে মানুষ ব্যতীত আর সকল কিছুই বাধ্য, তারা কার্যকারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু মানুষকে কোন বিধানই, এমনকি কার্যকারণ বিধানও বাধ্য করতে পারে না।

'অস্তিত্বই মূল'– অস্তিত্ববাদী মতবাদে এ ধারণার রূপ

এ মতবাদ অন্য একটি তত্ত্বে বিশ্বাস করে, আর তা হলো স্বাধীন এ মানুষ বিশেষ কোন প্রকৃতি নিয়ে সৃষ্ট হয়নি। বিশ্বজগতে অন্য সকল সৃষ্টি বিশেষ প্রকৃতি ও সত্তায় সৃষ্ট হয়েছে। যেমন পাথর পাথর হিসেবেই সৃষ্ট হয়েছে, সে পাথর ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না, যেমন সে মাটির ঢিলা হতে পারে না। বিড়াল বিড়ালের প্রকৃতি নিয়ে জন্মেছে, ঘোড়া ঘোড়ার প্রকৃতি নিয়ে জন্মেছে। কিন্তু মানুষ এরূপ বিশেষ কোন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে সৃষ্টি হয়নি। বরং সে নিজে যে প্রকৃতি ধারণ করবে সে প্রকৃতিই লাভ করবে। মানুষের স্বাধীনতার সীমা এটা যে, সে নিজের প্রকৃতি নিজেই তৈরি করবে। এ বিষয়টিকে তাঁরা 'অস্তিত্বই মূল' বা বস্তুসত্তার উপর অস্তিত্বের প্রাধান্য বলেছেন।

অস্তিত্ব মূল, বস্তুই মূল– এ পরিভাষাগুলো আমাদের দর্শনে বেশ পুরাতন। প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পূর্বে সাদরুল মুতাআল্লেহীনের সময় হতে এ আলোচনা চলে এসেছে। কিন্তু মুসলিম দার্শনিকরা 'অস্তিত্ব মূল' বা 'বস্তুসত্তা মূল' শুধু বিশেষ ক্ষেত্রেই বলেন না বরং তাঁরা সকল বস্তুর ক্ষেত্রেই এ আলোচনাটি করে থাকেন। তাঁদের দৃষ্টিতে অস্তিত্বই মূল বিষয়টি ভিন্ন একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মানুষ যে বিশেষ কোন প্রকৃতির অধিকারী নয় বলে অন্যান্য অস্তিত্ববান প্রাণী ও বস্তু হতে ভিন্ন এবং নিজেই নিজের প্রকৃতির নির্ধারক– ইসলামী দর্শনে এ বিষয়টি আরো জোরালো যুক্তিতে উপস্থাপিত হয়েছে,

অবশ্য ভিন্নভাবে ও ভিন্ন পরিভাষায়। বিশেষত সাদরুল মুতাআল্লেহীনের দর্শনে বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

অস্তিত্ববাদীরা ভিন্নভাবে বিষয়টি প্রমাণ করলেও এ কথাটি সত্য ও সঠিক যে, মানুষের নির্দিষ্ট কোন প্রকৃতি নেই, বরং সে প্রকৃতি অর্জন করে নিজ প্রচেষ্টায়।

আমাদের ধর্মে পূর্ববর্তী জাতিতে রূপান্তর, বর্তমান সময়ের মানুষের চারিত্রিক দিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এবং কিয়ামতে মানুষের পুনরুত্থানের আলোচনায় বলেছে, সে দিন মানুষ বিভিন্নরূপে পুনরুত্থিত হবে। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই মানুষরূপে পুনরুত্থিত হবে এবং অধিকাংশই বিভিন্ন পশুর আকৃতিতে পুনরুত্থিত হবে। এ বিষয়গুলো এ কথাকে সত্য বলে প্রমাণ করে। যদিও সকল মানুষ ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করেছে অর্থাৎ মানুষ হওয়ার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে, তদুপরি তার জীবনের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে সে অমানুষে পরিণত হতে পারে। এটা বাস্তব। (এ বিষয়টি নবীনরা অন্যভাবে অনুধাবন করেছে যদিও তা অনেক প্রাচীন। আমি এ বিষয়ে এখানে বেশি আলোচনা করতে চাচ্ছি না।)

যা হোক মানুষ যে স্বাধীন ও দায়িত্বসম্পন্ন প্রাণী হিসেবে সৃষ্ট– এ মতবাদের এ কথাটি ঠিক। আপনারা জানেন, মুসলমানদের মধ্যে দু'দল ভিন্নমুখী দু'টি বিশ্বাসের অধিকারী ছিল। আশাআরীরা জাবর বা বাধ্যতায় এবং মু'তাযিলারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করত। শিয়া এ দু'য়ের মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী। তারা আশাআরীদের মতো সম্পূর্ণ বাধ্যতায় বা মু'তাযিলাদের ন্যায় পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয়। অস্তিত্ববাদীরা যা বলে তা মূলত মুতাযিলাদের সম্পূর্ণরূপে দায়িত্ব হস্তান্তর বা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের ধারণারই রূপ। ইসলামের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, তবে অবশ্যই স্বাধীনতা রয়েছে, যেমনটি ইমামদের হতে বর্ণিত হয়েছে– لا جَبْرَ وَ لا تَفْوِيْضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن অর্থাৎ বাধ্যতাও নয়, পূর্ণ স্বাধীনতাও নয়, বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি। বর্তমানে বস্তুবাদীরা মূলত বাধ্যতায় বিশ্বাস করে অস্তিত্ববাদীদের পূর্ণ স্বাধীনতার বিশ্বাসের বিপরীতে। কিন্তু ইসলাম মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী। মানুষের সে পর্যন্ত স্বাধীনতা রয়েছে যাতে সে বাধ্যতায় পতিত না হয়, কিন্তু এর অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। মানুষ অন্যান্য প্রাণীর বিপরীতে বিশেষ প্রকৃতির অধিকারী নয় বরং তার প্রকৃতি পরিবর্তনশীল বিধায় বিশেষ প্রকৃতি সে অর্জন করতে পারে– এ কথাটি খুবই সত্য।

মানুষের নির্ভরতা ও বিভিন্ন সত্তার সঙ্গে সংযুক্ততার ফল

এ মতবাদ মানুষের স্বাধীনতার বিষয়ে অন্য একটি তত্ত্বেও বিশ্বাসী। সেটা হচ্ছে নির্ভরতা ও সংযুক্ততার ফল। তাঁরা প্রথমে স্বাধীনতাকে দার্শনিক যুক্তিতে উপস্থাপন করে বলেন, মানুষ স্বাধীনরূপে সৃষ্ট হয়েছে, এমনকি সে নিজের প্রকৃতি নিজেই গঠন করতে পারে। অতঃপর তাঁরা বলেন, যা কিছু মানুষের স্বাধীনতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও এর বিরোধী তা মানুষকে মনুষ্যত্ব হতে দূরে নিক্ষেপ করে ও মানবতার সঙ্গে অপরিচিত করে তোলে।

মানুষ সত্তাগতভাবেই স্বাধীন হিসেবে সৃষ্ট হয়েছে। কোন কোন সময় কিছু প্রভাবক, যেমন কোন কিছুর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করে। এ মতবাদের মতে মানুষ যদি কোন কিছুর

সাথে সম্পর্কিত হওয়ার মাধ্যমে তার কাছে দায়বদ্ধ বা তার দাস ও অনুগত হয়ে পড়ে, তবে সে মনুষ্যত্বের সীমা হতে বেড়িয়ে পড়ে। কারণ সে তার স্বাধীনতাকে হারিয়েছে। যেহেতু মানুষ মুক্ত-স্বাধীন এক অস্তিত্ব সেহেতু যে কোন কিছুর অধীন হওয়ার অর্থ স্বাধীনতা বর্জিত হওয়া।

মানুষ কোন কিছুর সংশ্লিষ্টতা বা অধীনতাকে মেনে নিলে কয়েকটি বিষয় উদ্ভূত হয়। প্রথমত মানুষ যখন কোন বস্তুর, যেমন অর্থের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে তখন অর্থ তার জীবনে প্রথম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে তার নিজ সত্তা হতে অসচেতন করে তোলে। বস্তু সংশ্লিষ্টতা মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে। বস্তু আসক্তি মানুষকে তার সত্তা সম্পর্কে অসচেতন করে ফেলে। তাই সে নিজ সম্পর্কে চিন্তা করে না, বরং ঐ বস্তুর চিন্তায় নিমগ্ন হয়, সে আত্মসচেতন সত্তা হতে আত্মবিস্মৃত ও অসেচতন সত্তায় পরিণত হয় এবং এটা মনুষ্যত্বের স্খলন। মানুষ তৎসংশ্লিষ্ট বস্তু সম্পর্কে নিখুঁত তথ্য প্রদানে সক্ষম হলেও নিজের সম্পর্কে অসচেতনতার কারণে আপনসত্তা সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদানে অক্ষম।

দ্বিতীয়ত এ সংশ্লিষ্টতা মানুষকে মানবীয় মূল্যবোধ হতে দূরে নিক্ষেপ করে এবং সে ঐ সংশ্লিষ্ট বস্তু বা বিষয়ের মূল্য সংরক্ষণে নিয়োজিত হয়। অর্থলোলুপ কোন ব্যক্তির নিকট মানবীয় মূল্যবোধসমূহের কোন গুরুত্ব নেই এবং প্রকৃতপক্ষে তার নিকট তার নিজেরই কোন মূল্য নেই। আত্মসম্মান ও মর্যাদা তার চিন্তায় কোন ভূমিকা রাখে না। মুক্তি ও স্বাধীনতার ধারণা তার মনে কোন রেখাপাত করে না, তার চিন্তায় একমাত্র উপাস্য বস্তু ঐ অর্থ। অর্থাৎ অর্থের মূল্য তার নিকট গুরুত্ব পেলেও নিজস্ব মূল্যবোধগুলো তার নিকট গুরুত্ব রাখে না। এ মূল্যবোধগুলো তার নিকট মৃত এবং ঐ বস্তুর মূল্য তার নিকট জীবন্ত হয়ে উঠে।

তৃতীয়ত বস্তু সংশ্লিষ্টতা মানুষকে ঐ বস্তুর দাসে পরিণত করে তার হাতে বন্দি করে ফেলে। ঐ বস্তুর সাথে যেহেতু সে আবদ্ধ সেহেতু তার উন্নয়নের পথ বাঁধাগ্রস্ত। যেমন কোন প্রাণী একটি খুঁটি বা বৃক্ষের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধা থাকলে তার স্থানান্তরের পরিধি সীমিত হয়ে পড়ে বা একটি মোটরগাড়ি শৃঙ্খলাবদ্ধ হলে তার গতি ব্যাহত হয় তেমনি বস্তু সংশ্লিষ্টতা মানুষের পূর্ণতার পথের গতিকে রুদ্ধ করে দেয়, তার 'গতি'কে 'স্থিতি'তে পরিণত করে। দার্শনিক পরিভাষায় তার 'সাইরুরাত' 'লা সাইরুরাত' এ কখনো কখনো 'কাইলুনাত' বা স্থবিরতায় পর্যবসিত হয়।

এ মতবাদ অনুসারে 'আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের ধারণা'

সুতরাং আমরা জানলাম, এ মতবাদের দৃষ্টিতে মানবের প্রকৃত সত্তা হলো তার স্বাধীনতাবোধ। অন্যভাবে বললে, সকল মানবীয় মূল্যবোধের মাতা ও প্রাণ হলো স্বাধীনতা। মানুষ যদি তার মনুষ্যত্বকে সংরক্ষণ করতে চায়, তবে অবশ্যই তাকে তার স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করতে হবে। আর স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য তাকে 'পূর্ণিমার চাঁদের' রূপে মুগ্ধ হওয়া বা প্রেমের দাসে পরিণত হওয়া চলবে না।

"এ বিশ্ব-পুষ্পোদ্যানে একটি ফুলই যথেষ্ট আমার জন্য
ঐ ঘাসে ঘেরা দেবদারুর একটু ছায়াই আমার কাম্য
হে খোদা! তোমার গৃহ হতে আমায় পাঠিয়ো না বেহেশতে

তোমার গৃহে আশ্রয় লাভ অধিক আকাঙ্ক্ষার এ বিশ্ব হতে।”

এ মতবাদের দৃষ্টিতে মানুষকে পূর্ণ ও নিরঙ্কুশ মুক্ত ও স্বাধীন হতে হবে। এ ক্ষেত্রে এ মতবাদ সম্পূর্ণরূপে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিপরীতে অবস্থান করছে যদিও তারা উভয়েই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। অস্তিত্ববাদীদের মতে দু'টি কারণে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস তাদের চিন্তার পরিপন্থী; প্রথমত আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করলে আমাদের ভাগ্যে (قَضَا وَ قَدَر) বিশ্বাস করতে হবে। আর ভাগ্যে বিশ্বাস অর্থ মানুষের স্থির প্রকৃতি বা বাধ্যবাধকতায় (جَبْر) বিশ্বাস। যদি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব থাকে, তবে মানুষকে ঐ আল্লাহ্‌র জ্ঞানে বিশেষ প্রকৃতির অধিকারী হতে হবে অর্থাৎ সে আর অনির্দিষ্ট প্রকৃতির থাকছে না আবার আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের কারণে মানুষের উপর ভাগ্যের বাধ্যবাধকতা চলে আসে এবং তার কোন স্বাধীনতা থাকে না। সুতরাং আমরা যখন স্বাধীনতাকে গ্রহণ করেছি তখন আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে গ্রহণ করতে পারি না।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস শুধু আমাদের স্বাধীনতা হরণ করে না, বরং তাঁর প্রতি বিশ্বাস অর্থ একই সাথে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া এবং যে কোন রকম সংশ্লিষ্টতা বা সংযুক্তিই স্বাধীনতা বিরোধী। বিশেষত আল্লাহ্ সংশ্লিষ্টতা অন্য সকল সংযুক্তি হতে উচ্চ পর্যায়ের সংশ্লিষ্টতা। কবির ভাষায়–

“আমি তোমার সঙ্গে আবদ্ধ তাই সব আবদ্ধতা হতে মুক্ত
আমি তোমার চুক্তিতে আবদ্ধ তাই তা ভঙ্গের আশংকামুক্ত।”

যদি কেউ আল্লাহ্‌র সঙ্গে আবদ্ধ হয়, তবে তা কখনই বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। তাই এ মতবাদ এ আবদ্ধতাকে অস্বীকার করে।

এ মতবাদ সম্পর্কে দু'টি দৃষ্টিকোণ হতে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত এ মতবাদের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্বাধীনতা পরিপন্থী যা একটি ভ্রান্ত ধারণা। আমার 'বস্তুবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ার কারণসমূহ' এবং 'মানুষ ও তার ভাগ্য' নামক গ্রন্থ দু'টিতে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেছি যে, বিষয়টি এরূপ নয়, যা তাঁরা ধারণা করেন। 'কাযা ও কাদর' বা ভাগ্য সম্পর্কে তাঁদের ধারণা বৃদ্ধা মহিলাদের ধারণার মতো। এঁরা কাযা ও কাদর বোঝেননি। নতুবা ইসলামী দৃষ্টিকোণে কাযা ও কাদরের বিষয়টি এমনরূপে রয়েছে যা মানুষের স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়। যা হোক এটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। বরং এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় দ্বিতীয় দিকটি নিয়ে যেখানে তাঁরা বলছেন, যে কোন বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা স্বাধীনতা বিরোধী, এমনকি যদি সে সংশ্লিষ্টতা আল্লাহ্‌র সঙ্গেও হয়। এখানে এ বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা করব।

পূর্ণতা হলো 'নিজ' হতে 'নিজ'-এর দিকে যাত্রা

আপনারা এমন কোন অস্তিত্বের কথা চিন্তা করুন যা পূর্ণতার পথ অতিক্রম করছে। একটি ফুল গাছ ভূমি হতে অঙ্কুরিত হয়ে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে তবেই পূর্ণতায় পৌঁছায়। একটি প্রাণীর জননকোষ উৎপত্তি হতে পূর্ণতায় পৌঁছা পর্যন্ত অর্থাৎ দুর্বল একটি অস্তিত্ব হতে পূর্ণ ও সবল অস্তিত্বে পরিণত হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করে। এ বৃক্ষ বা প্রাণী কোন্ অবস্থা হতে কোন্ অবস্থার

দিকে যাত্রা করে? সে কি 'নিজ' হতে 'অপর'-এর দিকে যাত্রা করে? অর্থাৎ সে কি 'নিজ' হতে 'আগন্তুক'-এ পরিণত হয়, নাকি 'অন্য' হতে 'অন্য'-তে পরিণত হয় নাকি তার এ যাত্রা 'নিজ' হতে 'নিজ'-এর দিকে যাত্রা?

যদি বলি, সে 'নিজ' হতে 'আগন্তুক'-এ পরিণত হচ্ছে, তবে বলতে হবে যতক্ষণ সে পরিবৃদ্ধি অর্জন করেনি ততক্ষণ তার স্বসত্তা বহাল ছিল। যখন পরিবৃদ্ধি অর্জন শুরু করল তখনই স্বসত্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। পূর্ববর্তী দার্শনিকদের অনেকেই বলেছেন, পরিবর্তন ভিন্নসত্তার জন্ম দেয় অর্থাৎ 'পরিবর্তন' 'ভিন্নসত্তা'য় রূপান্তরের শামিল যদিও কথাটি সত্য নয়।

বরং সত্য হলো একটি ফুল গাছের বীজ বা মানুষের 'জননকোষ' প্রথম মুহূর্ত হতে যাত্রা করে পূর্ণতায় পৌঁছা পর্যন্ত যে ধাপগুলো অতিক্রম করে তার সবই 'নিজ' হতে 'নিজ'-এর দিকেই যাত্রা অর্থাৎ সেই সত্তারই পরিবর্ধিত রূপ সে লাভ করে। একই সত্তা তার প্রথম, মধ্যবর্তী ও শেষ পর্যায়ে বিদ্যমান রয়েছে। যতই সে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয় ততই সে স্বকীয় মূল সত্তা লাভ করে। সে অপূর্ণ স্বসত্তা হতে পূর্ণ স্বসত্তার দিকে যাত্রা করে। এই বৃক্ষটি আত্মসচেতনতা ব্যতিরেকেই তার পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। যদি বৃক্ষটি আত্মবোধসম্পন্ন হতো, তবে নিশ্চয়ই তার মধ্যে পূর্ণতার প্রতি আকর্ষণ থাকত। সকল সৃষ্টিই সহজাতভাবে পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষী। বৃক্ষও তার পূর্ণতার প্রতি আসক্ত, এমনকি কারো কারো মতে প্রাণহীন বস্তুসমূহও পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষী। সকলেই তার নিজস্ব চূড়ান্ত পূর্ণতার প্রত্যাশী।

সুতরাং কোন বস্তুর নিজ পূর্ণতার প্রতি সংলগ্নতা ও সম্পর্ক সারটারের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে ভিন্ন সত্তায় পরিণত হওয়া নয় বরং স্বকীয় সত্তার বিকাশ ও পূর্ণতা যা তাকে অধিক নিজ সত্তার দিকে পরিচালিত করে। যদি মানুষের স্বাধীনতা এমন হয় যে, সে নিজ চূড়ান্ত লক্ষ্য ও পূর্ণতা হতেও স্বাধীন হতে চায়, তবে এ স্বাধীনতাই তাকে নিজের নিকট আগন্তুক করে তোলে ও ভিন্ন সত্তায় পরিণত করে এবং এ ধরনের স্বাধীনতা মানুষের পূর্ণতার পরিপন্থী। স্বাধীনতার অর্থ যদি এতটা ব্যাপক হয় যে, মানুষের পূর্ণতা হতেও স্বাধীন হওয়া বুঝায়, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে মানুষের অপূর্ণ সত্তা তার পূর্ণ সত্তা হতেও পূর্ণতর। তাই আমাদের দেখতে হবে এ স্বাধীনতা আমাদের আপন সত্তা হতে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে নাকি এ বস্তু সংশ্লিষ্টতা?

এ মতবাদে ভিন্ন সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ও আপন সত্তার পূর্ণতর রূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। আমরাও এটা বিশ্বাস করি যে, ভিন্ন সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা মানুষের সত্তার পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটায়। আমরা যদি দেখি কেন সকল ধর্মই মানুষকে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হতে নিষেধ করেছে? এ কারণে যে, বস্তুবাদিতা ও দুনিয়াপ্রেম ভিন্ন সত্তার প্রতিই প্রেম যা তার মানবীয় মূল্যবোধের ধ্বংস সাধন করে। কিন্তু যে বিষয়টি মানুষের পূর্ণতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা কোন অপরিচিত ও ভিন্ন সত্তা নয়, বরং তা তার স্বকীয় সত্তা এবং স্বসত্তার প্রতিই আসক্তি। এ সংশ্লিষ্টতা মানুষকে আত্মবিস্মৃত ও অসচেতন করে না। স্বসত্তাপ্রীতি স্থবিরতা নয়, গতি স্থিতিতে পরিণত হওয়াও নয় যে, বলা যাবে সে আপন মূল্যবোধকে হারিয়েছে, বরং এটা তার পূর্ণতার প্রতি আসক্তি ও সংশ্লিষ্টতা যা তাকে গতি দান করে ও চূড়ান্ত পূর্ণতার দিকে পরিচালিত করে।

স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ মতবাদের ভুল ধারণা

সারটারকে বলতে চাই, দু'ভাবে আমরা বলতে পারি স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি হতে ভিন্ন নয়। প্রথমত আল্লাহ্‌র সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ভিন্ন সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা নয় যে, এ সম্পর্ক তার সত্তাকে ভুলিয়ে দেবে। কারণ যে কোন বস্তুর স্রষ্টা যা কর্তৃকারণ বা উৎপত্তি দানকারী কর্তা তা ঐ বস্তুসত্তা হতেও ঐ বস্তুর নিকটবর্তী। ঐ বস্তুর সত্তাটি অস্তিত্বগতভাবেই তার স্রষ্টার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং তার অস্তিত্বে টিকে থাকাও তদ্রূপ। ইসলামী দর্শন অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বিষয়টি প্রমাণ করেছে।

কোরআন বলছে, نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ "আমরা তোমাদের হতেও তার নিকটবর্তী।" (সূরা ওয়াকেয়াহ্ : ৮৫) তোমাদের নিজ হতে তোমাদের সত্তা সম্পর্কে আমরা অধিক অবগতই শুধু নই, বরং আমাদের সত্তা তোমাদের সত্তা হতে তোমাদের অধিক নিকটবর্তী। কোরআনের এ কথাটি খুবই অর্থবহ ও আশ্চর্যজনক। সকলেই বলে, আমিই আমার সত্তার সর্বাধিক নিকট, কিন্তু কোরআন বলছে, আল্লাহ্ সকল বস্তুর সত্তা হতে ঐ বস্তুর অধিক নিকটে। সুতরাং আল্লাহ্ সকল বস্তুসত্তা হতে ঐ বস্তুর জন্য অধিকতর আপন সত্তাসংশ্লিষ্ট। অবশ্য এ বিষয়টি বুঝা বেশ কঠিন ও উচ্চতর দার্শনিক প্রাজ্ঞজনোচিত। (ইসলাম যে কথা বলেছে মানবিক জ্ঞান সে স্থানে আরো সহস্র বছরেও পৌঁছতে পারবে না।)

হযরত আলী (আ.) বলেছেন,

دَاخِلٌ فِيْ الأَشْيَاءِ لا بِالْمُمَازَجَةِ, خَارِجٌ عَنِ الأَشْيَاءِ لا بِالْمُبَايَنَةِ

"আল্লাহ্ ঐ বস্তুসত্তার বাইরে নন এবং তা হতে পৃথক নন, তবে ঐ বস্তুসত্তার অভ্যন্তরেও তাঁর অবস্থান নয় যে, বলা যাবে তার সঙ্গে মিশ্রিত" لَيْسَ فِيْ الأَشْيَاءِ بِوَالِجٍ وَ مَا مِنْهَا بِخَارِجٍ (নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ১৮৪)

দ্বিতীয়ত কোরআন যে বলছে মানুষকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখতে হবে এর কারণ সে আল্লাহ্‌কে মানুষের পূর্ণতার সর্বশেষ গন্তব্য বলে জানে এবং তার যাত্রা আল্লাহ্‌র দিকেই বলে মনে করে। সুতরাং আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ ও আকর্ষণ মূলত তার আপন সত্তার পূর্ণতার দিকেই মনোযোগ ও আকর্ষণ। একটি বীজের পূর্ণ বৃক্ষ হওয়ার আসক্তি যেরূপ এটাও সেরূপ। আল্লাহ্‌র দিকে মানুষের যাত্রা তার নিজ সত্তার দিকেই যাত্রা এবং অপূর্ণ আপন সত্তা হতে পূর্ণ আপন সত্তার দিকেই পদক্ষেপ।

তাই যারা আল্লাহ্‌কে অন্য বস্তুর সঙ্গে তুলনা করেছে তারা ভুল করে ভেবেছে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি আকর্ষণ নিজ মূল্যবোধকে বিস্মৃত হওয়া ও স্থবিরতার শামিল।

'আত্মসচেতনতা' ও 'খোদা সচেতনতা'

আল্লাহ্ মানুষের এত নিকটবর্তী যে, মানুষের 'আল্লাহ্ সচেতনতা' ও 'আত্মসচেতনতা' একই বস্তু। যখন মানুষ আত্মসচেতন হবে তখন সে খোদা সচেতন না হয়ে পারে না। এটা অসম্ভব যে, মানুষ আত্মসচেতন হবে, অথচ খোদা সচেতন হবে না। কোরআন বলছে,

وَ لا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوْا اللَّهَ فَأَنْسَيهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولائِكَ هُمْ الْفَاسِقُوْنَ

"তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছে আর তাই আল্লাহ্‌ তাদের আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন, তারাই অবাধ্য।"

যে কেউ আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে সে কার্যত নিজেকেই ভুলে গেছে। মানুষ তখনই নিজেকে ফিরে পাবে যখন তার স্রষ্টাকে ফিরে পাবে। যদি মানুষ তার স্রষ্টাকে ভুলে যায় তাহলে সে তার সত্তাকেই ভুলে যায়। তাই কোরআন অস্তিত্ববাদীদের বিপরীত কথা বলে। তারা বলে, যদি মানুষ খোদা সচেতন হয় তবে সে আত্মবিস্মৃত হয়। আর কোরআন বলে, মানুষ তখনই আত্মসচেতন হতে পারে যখন সে খোদা সচেতন হয়। এটা মানবিকতার সর্বোচ্চ মর্যাদার যথার্থ ব্যাখ্যা যা কোরআন আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণনা করেছে।

কোরআন বলছে, মানুষ কখনো কখনো নিজেকেই হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ তার সত্তাই পরাজিত হয়। সে বলছে, সবচেয়ে বড় পরাজয় এটা নয় যে, মানুষ অর্থ বা সম্পদ হারায়, এমনকি যে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা হারিয়ে অন্যের দাসে পরিণত হয় বা তার নীতি ও পবিত্রতা বিসর্জন দেয় তার পরাজয়ও বড় পরাজয় নয়, বরং বড় পরাজয় হলো মানুষের তার সত্তাকে হারানো। যখন মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে তখন সে সব কিছুকেই হারিয়েছে। আর যখন সে নিজেকে খুঁজে পায় তখন সে সব কিছুকেই অর্জন করে।

ইবাদতের দর্শন কি? ইবাদতের দর্শন হচ্ছে মানুষ আল্লাহকে অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে অর্জন করবে। এ দর্শন আত্মসত্তা অর্জন ও প্রকৃত আত্মসচেতনতা লাভের দর্শন যে অর্থ কোরআন বর্ণনা করেছে এবং ইসলামী মতাদর্শের অনুসারী ব্যতীত অন্য কেউ তা অর্জনে সক্ষম হয়নি। কখনো একজন মহিউদ্দিন আরাবীর জন্ম হয় এবং তিনি মানুষের আত্মসচেতনতার বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রদান করেন। পরবর্তীতে তাঁর ছাত্রদের মধ্য থেকে মাওলানা রুমীর মতো ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা কোরআন অবতীর্ণের ছয়শ' বছর পর কোরআন হতে এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম হন। যদিও তাঁরা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার ছয়শ' বছর পর এসেছেন, কিন্তু বর্তমান দার্শনিকদের হতে সাতশ' বছর পূর্বে এ ব্যাখ্যা প্রদানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। মাওলানা রুমী মানুষের আত্মসচেতনতা যে খোদা সচেতনতা হতে ভিন্ন নয় তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

"আত্মসচেতনতা তাই প্রাণের দাবি জেনো হে পথিক
সেই প্রাণ শক্তিশালী যার আত্মসচেতনতা ততোধিক।"

মাওলানা রুমী প্রাণকে আত্মসচেতনতার সমার্থক বলে উল্লেখ করে বলছেন, যে যত আত্মসচেতন সে তত শক্তিশালী। মানুষের প্রাণ অন্যান্য প্রাণী হতে শক্তিশালী। কারণ তার আত্মসচেনতা তাদের হতে অধিক। অতঃপর তিনি আরো গভীরে প্রবেশ করে বলেছেন, মানুষ তখনই আত্মসচেতন হতে পারে যখন সে খোদা সচেতন হয়।

সুতরাং যাঁরা মনে করছেন, যে কোন বস্তুসংশ্লিষ্টতা স্বাধীনতা পরিপন্থী তাঁদের বলছি, হ্যাঁ, যে কোন বস্তু সংশ্লিষ্টতা স্বাধীনতার অন্তরায় একমাত্র খোদা সংশ্লিষ্টতা ব্যতীত। কারণ খোদা সংশ্লিষ্টতা আত্মসংশ্লিষ্টতার পূর্ণতর রূপ। আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। সুতরাং খোদা

সচেতনতা অপরিহার্যরূপে আত্মসচেতনতার সর্বোচ্চ পর্যায়। মানুষ তার একাকিত্ব ও ইবাদতে যত বেশি আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগী হবে ও তাঁকে স্মরণ করবে তত বেশি সে নিজেকে চিনতে পারবে।

অনেক মহৎ ব্যক্তিবর্গ এ পথেই আধ্যাত্মিক আত্মসচেতনতার উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একজন মহান ব্যক্তি যিনি একজন বড় মুজতাহিদ ও নাজাফ হতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং একজন শরীয়ত বিশারদ আরেফও ছিলেন তিনি হলেন মির্জা জাওয়াদ মেলকি তাবরীজী। তিনি মরহুম হোসেইন কুলি হামেদানির ছাত্র। তিনি কোমের অধিবাসী ও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোতে যেখানে তিনি নিজ আত্মসচেতনতার বিবরণ দিয়েছেন সেখানে আধ্যাত্মিক আত্মসচেতনার আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, মানুষ নিজ সত্তাকে অনুধাবন করতে পারে এবং তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, তিনি এমন ব্যক্তিকে চেনেন যিনি স্বপ্নে আত্মসচেতনতাকে অনুধাবন করে জাগরিত হওয়ার পরও আত্ম অভ্যন্তরে তার রেশ অব্যাহতভাবে অনুভব করেন (তিনি নিজেই সে ব্যক্তি, অথচ বলেননি)। এই আত্মসচেতনতা প্রকৃত অর্থে খোদা সচেতনতার একটি শাখা এবং এটা প্রকৃত ইবাদত ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। একজন মনোবিজ্ঞানী সহস্র বছর মনো-গবেষণা চালিয়েও এ প্রকৃত আত্মসচেতনতায় পৌঁছতে পারে না।

হযরত আলীর একটি বাণী অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। তিনি বলেছেন,

عَجِبْتُ لِمَنْ يَنْشُدُ ضَالَّتَهُ وَ قَدْ أَضَلَّ نَفْسَهُ فَلا يَطْلُبُهَا

"আমি ঐ ব্যক্তি হতে আশ্চর্য বোধ করি যে কোন সম্পদ হারিয়ে ফেললে তা পাওয়ার জন্য সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকে, অথচ নিজ সত্তাকে হারিয়ে ফেললেও তার সন্ধান করে না।"

কেন সে নিজেকে খোঁজে না? হে মানব! তুমি জান না তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছ। যাও নিজেকে সন্ধান কর। কারণ তোমার সত্তা হারিয়ে যাওয়া সকল বস্তু হতে অধিক মূল্যবান।

কয়েকটি সমস্যার জবাব

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান মানবীয় মূল্যবোধের বিস্মৃতির কারণ– এ কথার জবাবে বলতে চাই, ভিন্ন সত্তার মাঝে হারিয়ে যাওয়া মানুষের প্রকৃত মূল্যবোধগুলোকে ভুলে যাওয়ার কারণ, এটা ঠিক। কিন্তু যা আপন সত্তারই পূর্ণতম রূপ তা মানুষের মাঝে মানবীয় মূল্যবোধের অধিকতর বিকাশের সহায়ক উপাদান। এ কারণেই যে সকল ব্যক্তি ইবাদতের পথে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেন, তাঁদের মাঝে সকল মানবীয় মূল্যবোধ শক্তিশালী হয়ে উঠে। তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি আরো ধারালো, তাঁদের ভালোবাসা গভীরতর, মানসিক শক্তি আরো উন্নত, আত্মসম্মানবোধ আরো তীক্ষ্ণ এবং তাঁদের মানুষের মাঝে বসবাসের ক্ষমতা অধিকতর হয়। কারণ এ সকল বিষয় পরম সত্তা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গুণেরই প্রকাশ।

খোদা সম্পৃক্ততা মানবীয় বিকাশের প্রতিবন্ধক– এ কথার জবাবে বলব, তাঁরা মনে করেছেন, আল্লাহ্ একটি বৃক্ষের মতো, তাই যদি আল্লাহ্‌র সাথে কেউ সম্পৃক্ত হয় সে কোন সসীম বস্তুর দ্বারা সীমিত হয়ে পড়েছে ফলে তার গতিসীমা রুদ্ধ হয়েছে। অস্তিত্ববাদীদের বলব, আল্লাহ্ হচ্ছেন অপরিসীম প্রকৃত সত্তা। কখনো মানুষ একটি সীমিত ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ একশ বর্গকিলোমিটারে

বন্দি হয়ে রয়েছে– এটা মানুষের জন্য সীমাবদ্ধতা। কারণ সে বলতে পারে, আমি যে সীমাকে অতিক্রম করেছি তার শেষে সীমার প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কিন্তু যদি মানুষকে কোন সীমাহীন ক্ষেত্রে বন্দি করা হয়, তবে তাকে পরিসীমিত করা হয়নি, কারণ সীমাহীন ক্ষেত্র গতিরুদ্ধ নয়। অর্থাৎ হে মানব! তুমি যদি অসীমের দিকে যাত্রা কর, তবেই পূর্ণতায় পৌঁছবে। আল্লাহ্ এক অপরিসীম সত্তা। তাই পূর্ণতম মানুষ যিনি শেষ নবী (সা.) তিনিও যদি অনন্তকাল অগ্রসর হতে থাকেন তাঁর যাত্রা শেষ হবে না। আল্লাহ্ এমন এক অস্তিত্ব যাঁর শেষ সীমা নেই। তাই মানুষের পূর্ণতার ক্ষেত্রে একমাত্র অসীম যাত্রা পথ হলো তাঁর দিকে যাত্রা।

আলেমদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে যে, আমরা যে নবীর উপর দরুদ ও সালাওয়াত পড়ি– এর অর্থ কি এবং আল্লাহ্র নিকট নবীর জন্য রহমত ও কল্যাণ কামনার কি প্রভাব রয়েছে? কেউ কেউ বলেন, প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ মানব নবীর জন্য রহমতের প্রার্থনা এ জন্য যে, নবী প্রতি মুহূর্তে গমনাবস্থায় রয়েছেন। অনন্তকাল তিনি এক অসীম লক্ষ্যের দিকে গতিশীল রয়েছেন। সুতরাং পরম প্রভুর সঙ্গে সম্পৃক্ততা মানুষের গতি স্থবিরতায় পর্যবসিত হওয়া নয়।

লক্ষ্যের পূর্ণতা ও মাধ্যমের পূর্ণতা

অস্তিত্ববাদীরা লক্ষ্য এবং মাধ্যমের মধ্যে একটি ভুল করেছেন। স্বাধীনতা মানুষের জন্য একটি পূর্ণতা। কিন্তু স্বাধীনতা মাধ্যমগত পূর্ণতা, লক্ষগত পূর্ণতা নয়। মানুষের লক্ষ্য স্বাধীন হওয়া নয়, কিন্তু তাকে স্বাধীন হতে হবে এজন্য যে, যাতে সে পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে। যেহেতু স্বাধীনতা অর্থ পথ নির্বাচনের অধিকার এবং অস্তিত্বশীল প্রাণীদের মধ্যে মানুষ একমাত্র স্বাধীন অস্তিত্ব, বিধায় তাকে নিজের পথ নিজেই নির্বাচন করতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষকে নিজ হতেই নিজেকে খুঁজতে হবে।

মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন, কিন্তু মানুষ স্বাধীন বলেই পূর্ণতায় পৌঁছেছে নাকি পূর্ণতার পথকে নির্বাচনের অধিকার লাভ করেছে এজন্য যে, যাতে পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে। মানুষ স্বাধীনতার মাধ্যমে পূর্ণতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে আবার এর মাধ্যমে সর্বনিম্ন পর্যায়েও নেমে যেতে পারে।

স্বাধীন অস্তিত্ব সেই অস্তিত্ব যার নিয়ন্ত্রণ-রজ্জু তার হাতে দেয়া হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে, হে মানব! তুমি পূর্ণতাপ্রাপ্ত অস্তিত্ব, তুমি প্রকৃতি ও অস্তিত্ব জগৎ সম্পর্কে জ্ঞাত, তুমি ব্যতীত অন্য সকল অস্তিত্ব অপূর্ণ ও নিয়ন্ত্রিত।

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُوْرًا

"আমরা পথ প্রদর্শন করেছি, হয় সে শোকর গুজার ও কৃতজ্ঞ হবে নতুবা অকৃতজ্ঞ।" আমরা তোমাকে পথ প্রদর্শন করেছি কিন্তু তোমার নিজেকেই এ পথ নির্বাচন করতে হবে।

স্বাধীনতা স্বয়ং মানুষের পূর্ণতা নয়, বরং মানুষের পূর্ণতার মাধ্যম। অর্থাৎ মানুষ স্বাধীন না হলে পূর্ণতায় পৌঁছতে সক্ষম হতো না। কারণ বাধ্যতার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয়। তাই স্বাধীনতা মাধ্যমগত পূর্ণতা, লক্ষগত নয়।

স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদিতাও আনুগত্যের ন্যায়। যেহেতু মানুষ স্বাধীন সেহেতু সে অবাধ্য ও বিরোধী হতে পারে অর্থাৎ যে কোন বাধ্যবাধকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাকে অস্বীকার করতে পারে। অন্যরা ভেবেছেন, এ অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণও পূর্ণতা এবং যে কোন আনুগত্যের বিরোধিতাও পূর্ণতা।

তাঁরা অবাধ্যতার সত্তাগত মূল্য দিয়েছেন। ফলে এ মতবাদের পরিণতি বিশৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হয়েছে। কারণ কোন মতবাদ অবাধ্যতাকে মূল্যবোধ মনে করলে তা শৃঙ্খলার জন্ম দিতে পারে না। স্বয়ং এ মতবাদের প্রবক্তা সারটার তাঁর ও তাঁর মতবাদের উপর আরোপিত এ অভিযোগকে খণ্ডন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। ইসলামী মতাদর্শে বিরোধিতার সম্ভাবনা আছে বলেই মানুষের মূল্য রয়েছে অর্থাৎ মানুষ বিরোধিতা করতে পারে, আবার আনুগত্যও করতে পারে, সে যেমন উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছতে পারে তেমনি নিম্নতর পর্যায়েও নেমে যেতে পারে। যারা (যে সকল অস্তিত্ব) বিরুদ্ধাচরণে সক্ষম নয় তারা মানুষ হতে উচ্চতর সৃষ্টি নয় যেহেতু তারা এ ক্ষমতারই অধিকারী নয়। আনুগত্য ও বিরোধিতা পরস্পর ভারসাম্য পরিমাপক বলেই এগুলো পূর্ণতার মাধ্যম। অন্য সৃষ্টি এরূপ শক্তি ও ক্ষমতা রাখে না বলেই স্বাধীন ও মুক্ত নয়।

এজন্যই বিরুদ্ধাচরণের পর তওবার মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন মানুষের জন্য একটি পূর্ণতা। বিরুদ্ধাচরণের পর প্রত্যাবর্তন আছে বলেই আল্লাহ্পাকের অন্যতম সুন্দর নাম غَفُوْرٌ বা ক্ষমাশীল বাস্তবে রূপ নেয়। যদি বিরোধিতা না থাকত তাহলে তওবা বা প্রত্যাবর্তনও থাকত না, তখন আমরা আল্লাহ্র গফুর নামের পরিচয় পেতাম না। বিরোধিতা পতন এবং তওবা প্রত্যাবর্তন ও পতন হতে মুক্তি। তাই বিরুদ্ধাচরণের পর প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ্র ক্ষমাশীলতা বাস্তব রূপ নেয়।

রেওয়ায়েতে এসেছে, আল্লাহ্পাক বলেছেন, "আমি পৃথিবীতে যে মানবকূলকে সৃষ্টি করেছি তারা যদি বিরুদ্ধাচরণ ও গুনাহ না করত, তবে অন্য কোন প্রাণীদের সৃষ্টি করতাম যারা অন্যায় ও পাপ করে তওবা করবে যাতে আমি তাদের ক্ষমা করতে পারি।" সুতরাং বিরুদ্ধাচরণ নিজে সত্তাগত মূল্যের দাবিদার নয়, তবে তওবা একটি মূল্যবোধ।

স্বাধীনতা অর্থ কোন প্রতিবন্ধক, বাধ্যবাধকতা ও শর্তহীনতা। আমি স্বাধীন, তাই নিজ পূর্ণতার পথকে স্বাধীনভাবে অতিক্রম করতে পারি। শুধু স্বাধীন হওয়ার কারণেই পূর্ণতায় পৌঁছেছি তা সঠিক নয়। তাই স্বাধীনতা পূর্ণতার পূর্বশর্ত, কিন্তু নিজেই পূর্ণতা নয়। যে অস্তিত্বকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে ও তার পূর্ণতার পথের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়েছে সে স্বাধীনতার সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে যাতে করে পূর্ণতার ঐ পথকে অতিক্রম করতে পারে। স্বাধীনতার বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছানো পূর্ণতার পথ অতিক্রমের প্রাথমিক ধাপ।

তাই এ মতবাদের প্রথম ভুল হলো তাঁরা মনে করেছেন, আল্লাহ্র অস্তিত্বের সঙ্গে মানুষের স্বাধীনতা ও এখতিয়ারের বৈপরীত্য রয়েছে। তাঁদের দ্বিতীয় ভুল হলো তাঁদের ধারণা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ও সম্পৃক্ততা অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ততার ন্যায় স্থবিরতা, বিচ্যুতি ও মূল্যবোধের পতন সৃষ্টি করে।

তাঁদের তৃতীয় ভুল হলো তাঁরা স্বাধীনতাকে মানুষের পূর্ণতার লক্ষ্য মনে করেছেন, অথচ স্বাধীনতা পূর্ণতার প্রাথমিক ধাপ।

স্বাধীনতা কি পূর্ণতা? নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা ব্যতীত মানুষ পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ্পাক মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যে স্বাধীনতা ও এখতিয়ারকে ব্যবহার করে তার পূর্ণতার পথকে অতিক্রম করবে। স্বাধীনতা ও এখতিয়ার ব্যতীত এ পথ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। যদি বাধ্যবাধকতা আসে, তবে পূর্ণতার এ পথ যেন সে অতিক্রমই করেনি।

ইসলামী পরিভাষায় স্বাধীনতা

এখানে স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসলামে যে ব্যাখ্যা এসেছে তা আলোচনা করব। ইসলাম স্বাধীনতাকে অন্যতম মানবীয় মূল্যবোধ বলে স্বীকার করেছে। তবে এ মূল্যবোধ ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয় বা এ 'স্বাধীনতা' উদ্ভাবিত কোন পরিভাষাও নয় বরং এটা এর প্রকৃত অর্থে একটি মূল্যবোধ। নাহজুল বালাগার দীর্ঘতম পত্র মালিক আশতারের প্রতি হযরত আলীর পত্র। এর ঠিক পরে একটি অসিয়তনামা রয়েছে যা তিনি ইমাম হাসান (আ.)-কে লিখেছেন। এর একটি বাক্য হলো :

أَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ وَ إِنْ سَاقَتْكَ إِلَى الرَّغَائِبِ فَإِنَّكَ تَعْتَاضَ بِمَا تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضًا (নাহজুল বালাগাহ্, পত্র ৩১)

"তোমার আত্মাকে সকল নীচতা ও অপমান হতে সম্মানিত রাখ" (নিজ আত্মসম্মানকে হেফাজত কর, কখনও তা বিকিয়ে দিও না) فَإِنَّكَ تَعْتَاضَ بِمَا تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضًا যেমনটি কোরআন বলেছে সবচেয়ে বড় পরাজয় নিজেকে হারানোর পরাজয়, তেমনি আলী (আ.)ও বলেছেন, "হে পুত্র! যে কোন বস্তুই তুমি বিক্রি কর অথবা হারাও তার মূল্য নির্ধারণ সম্ভব, কিন্তু এমন এক বস্তু যার বিক্রিয়মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয় তা হলো তোমার সত্তা ও আত্মসম্মান। যদি সমগ্র পৃথিবীও তোমাকে দেয়া হয় তবু তা তার সমতুল্য নয়।"

আলীর সন্তান ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন, "কেবল একটি বস্তু তোমার প্রাণ ও সত্তার বিনিময় হতে পারে, আর তা হলো আল্লাহ্পাক। আল্লাহ্র নিকট নিজের প্রাণ বিক্রী করা যায় আর তার বিনিময়ে আল্লাহ্কে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু বিশ্বজগতের কোন কিছুই প্রাণের বিনিময় হতে পারে না।"

এ পত্রেই হযরত আলী বলেছেন,

وَ لا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ فَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا

"হে পুত্র! অন্যের দাস হয়ো না। কারণ আল্লাহ্ তোমাকে স্বাধীন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।"

নাহজুল বালাগাহ্ থেকে আরেকটি উদ্ধৃতির আলোচনা করে আমার বক্তব্য শেষ করব। হযরত আলী (আ.) ইবাদতসমূহের স্তর বিন্যাস করে বলেছেন, "মানুষ ইবাদতের ক্ষেত্রে তিন পর্যায়ের : একদল আল্লাহ্র শাস্তি ও আজাবের ভয়ে তাঁকে ইবাদত করে যাতে তিনি তাদের শাস্তি না দেন; তাদের ইবাদত একজন দাসের ন্যায়, যে তার মনিবের ভয়ে কাজ করে। তাই এর তেমন কোন মূল্য নেই।

একদল বেহেশতের আশায় আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তারা শুনেছে আল্লাহ্‌র এমন বেহেশত রয়েছে যার তলদেশে ঝরণা ধারা প্রবাহিত (تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَار) তাতে হুররা রয়েছে, পাখির সুস্বাদু মাংস রয়েছে (لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ), তাই তারা হুর, পাখির মাংস আর মণি-মুক্তার লোভে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে যাতে এগুলো অর্জন করতে পারে।" আলী (আ.) বলেছেন, تِلْكَ عَبَادَةُ التُّجَّارِ "এটি ব্যবসায়ীদের ইবাদত যারা মুনাফার লোভে কাজ করে। কিন্তু একদল লোক আল্লাহ্‌কে কৃতজ্ঞ চিত্তে শোকর আদায়ের লক্ষ্যে ইবাদত করে। তারা না বেহেশতের লোভে, না জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তারা শুধু আল্লাহ্‌কেই চায়।"

মানুষের অন্যতম মানবিক বিষয় হলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। মানুষের বিবেক বলে, আল্লাহ্‌পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, চাই বেহেশত থাকুক বা না থাকুক এবং জাহান্নাম থাকুক বা না থাকুক। তাই সে তাঁর ইবাদত করবে।

তিনি কি স্বয়ং নবী (সা.) নন যিনি এত ইবাদত করতেন যে, তাঁর পবিত্র পা ফুলে যেত। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, "হে রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌পাক আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন তদুপরি আপনি কেন এত ইবাদত করেন?" তিনি জবাব দিলেন, "কেউ আল্লাহর ইবাদত করলে তা কি কেবল বেহেশতের আশায় ও জাহান্নামের ভয়ে করে থাকে? (أَلا أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا) তবে কি আমি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?"

সুতরাং প্রথম দলের ইবাদত দাসের ইবাদতের ন্যায় এবং দ্বিতীয় দলের ইবাদত ব্যাবসায়ীর ন্যায়। তৃতীয় দল স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় ইবাদতকারী فَتِلْكَ عِبَادَةُ الأَحْرَارِ। আলী (আ.)-এর যুক্তিতে স্বাধীন মানুষ এমনকি বেহেশত ও জাহান্নামের সঙ্গেও সংযুক্ত নয়, বরং এগুলো থেকেও সে মুক্ত। তার সংযুক্ততা রয়েছে শুধু আল্লাহ্‌র সঙ্গে।

যদিও ইচ্ছা ছিল স্বতন্ত্র এক বৈঠকে এ পর্যন্ত সমগ্র বক্তব্যকে সংক্ষেপে বর্ণনা করে ইসলামের পূর্ণ মানবের নমুনা পেশ করব, কিন্তু তা সম্ভব হলো না। তবে এই মতবাদগুলোর আলোচনার মাঝে ইসলামের পূর্ণ মানবের রূপও বর্ণনা করেছি। যা হতে বোঝা যায় ইসলাম একপেশে মূল্যবোধকে ধারণ করে না, বরং ইসলাম তার চোখ দিয়ে সকল মূল্যবোধকে দেখতে পায়। তাই দর্শন পূর্ণ মানবের ক্ষেত্রে যা বলেছে ইসলাম অনেক পূর্বেই তার উল্লেখ করেছে ও দেখেছে। তদ্রূপ শক্তির মতবাদ, সামষ্টিক মালিকানার মতবাদ, স্বাধীনতার মতবাদসহ অন্যান্য মতবাদ পূর্ণ মানবের যে রূপ উপস্থাপন করেছে ইসলাম সেগুলো অপেক্ষা অনেক উত্তম ও পূর্ণরূপে তা উপস্থাপন করেছে এবং এ সকল মতবাদের যে ত্রুটিগুলো রয়েছে ইসলামের ক্ষেত্রে সেগুলো প্রযোজ্য নয়। এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বব্যাপী ও পূর্ণ। তাই আমাদের নিকট প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে।

এ মতবাদগুলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানিগণ উপস্থাপন করেছেন তদুপরি ইসলামের মোকাবিলায় এগুলো বর্ণহীন হয়ে পড়ে। তাই যদিও নবী (সা.) পৃথিবীর বিরল ব্যক্তিত্ব তদুপরি তাঁর মতো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহীন ও অক্ষর জ্ঞান না শেখা একজন ব্যক্তির জন্য এরূপ পূর্ণ রূপ উপস্থাপন

অসম্ভব বিষয়। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি মানব ক্ষমতার ঊর্ধ্বে কোন শক্তি হতে এ শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং আল্লাহ্ হতেই তা এসেছে– অন্য সকল মতবাদের উপর এ মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। অন্যান্য মতবাদের সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে প্রকৃতরূপে তা আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়।

وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إلا باللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم